উপন্যাস

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

## পূর্ব্বকথা

১৩২৮ সালে ভারতী পত্রিকায় 'আঁধি' ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। এখন উপন্যাসখানি আগাগোড়া সংশোধিত করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

১৭, মোহনবাগান রো
কলিকাতা—৭
১৫ই বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## এ-সংস্করণের কথা

এ-সংস্করণে রচনাটি আগাগোড়া পরিমার্জ্জিত করিয়াছি—কোনো কোনো জায়গায় একটু অদল বদলও হইয়াছে।

৫২এ বেণীনন্দন ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।
শ্রাবণ, ১৩৫৯

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ঝড়ের রাতে

তোমার হাতে

দিলাম তুলে

এ বইখানি !

# আঁধি

# আঁধি

## প্রথম অধ্যায়

### ১

প্রকাণ্ড নদী বাঘমতীর তীরে সুনন্দা গ্রাম। নদীর ধারে লোকের বসতি খুব কম। একদিকে প্রকাণ্ড নদী সগর্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে,—নদীর কোলে মেটে পথ—পথের ওপাশে ঘন জঙ্গল—কোথাও বাঁশের ঝাড়, কোথাও কালকাসিন্দার ঝোপ, কোথাও বা ফণী-মনসা, ঘেঁটু, আকন্দ···উঁচু টিবির উপর এমনি নানা আগাছা সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৈত্র মাসের শেষ। সেদিন সন্ধ্যার সময় সমস্ত আকাশটাকে ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া প্রবল ঝড় উঠিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। নদীর তীরে যে মেটে পথ, সেই পথ ধরিয়া দশ-বারো বছর বয়সের একটি ছেলে ঐ ঝড় মাথায় করিয়া জলে ভিজিয়া একশা হইয়া ছুটীয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছে। মাথার উপর গাছপালা মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িবার জো—বাজের কক্কড় গর্জন এবং বিদ্যুতের ঝলক আকাশের এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত ফিরিয়া আগুনের লাইন টানিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। চারিধার কাঁপাইয়া সারা প্রকৃতি যেন মরণের গোলা ছুড়িয়া লোফালুফি করিয়া পৃথিবীকে দলিয়া চাপিয়া পিষিয়া ফেলিবে! এ-সব দিকে ছেলেটির ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই—সে ছুটিয়াছে··· ছুটিয়াছে···ছুটিয়াছে···

নদীর ধার ছাড়িয়া মোড় বাঁকিতেই ঝড়-জলের ঘন অন্ধকার চিরিয়া

আলোর ক্ষীণ রেখা ছেলেটির চোখে পড়িল। আলোর সে-রেখা লক্ষ্য করিয়া ছেলেটি সেই দিকে ছুটিল।

গোল-পাতার জীর্ণ বাড়ী। মাটী-ফাটা দেয়ালের ফাঁক দিয়া ঐ আলোর রশ্মি—তার চোখে পড়িয়াছে। ছেলেটি আসিয়া ছাঁচতলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের দরজার নিশানা মিলিলে ছেলেটি সে-দরজায় করাঘাত করিল—একবার দুবার তিনবার! কাহারো সাড়া নাই। জলের ঝমঝম আওয়াজ আর বাতাসের সোঁ-সোঁ গর্জন···নিরুপায় হইয়া ছেলেটি দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমে বাড়িতেছে—বাতাসের বেগে জলের ঝাপটা চাবুকের মতো ছেলেটির অঙ্গে আঘাত করিতেছে—ঠাণ্ডায় কচি হাড় পাঁজরাগুলা ঝন্‌ঝন্‌ করিতেছে। কিন্তু উপায় কি?

ছেলেটি শেষে নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া দ্বারে আবার ঘা দিল—বেশ জোরে।

ভিতর হইতে সাড়া জাগিল—যাই গো।

ছেলেটি বর্ত্তাইয়া গেল।

একজন স্ত্রীলোক···হাতে কেরোসিনের ডিবা···হাতের ঘেরে ডিবার শিখাটিকে কোনোমতে বাঁচাইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বদ্ধ-আলোর উজ্জ্বল আভা মুখে পড়িয়া স্ত্রীলোকটির মুখখানিকে এমন অপরূপ স্নিগ্ধ বিভায় রঞ্জিত করিয়াছে যে সে-মুখ দেখিয়া ছেলেটি আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

ছেলেটিকে দেখিয়া স্ত্রীলোক বলিল,—আহা, কার বাছা, বাবা? ভিজে সারা হয়ে গেছ যে। এসো, ভিতরে এসো।

দুই হাতে মাথার মুখের জল ঝাড়িতে-ঝাড়িতে ছেলেটি ভিতরে আসিল। স্ত্রীলোকটি দ্বার বন্ধ করিয়া আলো দেখাইয়া ছেলেটিকে উঠান পার করিয়া আর-একটা ঘরে আনিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে।

সেই প্রদীপের আলোয় তক্-তকে নিকানো মেঝের উপর একখানা মাদুর বিছাইয়া দুটী প্রাণী নীরবে বসিয়া। একজন পুরুষ, অপরটি বালিকা। ছেলেটিকে দেখিয়া পুরুষ বলিল,—একখানা গামছা এনে দাও গো—বড্ড ভিজেছে দেখ্ছি।

স্ত্রীলোকটি মুহূর্ত্তে কোথা হইতে একখানা শুক্নো গামছা লইয়া আসিয়া ছেলেটির মাথায় জল বেশ করিয়া ঘষিয়া মুছাইয়া দিল। পুরুষ ডাকিল,—ওমা সোনা···

বালিকার নাম সোনা। সোনার বয়স সাত-কি-আট বৎসর। সে বলিল,—বাবা···

বাপ বলিল,—একটা শুক্নো কাপড় আন্ রে।

একখানি বৃন্দাবনী কাপড় আনিয়া সোনা বাপের হাতে দিল।

পুরুষ বলিল,—ও-সব ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলো, বাবা। এই কাপড়খানা এখন পরো, নাহলে অসুখ করবে।

ছেলেটি তখনো সেই ভিজা পোষাকে ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—জিনের হাফ্ প্যাণ্ট, জিনের কোট্, পায়ে ফুল্ মোজা আর ভারী বুট—সেগুলা ভিজিয়া আরো ভারী হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বাঁধনের মতো কষিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। পোষাক খুলিয়া জুতা-মোজা খুলিয়া শুষ্ক কাপড় পরিয়া ছেলেটি মাদুরের এক কোণে বিনা-দ্বিধায় বসিয়া পড়িল।

পুরুষটি বলিল,—ওগো, এক কাজ করো—এই ভিজে ইজের-জামাগুলোকে বেশ করে নিংড়ে উনুনে সেঁকে দাও—যদি শুকোতে পারো! জামা নেই, তাই তো! ভালো কথা, ওরে সোনা···

—বাবা···

—তোর সেই কাচা দোলাইখানা ও-ঘরের দড়িতে তোলা আছে, সেইটে নিয়ে আয়। আহা, বড্ড শীত করছে রে!

সোনা পরম আগ্রহে গিয়া দোলাই লইয়া আসিল। ছেলেটি দোলাই গায়ে দিলে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া একবাটি গরম দুধ আনিয়া বলিল—এটুকু খেয়ে ফেলো তো বাবা। অত ভিজেচো! না হলে জল বসে সর্দ্দি-কাসি হবে!

ছেলেটি অবাক হইয়া গেল। বহুকাল পূর্ব্বে সে একটা গল্প শুনিয়াছিল—এক রাজপুত্র বনে পথ হারাইয়া কোন্ ভিখারীর বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিল; সেখানে ভিখারীর যত্নে-দেওয়া বনের ফল খাইয়া রাজপুত্র যে-আরাম পাইয়াছিল, রাজবাড়ীর মহার্ঘ্য ভোজে সে-স্বাদ কখনো পায় নাই! গল্পটাতে রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের আরো বহু পরিবর্ত্তনের কথা ছিল···কিন্তু এই কাপড়, দোলাই আর দুধের বাটি পাইয়া সেই বন-ফলের কথাটাই বিশেষ করিয়া ছেলেটির মনে পড়িল।

দুধ খাইয়া ছেলেটি নিশ্বাস ফেলিল।

পুরুষ বলিল—তোমরা কোথায় থাকো বাবা? এধারে এসেছিলে কেন···এই ঝড়ে, এমন একলা?

ছেলেটি বলিল,—রোজ সন্ধ্যার আগে আমি বেড়াতে বেরুই। এই নদীর ধার আমার খুব ভালো লাগে। আজ বেড়াতে বেড়াতে দেরী হয়ে গেল, আকাশের দিকে দেখিনি—হঠাৎ ঝড় আর বৃষ্টি এলো।

পুরুষ বলিল,—তাহলেও এমন একলা বেরুতে আছে? ছেলে-মানুষ! বিশেষ এই কাল-বোশেখীর সময়!

ছেলেটি বলিল,—একলা আসি না, মাষ্টার-মশাই সঙ্গে থাকেন প্রায়ই। আজ তিনি বললেন, তাঁর কি কাজ আছে··তাই আমি একলা বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম।

পুরুষ বলিল,—তোমার নাম কি বাবা?

—শ্রীনিখিলশঙ্কর রায়।

—তোমার বাবার নাম ?

—শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াশঙ্কর রায়।

পুরুষ আপনার মনে বলিল—অভয়াশঙ্কর রায়! তারপর কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ছেলেটিকে বলিল,—তোমরা এইখানেই থাকো ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—ঐ যে শিবতলা বলে জায়গা আছে ··সেই মস্ত পুকুর···এক কোণে শিবের মন্দির···তারই একটু দূরে যে নতুন বাড়ী হয়েছে—মস্ত বাড়ী, ফটকওলা···ফুলের বাগান আছে, সেই বাড়ীতে আমরা থাকি।

পুরুষটি বলিল,—ও···হ্যাঁ, হ্যাঁ···শুনেছিলুম, বিদেশের কে জমিদার-বাবু নতুন বাড়ী তৈরি করাচ্ছেন—সেই বাড়ীই তাহলে তোমাদের ? তা ও বাড়ী তো এই সেদিন তৈরী হয়েছে।

—হ্যাঁ। আমরা এই মাঘমাসের শেষে এখানে এসেচি।

—এইখানেই বরাবর থাকা হবে ?

—তা জানি না।

—বেশ, বেশ···ওরে সোনা, বুঝেচিস্ ? তুই যে বলিস অত বড় বাড়ী···রাজাবাবুর বাড়ী। এ বাবু সেই রাজাবাবুর ছেলে। বুঝলি ?

মুগ্ধ বিস্ময়ে সোনা নিখিলের পানে চাহিয়া পিতার গা ঘেঁষিয়া বসিল ; বলিল,—রাজপুত্তুর ?

—হ্যাঁ।

—রাজপুত্তুর বাবুর তালপত্তরের খাঁড়া আছে ? পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে ?

—আছে বৈ কি।

—আমি দেখতে যাবো, বাবা।

—যাবি বৈ কি···যাস্। রাজপুত্তুর বাবুর সঙ্গে যখন ভাব হলো, তখন যাবি নে কেন! তারপর নিখিলের পানে চাহিয়া পুরুষ বলিল,—এটি আমার মেয়ে···সোনা। নাম সোনা হলে কি হবে, এদিকে ভারী দুষ্টু। আমরা গরীব মানুষ, বাবা। আমার একটু ছোট্ট দোকান আছে—ঐ সব চালানী নৌকো আসে, তারা মাল-পত্তর কেনে, তাতেই আমার চলে। আমার কত ভাগ্যি যে আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় তোমার পায়ের ধুলো পড়েছে। তা গরীব হই, আর যা হই, গাঁয়ের মধ্যে এ কথা কেউ বলতে পারবে না, বনমালী কারো সঙ্গে জুচ্চুরি করেছে কি ফেরেব-বাজী করেছে! তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাবা, এত দুঃখেও তাই আরামেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে।

তারপর বনমালী নিজের মনেই অতীতের সহস্র কাহিনী বলিয়া চলিল। সুন্দরবনের ওদিকে এককালে তাহাদের মস্ত আবাদ ছিল,—জলের গ্রাসে সব গিয়াছে। সে সব থাকিলে তাহার আজ ভাবনা কিসের,—ভয় বা কি! একটা মেয়ে···তাকে সুপাত্রে দিতে পারিলেই বনমালীর ইহকালের কাজ চোকে!

নিখিল চুপ করিয়া কথাগুলা শুনিতেছে,—কতক বুঝিতেছে, কতক হেঁয়ালির মতো ঠেকিতেছে,—তার মন কিন্তু ঐ সোনার পানে। আলোর সাম্‌নে কতকগুলা নুড়ি-পাথর লইয়া বসিয়া সে কি-সব ছড়া বকিতেছে, আর নুড়িগুলাকে নাড়িতেছে, নাচাইতেছে, মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নিখিলের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে! নিখিল এ সবে যেন কেমন এক রহস্যের স্বাদ পাইয়াছে! বাহিরে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কক্কড় শব্দে মেঘ ডাকিতেছে, সোঁ-সোঁ গর্জ্জনে ঝড় বহিতেছে,—আর ভিতরে এই বনমালীর কাহিনী আর ঐ বালিকা সোনার কোমল সুরে ছড়ার গান,—ফুল, ফুল, একটা

তুলে জোড়ার ফুল, দোগ-ঘোন্‌-দোগ-ঘোন্‌! কখনো বা সে খেলা ফেলিয়া কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ নাচাইয়া বাপের ঘাড়ে চড়িতেছে, মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে,...অত্যন্ত সহজ সলীল ভঙ্গী—মুগ্ধ নিখিলের চোখে এগুলা এক অভিনব স্বপ্ন-মাধুরীর সৃষ্টি করিতেছে! সে তন্ময় হইয়া তাই দেখিতেছে।

২

যখন ঝড়-বৃষ্টি থামিল, তখন অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে। বনমালী বলিল,—চলো বাবা তোমাকে বাড়ী রেখে আসি—সেখানে সকলে কত ভাবছেন।

দুধারে বাদামী-কাগজ-লাগানো, আর ময়লা কালি-পড়া কাঁচ-আঁটা ছোট লণ্ঠন হাতে বনমালী নিখিলের সঙ্গে পথে বাহির হইল। নিখিলের পোষাক তখনো শুকায় নাই, কাজেই বনমালী সেগুলা হাতে করিয়া চলিল। নিখিলের পরণে বনমালীর দেওয়া সেই বৃন্দাবনী কাপড়, গায়ে সোনার দোলাই।

নির্জ্জন স্তব্ধ পথ। আকাশের কোলে খণ্ড-খণ্ড ক'টা কালো মেঘ তখনো ভাসিয়া বেড়াইতেছে, একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। ভিজা গাছের পাতা হইতে জলের বড় বড় ফোঁটা টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে...ঝিঁঝির অবিরাম রবে নিশীথের রাগিণী ঝঙ্কৃত, আর ভিজা গাছপালার ঝোপে ঝাপে রাশ-রাশ জোনাকি আলোর চুমকি আঁটিয়া দিতেছে!

খানিকটা পথ চলিয়া আসিবার পর দূরে দুটো হারিকেন লণ্ঠন দেখা গেল। লণ্ঠন কাছে আসিলে নিখিল দেখিল, বাড়ীর

দামু চাকরকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার মশাই আসিতেছেন এইদিকেই—নিশ্চয় নিখিলের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া নিখিল বনমালীকে বলিল,—ঐ মাষ্টার মশাই! তুমি যাও তাহলে, আর তোমাকে আসতে হবে না।

বনমালী বলিল,—সে কি হয়, বাবা? চলো, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

নিখিল বলিল,—না, না, তোমার আসবার দরকার নেই আর।

মাষ্টার-মহাশয় ও দামু আরো কাছে আসিলেন। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—এই যে নিখিল। আঃ, বাঁচা গেল।

দামু বলিল,—কোথায় ছিলে দাদাবাবু? বাড়ীতে বাবু আর মা ভেবে তুলকালাম বাধিয়ে দেছে। এই রাত্তিরে চারদিকে লোক ছুটেচে খোঁজবার লেগে!

বনমালী সগর্ব্বে বলিল,—ভয় কি! উনি আমার বাড়ীতে ছিলেন। এই ঝড়, এই বৃষ্টি—এতে কি করে আসবেন?

দাদাবাবুর পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া দামু বলিল,—পোষাক কোথায় গেল?

—এই যে! বলিয়া বনমালী নিখিলের পোষাকগুলা দামুর হাতে দিল।

মাষ্টার-মশায় বলিলেন,—এসো, বাড়ী এসো।

নিখিলের মন এতক্ষণ যেন কোন স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করিতেছিল—বৃষ্টির সেই ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ,—সোনার সেই সুর করিয়া ছড়ি খেলা—সহসা মাষ্টার মশায় আর দামুর কথা তাহাকে সে স্বপ্ন-লোক হইতে একেবারে কঠিন ভূমি-তলে নামাইয়া আনিল! মাষ্টার-মশায়ের গা ঘেঁষিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা খুব রাগ করেছেন, মাষ্টার-মশায়, ...না?

আশ্বাস দিয়া মাষ্টার মশায় বলিলেন,—না, না, রাগ করবেন কেন? তবে খুব ভাবচেন। এই রাত্রে ঝড়-বৃষ্টিতে কোথায় গেলে—ভাবনা হবার কথাই তো!

নিখিল কহিল,—এদিকে আপনি এলেন কি করে?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—চারধারে লোক গেছে। তবে আমি জানতুম, তুমি এই ধারটাতেই বেড়াতে আসো। তাই আমি দামুকে নিয়ে এই দিকটায় আসছি। আমারো কি কম ভাবনা হয়েছিল! কী ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল, বলো দিকিন!

তারপর চুপ-চাপ্ সকলে চলিতে লাগিল। খানিক দূর গিয়া নিখিলের খেয়াল হইল, বনমালীও সঙ্গে আসিতেছে! সর্ব্বনাশ! বাপের সহস্র মানা আছে, কোনো ছোট লোকের সঙ্গে কখনো যেন সে মেলা-মেশা না করে! বাড়ীর সকলের উপর কঠিন আদেশ, নিখিল যেন তাহাদের সংসর্গে না যায়! বনমালী...বেচারা বনমালী। খোড়ো ঘরে বাস করে, কিন্তু সে ছোটলোক—এ কথা মনে করিতে নিখিলের মনটা খুঁত-খুঁত করিতে লাগিল। এত যত্ন, এমন আদর যে করিতে পারে, সে কখনো ছোটলোক হয়? আর বমমালীর বৌ...সোনার মা? কেমন সুন্দর তার মুখখানি, কেমন মিষ্ট কথা, কেমন মধুর তার যত্ন! সাগ্রহে কত আদরে নিখিলের মুখে সেই দুধের বাটি ধরিয়াছিল! তার পর সোনা...ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি! তবু পিতার সেই রোষ-রক্ত আঁখি নিখিলের চিত্তে আগুনের হল্কার মত ছ্যাঁকা দিতে লাগিল। বনমালীকে দেখিয়া পিতা যদি তাহাকে কড়া কথা বলেন! যে-বেচারা তাহাকে অত যত্ন করিয়াছে, এই রাত্রে এত কষ্ট করিয়া তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছে, তাহার সে-যত্ন না বুঝিয়া পিতা কঠিন কথা বলিলে বেচারার প্রাণে কতখানি বাজিবে... ইহা ভাবিয়া নিখিল অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। জোর করিয়াই সে

বনমালীকে বলিল,—তুমি বাড়ী যাও। তোমায় আর আসতে হবে না।

বনমালী বলিল—আমার কোনো কষ্ট হবে না, বাবা।

—না, না, তুমি যাও…

নিখিলের এই সাগ্রহ অনুরোধের অর্থ বনমালী বুঝিল অন্যরকম। তাহার পিতাকে বনমালী চেনে না! কি কড়া উগ্র মেজাজ! পিতার এই রাগ বা বিরক্তি লইয়াই নিখিলের ভয়! কিন্তু বনমালী বুঝিল, তাহার কষ্ট ভাবিয়াই নিখিল এতখানি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বনমালীর আবার কষ্ট কি? কাজেই বনমালী বাড়ী ফিরিল না,—নিখিলের সঙ্গে চলিল।

সারা পথ বুকে দারুণ আশঙ্কা বহিয়াই নিখিল চলিল। বনমালী জানেনা, বাড়ীতে কি কঠিন শাসনের মধ্যে তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, বাপের কড়া আইন-কানুন মানিয়া—তার এক চুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। বনমালীর বাড়ীতে সে দেখিয়া আসিয়াছে, তার মেয়ে সোনার কি অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি! নিয়মের নিগড় কোথাও এতটুকু চাপিয়া দাবিয়া রাখে নাই! কিন্তু নিখিলের বাড়ীতে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ব্যবস্থা। এখানে চলিতে ফিরিতে হাঁচিতে কাসিতে কর্ত্তার মেজাজের পানে লক্ষ্য রাখিতে হয়!

বাড়ী আসিয়া ভিতরে ঢুকিবার সময় নিখিল বনমালীকে বলিল—আমি এসেচি। এবার তুমি বাড়ী যাও।…যাও না তুমি চলে!

বনমালী অবাক! সে কেমন হতভম্বের মতো মাটীর পুতুল বনিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিখিল ভয়-কম্পিত প্রাণে ফটকের মধ্যে পা দিল।

উপরে উঠিতেই দেখে, সামনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পিতা

অভয়াশঙ্কর। পুত্রকে দেখিয়া পিতা বলিলেন,—কোথায় ছিলে এত রাত্তির অবধি?

ভয়ে নিখিলের বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল! সে কোনো কথা বলিল না।

পিতা বলিলেন,—এই ঝড়, এই বৃষ্টি! বলো...

মাষ্টার-মহাশয় তখন সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন, ঝড়-বৃষ্টির সময় নিখিল একটি লোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল...জামা-কাপড় সব ভিজিয়া একশা।

পুত্রের পরিচ্ছদের পানে পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা বলিলেন,—এ কার কাপড় পরেছো?

ভয়ে ভয়ে নিখিল বলিল,—বনমালীদের।

—বনমালী কে?

নিখিল বলিল,—ওদিকে তাদের বাড়ী। তাদের বাড়ীতে বৃষ্টির সময় গিয়ে বসেছিলুম। সব ভিজে গিয়েছিল, তাই কাপড়টা তারা পরতে দিয়েছে।

—তাদের ঐ কাপড় পরতে এতটুকু ঘেন্না হলো না তোমার?...সেই ভিজে পোষাকেই তুমি বাড়ী এলে না কেন?

এ কথার জবাব নাই! নিখিল কি নিজের ইচ্ছায় পোষাক বদল করিয়াছে? জলে ভিজিয়া শীতে কাতর হইয়া সে কাঁপিতেছিল, তাই,—কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া সে বলিতে পারিল না।

না বলুক, এই বেয়াদবির জন্য পিতার কঠোর দণ্ড উদ্যত ছিল। তখনি তাহার অঙ্গ হইতে কাপড় আর দোলাইখানা টানিয়া পিতা তার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া সামনের ঘরে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

আচম্‌কা সে আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া ছিট্‌কাইয়া নিখিল ঘরের মাঝখানটায় গিয়া পড়িল। পিতা সশব্দে বাহির হইতে

দ্বার বন্ধ করিয়া বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—সারা রাত এই ঘরে তোমায় বন্ধ থাকতে হবে আজ।…এমন ভাবিয়ে তুলেছিলে! বেরুলে বাড়ীর কথা মনে থাকে না…যে এখানে সকলে ভাবছে!…আজ রাত্রে তোমার খাওয়াও বন্ধ।

হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল। মাষ্টার-মশায় ও দামু নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া; কাহারো একটা কথা কহিবার সাধ্য নাই! অভয়াশঙ্কর সরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক তরুণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দ্বার চাপিয়া ধরিল। দামু ও মাষ্টার-মহাশয় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নারী বলিল—দাও, ওগো দাওগো, একবার ওকে দেখতে দাও।

হাকিমের কঠোর আদেশ ধ্বনিত হইল,—না।

—আহা, ওর মুখের খাবার পড়ে আছে! একটু কিছু খেতে দাও। কখন্ সেই বেরিয়েছে। এই জল-ঝড়ে কত কষ্ট হয়েছে!

তবু সেই এক উত্তর—না।

নারী বলিল,—এই অন্ধকার ঘরে সারা রাত থাকবে ও?

—হ্যাঁ। এই ওর শাস্তি।

—ওর অপরাধ?

—সে-কথা তোমাকে বলবার দরকার দেখচি না।

নারী স্তম্ভিতের মতো স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি ওর মা, আমাকে ওর কাছে থাকতে দাও।

—না।

হায় অভাগিনী নারী! তোমার মিনতিতে কোনোদিন পাথরও গলিতে পারে, কিন্তু জমিদার অভয়াশঙ্করের মন তাহাতে এতটুকু টলিবে না!

নারী তখন নিরুপায় চিত্তে দ্বারের প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল, ডাকিল, —নিখিল···বাবা···

মেঘের টুক্‌রাগুলাকে ভাঙ্গিয়া সরাইয়া শীর্ণ চাঁদ তখন আকাশের কোলে দেখা দিয়াছে। মৃদু জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ সুধাধারার মতো অভাগিনী নারীর অঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর অচপল দৃষ্টিতে ভূলুণ্ঠিতা পত্নীর পানে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে পথে দাঁড়াইয়া একজন লোক তখন জমিদার বাবুর মুখের একটু কৃতজ্ঞ মধুর বাণীর প্রত্যাশায় প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীটার পানে কি অধীর সাগ্রহ দৃষ্টি লইয়াই যে চাহিয়াছিল! ভাবের ঝোঁকে বেচারা বুঝিতেও পারিল না, এখানে বাড়ীর মধ্যে কত-বড় মর্ম্মভেদী নাটকের এক-অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল!

## ৩

রাত্রের সেই অত-বড় জল ঝড়ের ব্যাপারটাকে দুঃস্বপ্নের মতো উড়াইয়া দিয়া প্রভাতের প্রথম আলো যখন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, তখন ভিতর হইতে দ্বার-নাড়ার শব্দে বাহিরে সুষমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভিতর হইতে অতি মৃদু কণ্ঠে নিখিল ডাকিল,—মা · মা গো···

পিঞ্জরাবদ্ধ শাবকের জন্য পক্ষি-মাতা যেমন বাহিরে পিঞ্জরের গায়ে নিষ্ফল আবেগে শুধু চঞ্চু আঘাত করিয়া আরো-নিরাশায় জর্জ্জরিত হয়, সুষমার নিরুপায় মনটা তেমনি এই একান্ত অসহায়তার মধ্যে দ্বার-প্রান্তে মিথ্যা মাথা কুটিয়া মরিতে লাগিল। স্বামীকে সে ভালো করিয়াই জানে। দয়া করিয়া নিখিলের মুখে মা-ডাকটুকু শুনিবার অধিকারই শুধু তিনি দিয়াছেন—নহিলে কোন্ মা ছেলের সম্বন্ধে এমন

সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে? অভয়াশঙ্করের কড়া আইন কোনোমতে এতটুকু টলিবার নয়—কাজেই এই নেহাৎ-অল্প পাইয়াই নিখিল ও সুষমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। সে শাসন-যন্ত্রের কাছে ক্ষুদ্র একটা নালিশ বা মিনতি তুলিবার সামর্থ্য দুজনের কাহারো নাই।

তবু আজ এই অসহ্য নির্য্যাতনে সুষমার ভীরু প্রাণ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। যা হইবার হইবে, আর নয়—ভাবিয়া ভবিষ্যতের পানে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইয়াই সে ছুটিয়া স্বামীর কাছে চলিল—ভাবিল, তাঁহার পায়ে পড়িয়া ভিক্ষা চাহিবে,—ওগো, সারা রাত্রি কাটিয়া গেল—যথেষ্ট হইয়াছে—এবার নিখিলকে মুক্তি দাও।

ভিতরে দ্বারের ফাটলে চোখ রাখিয়া নিখিল আবার তেমনি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—মা…

—এই যে বাবা…সারা রাত আমি এইখানে তোমারই কাছে রয়েছি ধন …যাই, ওঁকে ডেকে এনে দরজা খুলিয়ে দি। তুমি আর একটুখানি চুপ করে থাকো, মাণিক!

সুষমা উঠিয়া স্বামীর কাছে গেল। ঘরের দ্বার খোলা ছিল। খাটের মশারি তোলা। অভয়াশঙ্কর খাটে বসিয়া সাম্‌নের খোলা জানলা দিয়া বাহিরে কোথায় কোন্ সীমাহীন সুদূর আকাশের পানে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। যতখানি সাহস লইয়া সুষমা আসিয়াছিল, ঘরের মধ্যে পা দিতে সে-সাহসের অনেকখানি যে কোথায় উবিয়া গেল, সুষমা তাহা জানিতেও পারিল না!

সুষমা আসিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর শয্যা-প্রান্তে বসিল। স্বামীর পায়ের নখের উপর অতি-সন্তর্পণে নিজের হাত রাখিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর হঠাৎ চোখ তুলিয়া বলিলেন,—এ কি, তুমি হঠাৎ এখানে, এমন সময়? রাত্রে ঐ ঘরের দোরেই পড়ে ছিলে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। অতি-মৃদু কম্পিত ভাবে সুষমা বলিল—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এত বড় বেয়াদবি ওর হবে, আমি মোটেই ভাবতে পারি নি। ঠিক শাস্তি দিয়েচি।

সুষমার অন্তরের মধ্যে যে নারীত্ব, যে মাতৃত্ব অপূর্ব্ব মহিমায় আসন পাতিয়া বসিয়া আছে, মুহূর্ত্তে সে জাগিয়া উঠিল, জাগিয়া নির্ভয় মুক্ত কণ্ঠে বলিল,—কিন্তু ছেলেটা মরতে বসেছে! যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। সারা রাত একলা ঐ বন্ধ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা—এবার ওকে খুলে দাও।

—ও কিছু বলেছে ?

—কি আবার বলবে ? যতক্ষণ জেগেছিল, কেবলি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দোরের এ-পাশ থেকে আমি শুধু তার কান্নাই শুনেছি। তার সে চাপা-কান্নায় আমার প্রাণ একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অথচ করবার কোনো উপায় নেই, অধিকারও নেই আমার। জানিনা, কি দিয়ে ভগবান তোমার প্রাণটাকে গড়েছিলেন! এতও তুমি পারো! তবু ও তোমার নিজের ছেলে,—আর আমি ওকে পেটে ধরিনি!

—সুষমা···অভয়াশঙ্করের কণ্ঠে তীব্র সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

সুষমা বলিল,—তোমার কাছে বলেই বল্‌চি। দেখতে পাচ্ছো, ছেলেটা দিন-দিন কি-রকম শুকিয়ে যাচ্ছে! রাত-দিন ও কি-সব ভাবে, মনে হয়! ও যখন আমাকেই মা বলে জানে, তখন আমার বুক থেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ওকে ছিনিয়ে নিয়ো না! তোমার ছেলে, তোমারি থাকবে···আমাকে মা বলে ডেকে, একটু স্নেহের কাঙাল হয়ে যদি দুটো আব্দার জানাতে আসে, সে স্নেহটুকু আমায় দিতে দিয়ো—সে আব্দার-টুকু ওর আমি যেন রাখতে পারি—শুধু এইটুকু দয়া করো গো—এইটুকু ভিক্ষা দিয়ো। এইটুকুর জন্য তোমার সংসারে যদি সকলের

পিছনে আমাকে থাকতে হয়, সবার অবজ্ঞা আমায় সইতে হয়, আমি তা সইতে পারবো।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার মনে আছে সুষমা, তোমার সঙ্গে আমার কি-কথা ছিল?

—মনে আছে। ছেলে শুধু মা বলে আমায় ডাকবে, আর আমি ওর মা না হয়েও মা সেজে ওকে ভুলিয়ে রাখবো। ছেলে বুঝবে, না, সে মাতৃহীন হয় নি···এ ছাড়া ছেলের উপর আমার কোনো অধিকার থাকবে না! তুমি জানো, এই ক' বছর নিখিলকে নিয়ে আমি আছি, কখনো তোমার টানা গণ্ডীর বাহিরে আমাকে যেতে দেখেচো? সে অধিকারের সীমা আমি কোনোদিন লঙ্ঘন করেচি? বুক আমার মমতার তৃষ্ণায় শুকিয়ে হা-হা করেচে, স্নেহের তাড়নায় প্রাণ খাঁ-খাঁ করেচে, তবু আমি কোনো দিন সে তৃষ্ণা মেটাতে চাইনি! আজ বড় অসহ্য বোধ হয়েচে, তাই বলচি—তাই মিনতি জানাতে এসেচি। মেয়েমানুষ হলেও মনটাকে আমি একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারিনি। এ মনে স্নেহ-ভালোবাসা এখনো অগাধ অসীম হয়ে রয়েছে, সেটার পানে চেয়ে একটু অধিকার আমায় দাও, ছেলেকে ছেলে বলে বুকে নেবার অধিকারটুকু শুধু!

—হুঁ! বলিয়া বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি চাও, নিখিলকে এখন ছুটি দেবো? এই তো?

—হ্যাঁ।

—বেশ। চলো।

অভয়াশঙ্কর শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। সুষমা তাঁহার পায়ে হাত দিয়া বলিল,—ঘরের চাবিটা তুমি আমার হাতে দাও। আমি মা, আমি তাকে কোলে করে তুলে এখানে তোমার কাছে নিয়ে আসি।

মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া

অভয়াশঙ্কর সেটা সুষমার পায়ের কাছে মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। সুষমা চাবি লইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

দ্বার খুলিতে নিখিলের যে-মূর্ত্তি সুষমার চোখে পড়িল, তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল। গালদুটি শীর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে! অমন উজ্জ্বল-গৌর বর্ণ, দু-হাতে কে যেন ঘন করিয়া তাহাতে কালি মাখাইয়া দিয়াছে…মাথার চুলগুলা উস্ক-খুস্ক! কি এ মূর্ত্তি। বাছারে!

—মা—বলিয়া নিখিল সুষমার বুকে মুখ ঢাকিল। সারা রাত্রির ক্ষুব্ধ অভিমান অমনি কান্নার শতধারে চকিতে ফাটিয়া পড়িল। সুষমাও চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

তার পর আঁচলে নিখিলের দুই চোখ মুছাইয়া গাঢ় স্বরে সুষমা বলিল,—ছি, বাবা আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মীধনটি, আর কেঁদো না। চলো, ওঁর কাছে চলো। ওঁকে বলবে চলো, আর কখনো অমন দুর্য্যোগে বাড়ীর বাহিরে থেকে কাকেও ভাবাবে না! উনি কত ভাবছিলেন…ঐ জলে-ঝড়ে কোথায় তুমি পড়ে রইলে! কত বিপদ হতে পারে! তাই উনি রাগ করেছিলেন।

করুণ কণ্ঠে অভিমানের তীব্র বেদনা মিশাইয়া নিখিল বলিল,—কিন্তু আমি ইচ্ছা করে ছিলুম না তো মা। সেই জলে-ঝড়ে অন্ধকার পথে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, জলে ভিজে কাঁপছিলুম,—চলতে পারছিলুম না আমি, তাই ওদের বাড়ীতে একটু দাঁড়িয়ে ছিলুম।

তার পর একটু থামিয়া ফোঁপাইয়া কান্নার সুরে আবার বলিল,—আমারো সারাক্ষণ ভয় হচ্ছিল না কি? কেবলি ভাবছিলুম, কতক্ষণে বৃষ্টি থামবে, কখন বাড়ী যাবো! মা-কালীকে কেবলি ডাকছিলুম,—তারপর যেমন বৃষ্টি থামলো, ওদের বনমালীকে নিয়ে চলে এসেচি।

নিখিলের দুই চোখ বহিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পরম স্নেহে নিখিলের অশ্রুভরা চোখ দুটি আবার মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া সুষমা বলিল,—ওঁরও মন খুব খারাপ হয়ে আছে,—চোখ ফুলে রয়েছে, সারা-রাত উনিও ঘুমোতে পারেন নি। কত কেঁদেছেন! ও-ঘরে উনি বসে আছেন, তোমাকে ডাকচেন। এসো…

চলি-চলি করিয়াও নিখিলের পা কিছুতে যেন আর চলিতে চাহিতেছিল না! স্নেহহীন কঠিন পিতার সম্মুখে আবার এই সকালে না জানি আরো কত ভর্ৎসনা মিলিবে!

বাহুর আশ্রয়ে সুষমা তাহাকে এক-রকম বুকে করিয়া লইয়াই স্বামীর কাছে আসিল। অভয়াশঙ্কর তখন খোলা জানলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভিজা গাছের ডালে দুটো কাক তখনো কেমন নিঝুম বসিয়া আছে। চারিধারে প্রভাতের স্নিগ্ধ সোনালি আলো ছিটাইয়া পড়িয়াছে, তবু কালিকার সেই দুর্য্যোগের অত-বড় নিরানন্দ ভাব সে-আলোয় একেবারে কাটিয়া যায় নাই!

নিখিলকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া সুষমা বলিল,—নিখিল এসেছে। তুমি ওকে একটু আদর করে মুখ ধুয়ে নিতে বলো। বলো তো আমি ওর জন্য খাবার নিয়ে আসি।

অভয়াশঙ্কর ফিরিয়া পুত্রকে ডাকিলেন—নিখিল…

নিখিল মুখ তুলিয়া চাহিল। অভয়াশঙ্কর কোনো ভূমিকা না ফাঁদিয়াই বলিলেন,—কাল তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছিলে। আর কখনো যেন অমন না হয়। সাবধান! যাও, মুখ ধুয়ে খাবার খাও গে। খেয়ে পড়তে বসবে।

নিখিল আরাম পাইয়া বাঁচিল। পিতার কাছে আর ভর্ৎসনা মিলিল না, অন্ততঃ একটা কঠিন কথাও নয়—এ সে একেবারে কল্পনা করিতে পারে নাই। মার উপর কৃতজ্ঞতায় নিখিলের মন ভরিয়া উঠিল।

পিতার কাছ হইতে সরিয়া বাহিরে নীচে নামিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাকে সে দু-হাতে জড়াইয়া ধরিল; মার বুকে মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত মৃদু কণ্ঠে বার-বার ডাকিতে লাগিল—মা, মা, মা··

## ৪

সাত বৎসর পূর্ব্বে অভয়াশঙ্করের যখন পত্নী-বিয়োগ ঘটে, নিখিলের বয়স তখন প্রায় পাঁচ বৎসর। অভয়াশঙ্করের রিপু কয়টার প্রতাপ চিরদিনই দুর্জ্জয় রকমের—পত্নী লীলা সে রিপুগুলাকে কোনোমতে বশে রাখিয়া ছিল। পত্নী লীলার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং স্বভাবটুকু অত্যন্ত কোমল। লীলার উপর অভয়াশঙ্কর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং নির্ভর করিয়া কোনোদিনই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। এই জন্যই ক্রমে লীলার হাতে অভয়াশঙ্কর নিজের অস্তিত্বটুকুকে সমর্পণ করিয়া এমন হইয়া বসিয়া ছিলেন যে সর্ব্ব-কর্ম্মে লীলার হাত, লীলার পরামর্শ না হইলে তাঁহার সমস্ত কাজ অকাজ হইয়া দাঁড়াইত।

এই পত্নীকে অকস্মাৎ হারাইয়া তাঁহার জীবন চক্রহীন রথের ন্যায় একেবারে মন্থর অচল হইয়া পড়িল। অথচ এমন জড়-পদার্থের মতো পড়িয়া থাকিলেও চলে না! ঐ যে শিশু মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া সংসারের কঠিন ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে সেই কঠিন ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া ধরিতে হইবে! তাহাকে মানুষ করিয়া তোলার গুরু-রকমের দায়িত্বও আছে—নহিলে অভয়াশঙ্করের পুত্র পাছে বওয়াটে বখা হইয়া সমাজে বিচরণ করিয়া তাঁহার নাম ডুবাইয়া দেয়, এ আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল। অথচ সংসারে আর কোনো আকর্ষণ বা স্পৃহা নাই, আঁটিয়া বাঁধিবার মতো শক্তিও হারাইয়া বসিয়াছেন। অনুগত আত্মীয়-জনের প্রাণহীন সেবা-

পরিচর্য্যায় প্রাণটাকে কোনোমতে বাঁচাইয়া রাখা গেলেও সে শুধু খাইয়া-পরিয়া পঙ্গুর মতো পড়িয়া থাকা মাত্র। তাহার স্প্রীংগুলা বিকল হইয়া গিয়াছে, আপনা হইতে সে নড়িবার বল পায় না—হাত দিলে চলে, নহিলে অচল অক্ষম হইয়া থাকে—তাঁহার জীবনটা ঠিক এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিখিলও বাড়ীর চাকর-বাকর এবং অনুগত পাঁচজন জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীদের হাতে-হাতে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতেছে মাত্র—সম্পূর্ণ কেন্দ্রহীন লক্ষ্যহীন ভাবেই তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে। সে-ভবিষ্যৎ দাসী-চাকরের কচ্‌কচি ও সনাতন উপদেশ-বাক্যের একটা জড় স্তূপ মাত্র—বর্ত্তমানের সহিত বা প্রাণের সহিত তাহার যোগ নাই! এ যেন খাপছাড়া নিতান্ত এলোমেলো ধরণের রুক্ষ ভবিষ্যৎ! কোনোদিন ইহাদের মনোযোগের মাত্রা বেশী হইল তো দিনে সাতবার সাতজনে মিলিয়া নিখিলকে ধরিয়া খাওয়াইয়া দিল, যত্ন করিল; আবার যেদিন একজনের মনোযোগ একটু শিথিল হইল, সেদিন সকলেই সে শিথিলতায় গা ঢালিয়া দিল—নিখিলের ভাগ্যে সেদিন আর কিছুই মিলিল না। কাঁদিয়া-কাটিয়া অসম্ভব রকমের গণ্ডগোল বাধাইয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলকে সে বিব্রত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

এমনই গতিক দেখিয়া একদিন রাগের ঝোঁকে ছেলেকে তাহার দিদিমার কোলে ফেলিয়া দিয়া অভয়াশঙ্কর পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রথমে গেলেন কাশী। সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে কোনোদিনই তাঁহার ঝোঁক ছিল না; তাই কাশীতে সে-ধারটায় মোটেই ঘেঁষ দিলেন না। দুই-চারিজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আসিয়া সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া বৃথা শোকে কাতর হইতে নিষেধ করিল। কেহ পরামর্শ দিল, একটা মস্ত বন্ধন যখন কাটিয়াছে, তখন ছেলের প্রতি যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বাকী সময়টুকু ধর্ম্মে উৎসর্গ করিয়া দাও—অর্থাৎ সাধুদের

জন্য আশ্রম খুলিয়া মঠ তুলিয়া আর্ত্তের সেবার ভার লও—পরকালে চরম শান্তি-সুখ-ভোগের অধিকারী হইবে। কেহ পরামর্শ দিলেন, দেশের আর দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করো ইত্যাদি। এমনি নানা উপদেশের মধ্যে যখন তাঁহার জমিদারী ও অর্থরাশিকে নিজেদের কাজে খাটাইয়া লইবার পক্ষে তিনি ঐ সকল বন্ধুর অদম্য রকমের উৎসাহ দেখিতে পাইলেন, তখন কাশী ছাড়িয়া আসিলেন লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া বড় বড় পথ-ঘাট, ধুলি-জঞ্জাল লোকের ভিড় এবং মসজিদ মিনার প্রভৃতির চাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্ণৌ আর ভালো লাগিল না—তখন ছুটিলেন, প্রয়াগে। এমনি করিয়া প্রায় দেড় বৎসর ঘুরিয়া মন যখন একান্ত ক্লান্ত, তখন শ্বশুরবাড়ী হইতে এক টেলিগ্রাম গিয়া উপস্থিত, খোকার খুব অসুখ।

হায়রে, এত ঘুরিয়াও সংসারের মায়া, কৈ, ঘুচিল না তো! ঘুচাইতে চায় কে? এমন সুন্দর পৃথিবী—ঐ চাঁদ, এই স্নিগ্ধ বাতাস, ঐ স্বচ্ছ নীল আকাশ, এই লোক-জন—ইহাদের ছাড়িয়া কোমরে গেরুয়া জড়াইয়া কোথায় কোন্ অনিশ্চিতের সন্ধানে দুর্লভ মনুষ্যজন্মটাকে খোয়াইয়া মাটীর স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবেন! তা-ছাড়া নিখিল? সে বেচারা একেই মাকে হারাইয়াছে, আপনার বলিয়া তাহার মুখের পানে কে চাহিবে? যখন বড় হইয়া সে দেখিবে, খেলার সঙ্গীরা বেদনা পাইয়া, দুঃখ পাইয়া, কলহ করিয়া মায়ের কোলে চলিয়াছে জুড়াইবার জন্য, তখন সে তার করুণ চোখদুটি মেলিয়া কাহার কোল খুঁজিবে? বাপ! সে বাপ কত দূরে! হিমালয়ের গুহায়? না,—তা হইতেই পারে না!

তল্পী গুটাইয়া অভয়াশঙ্কর দেশে ফিরিলেন।

নিখিল সারিলে শাশুড়ী বলিলেন,—খোকাকে আমার কাছেই রাখো, বাবা। ওকে দেখলে আমার বুক তবু একটু জুড়োয়।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—ওকে ছেড়ে আমি একলা থাকবো কি করে?

শাশুড়ী বলিলেন—আমার এখানেই যদি থাকো, বাবা?

—না।

তা কি হয়! অভয়াশঙ্করের কত বড় নাম—বংশের কতখানি ইজ্জত! ছেলে মামার বাড়ী থাকিয়া তাহাদের প্রথা মানিয়া বড় হইবে, মামার বাড়ীর চাল-চলনে অভ্যস্ত হইবে, পিতৃ-বংশের কথা কিছুই জানিবে না—এত বড় আশঙ্কা যেখানে, ছেলেকে সেখানে রাখিয়া মানুষ করা চলে না!

নিজেরও কিন্তু চারিদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া চালাইবার মতো শক্তি নাই! এইটুকু ছেলের প্রত্যেক খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া পুরুষ-মানুষের পক্ষে চলা—অসম্ভব ব্যাপার! সে ধৈর্য্যই বা কৈ? তাঁহাকেও কাজ লইয়া থাকিতে হইবে। অভয়াশঙ্কর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু বসিয়া শুধু চিন্তা করিলেও চলিবে না! তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নিখিলকে লইয়া নিজের গৃহে ফিরিলেন।

সেই পরিচিত ঘর,—প্রেমের সহস্র স্মৃতিতে ভরা অজস্র সুখের লীলা-কুঞ্জ! এতদিনের অনুপস্থিতিতেও এ ঘরের প্রত্যেক ইট-কাঠখানা যেন সেই স্মৃতির সৌরভে ভরপুর রহিয়াছে! দাসী-চাকর অনুগত আত্মীয় স্বজন আবার বুক পাতিয়া নিখিলকে বুকে তুলিয়া লইল। তাহার পরিচর্য্যায় আবার তেমনি ঘটা পড়িয়া গেল। অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, মস্ত সোর-গোল চলিয়াছে। তিনি কি-ভাবে ছেলেকে মানুষ করিতে চান, সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই! তাঁহার ছেলের মনের গতি তাঁহারই অনুরূপ হইবে—তাঁহার রুচি-অরুচি, তাঁহার প্রকৃতি ছেলেতে যদি না বর্ত্তাইল, তাহা হইলে বংশধারার মস্ত একটা শৃঙ্খলই কাটিয়া

যাইবে! এ শৃঙ্খল কি করিয়া অটুট রাখিবেন? এ চিন্তা অভয়াশঙ্করকে নেশার মতো পাইয়া বসিল।

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, একটি মাত্র উপায় আছে। পিতা ও পুত্রের মধ্যে এই শৃঙ্খলের কাজ করে,—স্ত্রী। আজ যদি লীলা থাকিত, তাহা হইলে কি আর নিখিলকে লইয়া এত ভাবনা ভাবিতে হয়! নিখিলের চলা-ফেরায়, সকল কাজে লীলা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিত—ছি বাবা, উনি এটা ভালো বাসেন না···করো না।···এটি ওঁর খুব ভালো লাগবে, তুমি করলে।—এই ছাখো, ওঁর ছেলে-বেলাকার ছবি—কেমন, দেখচো? এমনি করিয়া বাপের প্রকৃতি-গত প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি ছেলের চোখের সামনে ধরিয়া দিলেই না ছেলে বাপের প্রতিবিম্ব হইয়া দাঁড়াইতে পারে! বাপ কি বইখানি পড়িতে ভালোবাসেন, বাড়ী ফিরিয়া নিখিলের কাছ হইতে কোন্ আচরণ, কিরূপ অভ্যর্থনা পাইলে আনন্দ পাইবেন, বাপের সঙ্গে সে কি কথা বলিবে, কোন্ ছড়াটি নূতন শিখিয়া শুনাইবে, এ-সব কথা ছেলেকে তেমন করিয়া কে বুঝাইবে? বাপের প্রতি ছেলের দুশ্ছেদ্য আকর্ষণ জন্মিবে, বাপকে সে কায়-মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে কি করিয়া? বাপকে ছেলে ভালোবাসিতে শিখিবে! ছোট-খাট সেবায় বাপের প্রাণের মধ্যে মণিদীপ জ্বালিয়া দিবে! কাজ-কর্ম্মের সকল শ্রান্তি তবেই না ছেলের মুখ দেখিয়া বাপ ভুলিতে পারিবেন! এমনি করিয়াই ছেলে বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করে, এমনি করিয়াই বংশের চিরন্তন জীবন-তরঙ্গটুকুতে সে নিজের জীবন-তরঙ্গ মিশাইতে পারে।

অভয়াশঙ্কর ভাবিলেন, যদি দেখিয়া-শুনিয়া একটি বুদ্ধিমতী তরুণীকে বিবাহ করিয়া তাহার হাতে ছেলের এই প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা যায়! বিবাহ করিলেই কি আর সে লীলার আসন কাড়িয়া লইতে পারে? অসম্ভব! লীলা···সে অন্তরের ধন, অন্তরময়ী হইয়া অন্তরে মিশিয়া রহিয়াছে—সে তো স্বতন্ত্র জীব নয়! সে এই অস্থি-মজ্জায়

মিশিয়া কায়ে-মনে এক হইয়া আছে! তাহার সহিত যে-মিলন, মৃত্যুর কঠিন কুঠারেও তাহা ছিন্ন হইবার নয়—বাহিরের খোলশ ছিঁড়িতে পারে, ভিতরটা কিন্তু তেমনি পরিপূর্ণ আছে, অটুট আছে, এবং চিরদিন এমনি থাকিবে!

৫

সন্ধান করিয়া পাত্রী মিলিল...সুষমা।

লীলার দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের কন্যা সুষমা। সুষমার পিতার অবস্থা ভালো না হইলেও একমাত্র মেয়েব হৃদয়-মনের শিক্ষার দিকে তাঁগার লক্ষ্য ছিল বিলক্ষণ। মেযেটিকে তাই তিনি সর্ব্ব-গুণসমন্বিতা করিয়া তুলিতে ছিলেন। লেখাপড়ায় সুষমার যেমন মন রান্না-বান্না, সেবা-শুশ্রূষা, সংসারের এমনি সহস্র কাজ-কর্ম্মেও তেমনি অনুরাগ ছিল। রূপে লক্ষ্মী, আর গুণে গুণময়ী মেয়ে। সুষমার পিতার মনে এ আশা বিলক্ষণ ছিল, তাঁহার অর্থ নাই বটে, তবু কোনো শিক্ষিত ধনীর যদি চোখ থাকে, তবে অর্থ ফেলিয়া সে তাঁহার মেয়েকে শুধু চোখে দেখিয়াই বধূ করিয়া বুকে তুলিয়া লইবে, এবং লইলে তাহাকে এতটুকু ঠকিতে হইবে না।

সুষমার বয়স ষোল বৎসর—বিবাহের সন্ধান চলিতেছে,—এমন সময় স্নেহময় পিতা অনেক টাকা দেনা, রুগ্ন স্ত্রী এবং এই অরক্ষণীয়া মেয়েটিকে রাখিয়া ইহলোকের সহিত সব সম্পর্ক কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। অভয়াশঙ্করের শাশুড়ী সংবাদ পাইয়া সুষমা ও তাহার মাকে নিজের কাছে আনাইলেন। সুষমার রুগ্না মাতা রুগ্ন দেহে স্বামীর শোক সহিতে পারিলেন না; এবং স্বামীর মৃত্যুর ঠিক চার-মাস পরে তিনিও স্বামীর অনুগমন করিলেন। সুষমা অনাথ হইল।

এই সময় শাশুড়ীর অসুখ হইলে অভয়াশঙ্কর তাঁহার অনুরোধে নিখিলকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং শাশুড়ীর কথায় নিখিলকে আনিয়াই লইয়া যাইতে পারিলেন না। নিখিল দিদিমার কাছে রহিল। তাহার দেখা-শুনার ভার লইল সুষমা। মাসি—বলিয়া ডাকিতে শিখাইলেও সুষমাকে সে মা বলিয়া ডাকিয়া থামিয়া গেল, বাকিটুকু কিছুতেই বলিল না। সুষমা লজ্জায় রাঙা! নিখিলকে বুকে টানিয়া তাহার মুখে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিল। এবং নিখিল ক্রমে সুষমার একান্ত বশীভূত হইয়া উঠিল।

শাশুড়ী সারিয়া উঠিলে অভয়াশঙ্কর নিখিলকে লইতে আসিলেন। নিখিল সুষমার কোলের কাছে আসিয়া ডাকিল,—মা·· মাকে তুমি দেখেচো বাবা? মার অসুখ সেরেছে।

অভয়াশঙ্কর চাহিয়া দেখেন, ঘরের সম্মুখে দ্বারে দাঁড়াইয়া চাঁদের মত কান্তি লইয়া লাবণ্যময়ী এক কিশোরী। সে সুষমা।

সস্মিত দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—শুনছিলুম, তোমার খুব বশ হয়েছে না কি!

সলজ্জ মৃদু হাসির কণা ঠোঁটে ফুটাইয়া সুষমা বলিল—আমায় খুব ভালোবাসে নিখিল।

—নিখিলকে যদি নিয়ে যাই, ওকে ছেড়ে তুমি থাকবে কি করে?

নিখিলের আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় সুষমার মুখখানি মলিন হইল। সে কোনো কথা বলিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার খুব মন কেমন করবে, না?

ঘাড় নাড়িয়া সুষমা জানাইল, হাঁ।

এমন সময় শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন,—ওমা সুষু, যাও তো মা, অভয়ের জন্য পাণ সেজে আনো। আর ঐ আমার ঘরে

টেবিলের উপর জলখাবার রেখে এসেচি—এদের বাপ-বেটার জন্য তাও অমনি নিয়ে এসো মা।

সুষমা চলিয়া গেলে শাশুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নিখিল তখন মামার কুকুরের নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশলের কাহিনী বলিতেছিল। অভয়াশঙ্কর অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে ছেলের মুখে মধু স্বরে বর্ণিত সে-কাহিনী শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিখিল বলিল,—দেখবে বাবা,—ঐ কুকুরের গলার জন্য মা কেমন ঘুঙুর-বাঁধা ফিতে তৈরি করে দেছে! মা খুব ভালো! আমি যা বলি, মা শোনে, বাবা। আমার সঙ্গে মাকেও কিন্তু এবার বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। নাহলে সেখানে আমায় খাইয়ে দেবে কে? নাইয়ে দেবে কে? আমি বামুনদির হাতে আর খাবো না, যে হলুদের গন্ধ! ভর্ত্তুর কাছে নাইবো না আর, হুঁ—বলিয়া সে কুকুরের গলার ঘুঙুর-বাঁধা ফিতা আনিতে ছুটিল।

নিখিল বাহিরে গেলে শাশুড়ী বলিলেন—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, বাবা।

অভয়াশঙ্করের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বুঝি, তাঁহারই অন্তরের কথা চোখের দৃষ্টিতে বেফাঁস্ হইয়া গিয়াছে! তিনি বলিলেন,—বলুন…

—বলতে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে বাবা, তবু আমি না বললে কে বলবে? তুমি আর একটি বিয়ে করো। কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই শাশুড়ীর চোখে জল ঠেলিয়া আসিল।

অভয়াশঙ্কর মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিলেন।

শাশুড়ী বলিলেন,—তোমার এই বয়স! তা ছাড়া এই ছেলেটাকেই বা কে দেখে-শোনে, বলো? ঝী-চাকরের হাতে রেখে কি কখনো ছেলে মানুষ হয়? ছোট লোকের হাতে রাখলে ছেলেপিলের প্রবৃত্তিও ছোট হয়ে যায়! এই ছেলের মুখ চেয়েই তোমাকে আবার বিয়ে করতে

হবে।...আমার বরাত! না হলে এ-কথা আমাকে মুখ দিয়ে বার করতে হয়!

শাশুড়ী চোখের জল মুছিলেন; জল মুছিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন,—আমি তোমায় জামাই বলে দেখিনে, কোনোদিন—তুমি আমার পেটের ছেলে। আমার বলাই যে, তুমিও সে। তা ছাখো বাবা, এই যে মেয়েটিকে দেখলে,—সুষু—ওর নাম সুষমা—যেমন বুদ্ধি, তেমনি গুণ—আমার লীলারই ছায়া যেন! মনে হয়, আমার সে-ই আবার আমার কাছে সুষমা হয়ে ফিরে এসেচে! মা-বাপ নেই,—সংসারে আপনার বলে ওর মুখের দিকে চাইতে কেউ নেই! আহা! এর সব ভার এখন আমারই। আমি যদি আজ চোখ বুজি, তা হলে ওকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই বাবা, বলছিলুম,—তাছাড়া তোমার নিখিলের উপর ওর কী মায়া! আর ছেলেটাও তেমনি, ওকে মা বলতে অজ্ঞান! যত বলি, মাসি বলবি, ছেলে বলবে না—কেবল ঐ নাম বলে ডাকবে!

শাশুড়ী চুপ করিলেন; তাঁহার দুই চোখ বহিয়া অজস্রধারে জল ঝরিল। অভয়াশঙ্করের চোখও সজল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, এই ঘরেই একদিন ডিপায় ক'টা পাণ পড়িয়াছিল বলিয়া লীলা সকৌতুক অভিমান-ভরে বলিয়াছিল,—আমার হাতের পাণ মুখে আর রোচে না বুঝি? তা বেশ, বেশ, নতুন দেখে একটি আনো—এনে নতুন হাতের পাণ খেয়ো! তখন তিনিও জবাব দিয়েছিলেন—নতুন হাতে চুণ বেশী হবে লিলি। নতুন হাতের পাণ খেয়ে শেষে গাল পুড়িয়ে ফেলবো!

আর আজ? এ সেই ঘর.. আর এই এক দিন! আর এই-সব কথাবার্ত্তা—নতুন হাত,—সে-ও পাণ সাজিয়া আনিতে গিয়াছে...... তাঁহারই জন্য! অদৃষ্টের কঠিন পরিহাস!

চোখ মুছিয়া শাশুড়ী বলিলেন,—বলো বাবা, সুষুকে নেবে?

আমার মা-হারা নিখিল ওকে যখন মা বলে ডেকেছে, ওকেই তখন ও মা বলে জানুক।…সুষুই নিখিলের মা।

অভয়াশঙ্কর কিছু বলিতে পারিলেন না, পাশে একটা সোফা ছিল—সোফায় মুখ গুঁজিলেন। তাঁহার সমস্ত মনটাকে গলাইয়া ভাসাইয়া চোখে অশ্রুর সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল!

এমন সময় সুষমা জল-খাবারের রেকাবি লইয়া ঘরে ঢুকিল। পিছনে অমনি নিখিল আসিয়া বলিল,—মা, মা, আমি বাবাকে দেখাচ্ছি,—তোমার তৈরী ঘুঙুর-বাঁধা ফিতে। এসো না মা, বাবার কাছে।… দিদিমা, বলো না তুমি…জুবুর মা জুবুর সঙ্গে আর তার বাবার সঙ্গে বসে কত গল্প করে! আমি মাকে বলেছিলুম। মা বলেছিল, বাবা এলে অমনি-ধারা মাও বাবাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে একসঙ্গে বসে গল্প করবে। আজ বাবা এয়েচে, তবু বাবার সঙ্গে মা কথা কইছে না!

শাশুড়ী বলিলেন—শোনো বাবা অভয়, ছেলে সব গড়ে রেখেচে! ওর এ সুখটুকু ভেঙ্গে দিয়ে এ জিনিষ থেকে ওকে আর বঞ্চিত করো না, বাবা।

নিখিল তখন দিদিমার কাছে গিয়া বলিল—দ্যাখো না দিদিমা, মা বাবার সঙ্গে কথাও কইবে না, বাবার কাছেও আসবে না!…হুঁ, আমি জানি গো, সব জানি—মার খুব অসুখ করেছিল বলে মা হাওয়া খেতে গিয়েছিল, তাই বাবার কাছে আমি একলা ছিলুম। আমি জানি, আমি তখন ছোট ছিলুম! তবু আমি কাঁদিনি,—সত্যি।…মার জন্য আমি কেঁদেচি বাবা? জুবু কাঁদে। তার মা সেদিন তাকে রেখে জুবুর মামার বাড়ী নেমন্তন্ন গেল, আর জুবুর কি কান্না! জুবু বোকা মেয়ে। মা কোথাও গেলে কাঁদে, বুঝি? মা তো আবার আসবে! না, দিদিমা?

দিদিমা, অভয়াশঙ্কর, সুষমা,—তিনজনেই নিঃশব্দে নিস্পন্দ রসিয়া… কাহারও মুখে কথা নাই!

দেখিয়া নিখিল বলিল—বারে, তোমরা কথা কইবে না? আমি যাই তবে জুবুদের ঘরে···জুবু কি করচে, দেখিগে। তাকে ডেকে আনি, খুলি, আয় ভাই, খেলি। বাবার সঙ্গে আমি চলে গেলে আর তো খেলা হবে না! বলিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল!

শাশুড়ী ডাকিলেন—সুষু, কাছে আয় মা।

সুষমা কাছে আসিলে তিনি তার ডান হাতখানি ধরিয়া জামাতার কাছে আসিলেন, এবং একান্ত স্নেহে সুষমার হাত অভয়াশঙ্করের হাতে রাখিয়া বলিলেন,—একে নাও বাবা, আমার লীলার বদলে লীলার জায়গায় আজ থেকে একেই তুমি বসাও। সব দিকে তোমার ভালো হবে। আমি মা, প্রাণ খুলে আমি এ আশীর্ব্বাদ করচি। সুষু, নিখিল সত্যই তোর ছেলে। ওর সব ভার তোর হাতে দিয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবো। তোরা দু'জনে আমার এ শেষ সাধটুকু পূর্ণ কর্—এটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করিস্ নে।

## ৬

শাশুড়ীর কথায় চট্ করিয়া সুষমাকে না লইতে পারিলেও কথাটা কমাস দিন-রাত অভয়াশঙ্করের মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ তুলিল। নানা-ভাবে বিষয়টাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন কি লাভ-লোকসানের হিসাবটাকেও বেশ করিয়া খতাইয়া শেষে তিন মাস পরে সুষমাকে হঠাৎ অভয়াশঙ্কর বিবাহ করিয়া বসিলেন।

বিবাহ করিয়া সুষমাকে লইয়া অভয়াশঙ্কর যেদিন গৃহে ফিরিলেন, সেদিন বাড়ীতে জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী-মহলে অসন্তোষের চাঞ্চল্য দেখা দিল। এতদিত নির্ঝঞ্ঝাটে এত-বড় সংসারটায় অবাধ কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া আসিয়া

হটাৎ আজ এই কোথাকার কে সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন বিয়ে-করা ধেড়ে বৌয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে! এ অপমান মানুষের সত্যই সহ্য হয় না! তাই অপরাহ্নে সুষমা যখন দোতলার ঘরের সম্মুখে খোলা ছাদ হইতে নিখিলের কাপড়-চোপড়গুলা রৌদ্রে দেওয়ার পর ঝাড়িয়া পাট করিয়া আলমারিতে গুছাইয়া তুলিতেছিল, তখন তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া নীচেকার রোয়াকে মেয়ে-মজলিসের চড়া গলায় কড়া রকমের মন্তব্য ফুটিল।

একজন বলিলেন—সৎমা করবে ছেলেকে মানুষ! হায়রে! কথায় বলে, সতীন-পো, না, সতীনের কাঁটা! ওদের কি? সব ঠাটই বজায় হলো—যেতে গেল যে যাবার—ঐ ছোঁড়াটাই জন্মের মতো ভেসে গেল!

আর-একজন বলিলেন,—তা নয় তো কি! তার উপর শিখিয়ে-পড়িয়ে মানিয়ে-বনিয়ে নেবো, তার জো নেই, দিদি। ধাড়ী বৌ, একেবারে ধুম্‌সো মাগী বললেই চলে!…তাছাড়া বিয়ের কথা আমাদের একবার ঘুণাক্ষরে জানানো হলো না! কেন বাপু, আমরা কি মানা করতুম? না বাধা দিতুম?

এমনি করিয়া মন্তব্যের সুর চড়া হইতে আরো চড়া পর্দ্দায় উঠিতেছিল। সুষমা জোর করিয়া মনকে ওদিক হইতে সরাইয়া লইলেও কাণ দুটা তার অবাধে এ বিষ গ্রহণ করিতেছিল। সতীন-পো, না, সতীনের কাঁটা! কথাটা শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এমনি মানুষের মন! হায় রে! কেন, সতীন-পো বলিয়াই বা ভাবো কেন? সে তো স্বামীরই ছেলে! এ-কথা কাহারো মনে হয় না কেন?

সন্ধ্যার পর গা ধুইয়া কাচা কাপড় পরিয়া সুষমা নিখিলকে লইয়া ছাদে বসিয়াছিল। সুষমা গল্প বলিতেছিল, আর নিখিল নিবিষ্ট মনে

গল্প শুনিতেছিল। এমন সময় নীচে হইতে মানদা ঠাকুরাণী আসিয়া নিখিলকে ডাকিলেন,—এসো দাদা, রান্না হয়েছে,—খাইয়ে দেবো, এসো।

তাঁহার আগমনে গল্প বন্ধ হইল। যে-জীবটি বসিয়া আছে, মানদা ঠাকুরাণী তাহার পানে লক্ষ্যও করিলেন না, গ্রাহ্য করা দূরের কথা!

গল্প বন্ধ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া নিখিল বলিল,—না, আমি মার কাছে খাবো। মা আমাকে খাইয়ে দেবে! এইখানে আমার খাবার দিতে বলো।

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন,—ছি দাদা, এসো আমার সঙ্গে। বায়না করে না!

নিখিল বলিল—না, তোমার হাতে খাবো না, যে নোংরা হাত তোমার! মা আমাকে খাইয়ে দেবে, বলচি···না, তবু···

সুষমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—ছি বাবা, গুরুজন···গুরুজনকে মন্দ কথা বলতে নেই!

মানদা ঠাকুরাণী অপ্রসন্ন চিত্তে বলিলেন,—খাও তবে দাদা, খাও, মার রাঙা হাতেই খাও। তারপর বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—এত বেশী যার দরদ, তাকে সেই যে কি বলে—দেখো নতুন বৌমা, ছেলেকে একেবারে যেন কেড়ে নিয়ো না! ওর ধাত-টাত আমরা যেমন বুঝি, তেমন কি আর নতুন মানুষ, কালকের মেয়ে, তুমি বুঝবে বাছা? যা হোক, খেলা সুরু করেছো মন্দ না! গোড়াতেই এই! না জানি, আরো কি দেখবো! বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সুষমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ-সব কথার অর্থ! সুষমা কি করিয়াছে? সে তো কাহারো সঙ্গে একটা কথাও বলে নাই, তবে তাহাকে এমন ভাবে এই সব কথা শুনানো কেন? সে কোনো অপরাধে অপরাধী নয়! তবে?

নীচে ওদিকে মানদা ঠাকুরাণীর তীব্র ঝঙ্কার শুনা গেল,—যাও গো বামুন-মেয়ে, ছেলের খাবার ওপরে নিয়ে যাও। দরদী মা এসেছেন, তাঁর হাতে ছেলে খাবে। অভয়ের মনে যদি এই ছিল, কেন তবে এ মায়ার পাকে বাঁধলো, বল দিকি! ছেলেটাকে আমার কোলে দিয়ে শেষে কেড়ে নেবে যদি? যত্ন কি আর আমি করছিলুম না, না, যত্ন করতে জানিনা? পেটে ধরিনি বটে, তবু ওর জন্ম নাড়ীটা থেকে থেকে যেন টন্‌টনিয়ে ওঠে!—মা, মা! ওরে আমার সাতপুরুষের মা! আদর করে গল্প শোনানো হচ্ছে! এর পর গলা টিপে রাজ্যেশ্বরী হয়ে বসবেন যখন—তখন দেখবো, মরবো না। হুঁ! দেমাক! আমাদের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা নেই। মুখ টিপে ভিজে বেরালটি হয়ে ছেলের জিনিষ-পত্তর নাড়া-চাড়া করছেন, ঘর-দোরের ধুলো ঝাড়চেন! আমরা কে? দাসী-বাঁদী বৈ নই! ওঁরই যেন সব—বরাত দিয়ে গেছলেন! আমরা যেন কিছুই দেখিনি-শুনিনি! অত টস্ জানিনে বাপু,—সোনার লক্ষ্মীর রাজ্যিপাট—উনি কোত্থেকে এসে দখল করে বস্‌লেন, ত্যাখো! যাবো কোথায়? বৌমা গো—আর কথা জোগাইতে না পারিয়া লীলার শোকে মানদা ঠাকুরাণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দোতলার খোলা ছাদে বসিয়া সুষমা এ কথাগুলা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। আকাশে ছোট এক-টুকরা চাঁদ—তাহারই আশে-পাশে কতকগুলা খণ্ড মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সুষমা গল্প থামাইয়া উদাস নেত্র মেলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। নিখিল কহিল,—বলো না মা, তার পর কি হলো? রাক্কুসীটা দাঁত বের করে রাজপুত্তুরকে তেড়ে গেল, রাজপুত্তুর কি করলে? ভয় পেলে, না···

সে কথা সুষমার কানেও গেল না, সে তেমনি উদাস চোখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সত্যই তো, সারাদিনেও এই এতগুলি বর্ষীয়সী আত্মীয়ার সে তত্ত্ব লয় নাই তো! কি করিয়াই বা লইবে? এই

অপরিচিত ঘরে সে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ···সবে মাত্র এখানে আসিয়া পা দিয়াছে! তাঁহাদের গায়ে পড়িয়া গিন্নি-বান্নীর মতো সে আবার কি তত্ত্ব লইতে যাইবে? কৈ, তাঁহারা তো কোনোদিন ডাকিয়া সুষমার সঙ্গে একটা কথা বলেন নাই! অথচ বাড়ীর বৌ সে!

সুষমা ভাবিল, তবু সে ছোট, তাহারই উচিত ছিল, গিয়া সকলের সঙ্গে ভাব করা। কিন্তু অভয়াশঙ্করের আদেশ—তাই ঘর-দ্বার দেখা-শুনা, নিখিলের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি বুঝিয়া লওয়া—এ-সবগুলার দিকেই সে আগে মন দিয়াছে। এ কর্ত্তব্য তার আর-সব কর্ত্তব্যের আগে।

নিখিল বলিল,—বলো না মা, গল্পটা। চুপ করে রইলে কেন?

সুষমা চমকিয়া উঠিল, বলিল,—এই যে বাবা, বল্‌চি।

গল্পের হারানো খেই ধরিয়া সুষমা কোনোমতে সেটাকে শেষ করিল।

ওদিকে নিখিলের খাবার লইয়া বামুন-মেয়ে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। সুষমা বলিল,—একটা চাকর-বাকর কাকেও ডেকে দিন না—আমি তো চিনি না কাউকে। এখানে একটা আলো দিয়ে যাবে, নাহলে অন্ধকারে খাবে কি করে?

বামুন-মেয়ে মাহিনার চাকর, গতর খাটাইয়া খায়,—কর্ত্রীত্ব কখনো করে নাই, করিবার আশাও রাখেনা। তার উপর সে দেখিয়াছে, এই মেয়েটি এখানে আসা অবধি নীচেকার মহলে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বিশ্রী ষড়যন্ত্র আর জল্পনা চলিতেছে! অথচ বেচারী মুখের কথাটি খশায় নাই! তার উপর সুষমার মিষ্ট কথায় তাহার প্রাণটা ভিজিল। সে বলিল,—এই যে মা, ডেকে দিচ্ছি। বলিয়া পাচিকা খাবারের থালা রাখিয়া ওধারে গিয়া ডাকিল,—ওরে ও রামফল, ও দামু—একটা হারিকেন দিয়ে যা না এই দোতলার ছাদে। খোকা বাবু খেতে বসচে যে।

বামনী আসিয়া সুষমার কাছে বসিল···অল্প কথায় তাহার পিতৃ-

গৃহের পরিচয় লইয়া বলিল,—তুমি আমাদের সে-বৌমার বোন্ হও? ও···তা এ বেশ হয়েছে মা। ছেলেটাকে দেখো বাছা। ওদের আর মায়া ধরে না! ছেলেটা সত্যই ভেসে বেড়াচ্ছিল। যে অরাজক-পুরী হয়েছিল, মা!

তারপর সে নিখিলের বায়না প্রভৃতির সবিস্তার পরিচয় দিতে লাগিল,—পরে একটু চাপা গলায় বলিল—বাড়ীতে যাঁরা আছেন, এক-একটি জ্যান্ত সাপ, বৌমা। দুধ-কলা দিয়ে কর্ত্তাবাবু এদের পুষচেন, অথচ কর্ত্তাবাবুকেই উল্টে ছোবল দিতে পেলে সব বর্ত্তে যান! তুমি মা, ওঁদের একটু মেনে চলো। কথার কি ধার! কাউকে রেয়াৎ করেন না! সে-বৌমা অমনি চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে তটস্থ থাকতেন—পাণ থেকে চুণটুকু না খশে! আহা, বাছারে! বাবা, বাবা—কথায় বলে, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ! তা এখানকার কাণ্ডকারখানা ঠিক তাই!

হারিকেনের আলোয় নিখিলকে খাওয়াইয়া তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিলে বামনী এঁটো তুলিয়া সুষমাকে বলিল,—তোমার খাবার এইখানেই নিয়ে আসি মা! তুমিও খেয়ে নাও।

সুষমা বলিল,—থাক্, পরে খাবোখ'ন। আমি নীচে গিয়েই খাবো। কেন আবার কষ্ট করে এখানে আনবে?

বামনী বলিল—ওমা, এ আবার কষ্ট কোন্‌খানটায় মা? তোমারই তো চাকর আমি। তা-ছাড়া এখনই খেয়ে নাও মা। কার পিত্যেশেই বা বসে থাকা? ওঁরা ডেকে বলবেন,—খাবে এসো বৌমা? সে আশা করো না বাছা। নিজেদের নিয়েই ওঁরা চব্বিশ ঘণ্টা মত্ত! তার পর কর্ত্তাবাবু? তাঁর খাবার ঐ ঘরেই ঢাকা থাকে। তিনি সেই দশটার পর ওপরে উঠে খান। এ বাড়ীর ধারা তো জানো না মা, তুমি।

৭

অনেক রাত্রে অভয়াশঙ্কর উপরে আসিয়া দেখিলেন, খাটের উপর তাঁহার শুভ্র বিছানা পাতা, আর তাহারই একটি পাশে নিখিল শুইয়া ঘুমাইতেছে। নীচে একধারে তাঁহার খাবার ঢাকা রহিয়াছে এবং তাহারই পাশে সুষমা ভূমির উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে বড় আলো জ্বলিতেছে। সেই আলোয় অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, সুষমার মুখখানি যেন ঈষৎ মলিন, অথচ সেই মলিন মুখে প্রসন্নতার স্বচ্ছ একটু হাসি ফুলের উপর জ্যোৎস্না-রেখার মতোই মাখানো রহিয়াছে। বেচারী সুষমা! অভয়াশঙ্কর ভাবিলেন, না, মুখ দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না! এ বিবাহ প্রেমের জন্য, আরামের জন্য বা আমোদের জন্য তিনি করেন নাই! শুধু সংসারে একটু সুবিধা করিয়া লইবার জন্যই এ বিবাহ! কর্ত্তব্যের পথটাকে প্রশস্ত অবাধ রাখিবার জন্যই তিনি এই অনাথা বালিকাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন,—সে কথা ভুলিলে চলিবে না এবং এই কথাটাই সুষমাকে আজ স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা দরকার! সে যেন মস্ত বড় আশা করিয়া শেষে নৈরাশ্যে না ভাঙ্গিয়া পড়ে!

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা···

এই একটি ডাকে উঁ বলিয়া সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। অভয়াশঙ্কর চেয়ারে বসিলেন। সুষমা গায়ের কাপড়-চোপড় টানিয়া নিজেকে সম্বৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—কাছে এসো।···

সুষমা অভয়াশঙ্করের কাছে আসিল। অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, শোনো···বেশ স্থির হয়েই

শোনো। সব অবস্থাই তুমি জানো। আর এও জানো, লীলাকে আমি কী ভালোই বাসতুম! তাকে হারিয়ে আর-একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কত শক্ত, তা তুমি হয়তো বুঝবে না! তবু বোঝবার চেষ্টা করো। স্ত্রীর আদর নতুন করে আর আমার পাবার নেই! তোমার কাছ থেকে আমি তা চাইও না। সে-আদর আমি ভরপূর ভোগ করেছি। তার আর প্রত্যাশাও করি না।···তবে এই নিখিলকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়েচি। ওকে ঠিকভাবে মানুষ করতে গেলে এমন একজনের সাহায্য চাই, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে যে ওরই কাজে ঢেলে দেবে, তার প্রতিদানে কিছুরি আশা রাখবে না! সে আমার মনের সমস্ত পরিচয় জানবে, আর আমার মনের মতো করেই নিখিলকে গড়ে তুলবে। আমি এমন একজন লোক খুঁজছিলুম, যে আমার স্ত্রী না হয়ে স্ত্রীর মতো হবে, বন্ধু হবে, খাঁটি বন্ধু।···নিখিল তোমার খুব বশ, তোমাকে সে খুব ভালোবাসে। তাছাড়া তোমাকেই সে তার মা বলে জানে, মা বলে ডাকে। তুমিও নিখিলকে খুব ভালোবাসো, তাই তোমাকে এই ঘরে এনে লীলার আসনে বসিয়েছি। তুমি আচারে-ব্যবহারে সর্ব্ব-বিষয়ে নিখিলের মা হয়ে থাকবে। ও যে মা-হারা, এটুকু যেন ও জানতে না পারে! ওকে কখনো সে অভাব তুমি বুঝতে দেবে না!···পারবে, সুষমা?

সুষমা মুখ নত করিয়া হাত দিয়া কাপড়ের আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার কাছ থেকে ঠিক স্বামীর ব্যবহার নাও পেতে পারো তুমি, তার জন্য দুঃখ বা অনুযোগ করো না। তোমাকে ঠিক স্ত্রী বলে আমি গ্রহণ করতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে সব কাজে আমার সহায় হয়ো, বন্ধু হয়ে থাকো। আমাকেও তোমার বন্ধু বলে জেনো। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। কেমন?

এবারও সুষমা কোনো কথা বলিল না—ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি হয়তো ভাবচো, তোমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল! কিন্তু তা নয়। সব রকম স্বার্থ, সাধ আর কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে এক অনাথ মাতৃহীন শিশুকে যদি তুমি মানুষ করে তুলতে পারো, তার মাতৃহীনতার মস্ত অভাব যদি তাকে বুঝতে না দাও, তাহলে সেটা খুব বড় কাজ করা হবে। তার জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন,—নিশ্চয় জেনো। তোমার সে নিঃস্বার্থ আন্তরিক সেবা কখনোই নিষ্ফল হবে না, এও তুমি জেনে রেখো।

সুষমার দু' চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। হায়রে, প্রথম যৌবনে স্বামীর তাহার এই প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ! সুষমার বয়স হইয়াছে, স্বামী কি-বস্তু, তাহা সে বাঙালীর ঘরে জন্মিয়া এতখানি বয়সে খুবই বোঝে! তাহার তরুণ প্রাণে অজস্র সাধ আর কামনা পুষ্প-কলির মতো অজস্রভাবে ফুটি-ফুটি হইয়া রহিয়াছে। একটু প্রেম, একটু সোহাগ আর আদরের হাওয়ায় সেগুলা এখনি ফুটিয়া বিপুল শোভায় অমল সৌরভে দিক্‌দিগন্ত মাতাইয়া তুলিতে পারে—কিন্তু সেগুলাকে আর ফুটানো গেল না! অফুট কলি অনাদরে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে!…ভগবানের আশীর্ব্বাদ? সুষমা কি তাহারই কাঙাল?

জোর করিয়া সে চোখের জল সম্বরণ করিল। নিখিলের মুখ চাহিয়া সে সব সহিবে, নিখিলের সুখের জন্য নিজেকে সে বিসর্জ্জন দিবে, বলি দিবে। মা-হারা, বেচারা নিখিল!…তাই হোক! তুচ্ছ একটা নারীর জীবন বৈ তো নয়! সে-জীবন এই নিখিলের সেবাতেই সার্থক হোক্!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অভয়াশঙ্কর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন;

কেমন এক অধীরতা বুকে লইয়া ঘরের মধ্যে কয়বার পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন, পরে জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সুষমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সুষমা মুখ নামাইয়া তখনো সেই চেয়ারের পাশে একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। একটা কথা প্রকাশের জন্য অভয়াশঙ্করের মনের মধ্যে ভারী জোরে ঠেলা-ঠেলি করিতেছিল। সুষমার পানে চাহিতে প্রাণে একটু মমতা জন্মিল। সে মমতাকে দু-পায়ে চাপিয়া তিনি কথাটা অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—আর একটা কথা, সুষমা। ভিতরে আমাদের মধ্যে যে বন্দোবস্তই থাকুক, বাহিরে কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী। বাহিরে লোকে তোমাকে সর্ব্ববিষয়ে আমার স্ত্রী বলেই জানবে। এই বাড়ী, সংসার, বিষয়,—এ সবেরই কর্ত্রী তুমি! তুমিও সেই ভাবে নিজেকে আর সংসারকে চালাবে, তার একতিল কম নয়!···আর হ্যাঁ, ঐ বিছানায় আমরা একত্র দু-জনে না শুলেই ভালো হয়, বোধ হয়। খাটে তুমি আর নিখিল শুয়ো—আমি ওধারের ঐ ছোট স্প্রীংয়ের খাটটায় শোবো—কেমন?

সুষমা কোনো কথা বলিল না। এতক্ষণে মনটাকে সে ঠিক করিয়া লইয়াছে—সমস্ত আদেশ সে বিনাবাক্য-ব্যয়ে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, স্থির করিল। তাই সে ঘাড় নাড়িয়া স্বামীর এ বন্দোবস্তে নিঃশব্দে সায় দিল।

অভয়াশঙ্কর তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাইতে বসিলেন। সুষমা আসিয়া পাশে বসিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

৮

এমনি করিয়াই দিন কাটিতে ছিল। নিখিলের মা না হইয়াও মা সাজিয়া সুষমা নিখিলের সমস্ত অভাব ঢাকিয়া চলিতে লাগিল। অভয়াশঙ্কর শুধু দুই জনের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিলেন,—যেন এই ভাবটায় কোথাও এতটুকু শৈথিল্য না আসিয়া পড়ে! বন্ধু বলিয়া মানিয়া লইলেও অভয়াশঙ্কর যে স্ত্রীর চক্ষে সুষমাকে একেবারে দেখিতেন না, এমন নয়! সুষমার উপর ক্রমে অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতে লাগিলেন। এক-একবার মনে এমন আশঙ্কাও জাগিত, তাই তো, এ-একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতেছি না তো! নিখিল সুষমাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে, এজন্য এখন যেন কোথাও বাধিতেছে না। কিন্তু লীলা? তার স্থান কি নিখিলের জীবনের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে? লীলাকে কি একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন? নিজের মাকে নিখিল চিনিবে না? নিজের মার কোনো পরিচয় সে জানিবে না? কখনো লীলার নামটুকুরও সম্মান করিবে না? এ যে লীলার স্মৃতির উপর রীতিমত অপমানের ব্যবস্থাই তিনি করিয়া বসিয়াছেন!

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার সূত্রে এমন জোট পড়িতে লাগিল যে তিনি বিরক্ত হইলেন এবং এ বিরক্তি রোষের আবরণে গিয়া পড়িল শেষে এই বেচারী সুষমার উপর! জীবন-পথে সে যদি অমন করিয়া আসিয়া না জুটিত! নিখিলের সাম্‌নে অমন ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়া এমন স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া যদি সে না লইত,…নিখিল যদি তাহার এতখানি বশ না হইত! তাহা হইলে…

তাহা হইলে কে জানে, সুষমাকে এখানে আনিয়া অভয়াশঙ্কর এই

জটিলতা সৃষ্টি করিবার কল্পনাও হয়তো করিতেন না! রূপের মোহ! অভয়াশঙ্কর সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কখনো না! লীলাকে পাইবার পর এখনো সে মোহ—উঁহু! নিখিলের জীবন-পথে আসিয়া না দাঁড়াইলে সুষমার পানে তিনি ফিরিয়াও তাকাইতেন না!

হায়রে, ইহারই নাম সংসারের পথ! সরল সোজা পথে চলিয়া যাইবার ভাগ্য যাহাদের হয়, তাহারাই শুধু ধন্য! আর সোজা পথে কাঁটার ঘা খাইয়া এই অন্ধকার গলির পথে ঢুকিয়া যে হতভাগাদের চলিতে হয়, তাহাদের কি আর নিস্তার আছে! সুখ? শান্তি? সে আশা একেবারেই মিথ্যা! পদে পদে মাথা ঠুকিয়া, পা পিছলাইয়া কি বিশ্রীভাবেই না তাহাদের পথ চলা শেষ করিতে হয়! যখন এই দীর্ঘ যাত্রার মেয়াদ ফুরায়, সারা দেহ-মন তখন ক্ষতের জ্বালায় বেদনার ঘায়ে টন্‌টন্ করিতে থাকে!

সুষমাকে আনিয়া প্রায় বৎসর-কাল কোনোমতে কাটাইয়া দিবার পর অভয়াশঙ্কর নিজে হইতে মনের মধ্যে প্রতি পদে এমনি-নানা অশান্তি জাগাইয়া তুলিতে লাগিলেন। সুষমার কোনো দোষ? না। সে-বেচারী এই তরুণ বয়সে নিখিলের সেবাতেই সমস্ত প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছে। কম্পাশের কাঁটার মতো নিখিলকে কেন্দ্র করিয়াই সুষমা যা' এদিক-ওদিক নড়া-চড়া করিতেছে! যৌবনের সাধ? যৌবনের পিপাসা? যৌবন বস্তুটাকেই সে দু-হাতে ঠেলিয়া কোথায় সরাইয়া দিয়াছে, তাহার কোনো নিশানা মেলে না! সে আজ যুবতী নয়, স্ত্রী নয়, সে শুধু মা, নিখিলের মা। এ ছাড়া তাহার আর অন্য কোনো পরিচয় নাই!

এমনি ভাবে থাকিয়া থাকিয়া এই জীবনটাতেই সে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল যে নারীর শাস্ত্রে ঐ যে স্বামীর আদর, স্বামীর সোহাগ বলিয়া কতকগুলা কথা আছে, সেগুলা মোটেই তাহার মনে ঘেঁষ দিতে

পারিল না,—সেগুলা মনের কোণে ছোট-একটা ঢেউ তুলিতেও সাহস করিল না! সুষমা যেন একেবারে সেই তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর বালিকা-কাল কাটাইয়া হঠাৎ ত্রিশ-বৎসর বয়সের সন্তানের জননী এবং গৃহের কর্ত্রীর পদে প্রোমেশন লইয়া বসিয়াছে! মধ্যকার বয়সটা যেন মোটে তাহার নাগালই পায় নাই,—তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই!

এই আত্মপ্রসাদটুকু লইয়াই বিবাহের পর একটা বৎসর সে বেশ একরকম কাটাইয়া দিল। তারপর সহসা একদিন এটুকুতেও বাহির হইতে খোঁচা পড়িতে লাগিল।

সংসারে এমন মানুষ বিস্তর দেখা যায়, যাহারা নিজেদের কোনো লাভ, কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পরের অনিষ্ট খুঁজিয়া বেড়ায়। অভয়াশঙ্করের সংসার-দুর্গে এই যে কুটুম্বিনীর দল প্রকাণ্ড অক্ষৌহিণীর মতো খাইয়া বসিয়া গড়াইয়া নিতান্ত অলসভাবে কালক্ষেপ করিতেছিল, তাহারা এখন উপস্থিত কোনো কাজ হাতে না পাইয়া সুষমার বিরুদ্ধে দু-চারিটা মিথ্যা অপবাদ তুলিয়া অভয়াশঙ্করের কান ভারী করিতে লাগিল। সুষমা কোনো দিন ইহাদের কাহারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া কাহারো অবাধ-কর্ত্তৃত্বে মাথা গলায় নাই! সংসারে নিজেকে সকলের পিছনে সে রাখিয়াছে। তবু এই সব জ্ঞাতি কুটুম্বিনীর দল আগে চলিতে চলিতেও দুষ্ট ঘোড়ার মতো পিছনে চাট্ মারিয়া বেচারীকে জর্জ্জরিত করিতে ছাড়িল না।

সুষমার অপরাধ, সে শান্ত, সাত চড়েও তাহার মুখে কথা বাহির হয় না! আরো অপরাধ, নিখিল তাহাকে পাইয়া একেবারে অজ্ঞান! তার উপর সেবারে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় কর্ত্তা সোহাগ

করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন! কৈ, লীলাও ছিল এ বাড়ীর অত-আদরের বৌ, সে কি কখনো পশ্চিমে গিয়াছে? তবে? কর্ত্তার সঙ্গে নিখিল একা গেলেই চলিত, চাকর-বাকরে কি আর তাহাকে দেখিতে পারিত না? না পারিলেও তাঁহারা ছিলেন,—ঐ সূত্রে অমনি দু-চারিটা জায়গায় তীর্থ-ধর্ম্ম সারিয়া আসিতেন না হয়। তা নয়, তাঁহারা রহিলেন ঘরে পড়িয়া, সংসার আগলাইতে আর সঙ্গে চলিল কে? না, দ্বিতীয় পক্ষের সোহাগের বৌ! অমন করিয়া চুপ-চাপ থাকিলে কি হইবে, ও কি কম মেয়ে! বাঙালীর ঘরে ধেড়ে বৌ কখনো ভালো হয়? তাহারা ঐ স্বামীটিকেই শুধু চেনে! বৌ তো বলিতে পারিত, ওগো, ইঁহাদের সঙ্গে নাও, তীর্থ করিবেন! সবই জানা গিয়াছে গো! জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী আর এই আত্মীয়ার দল,—যত ভালো, যত বড় সম্মানের পাত্রী হোন না কেন, দাও তাহাদের ছুট করিয়া!

৯

নিখিল ইদানীং ভারী দুরন্ত হইয়া উঠিতেছে। সেদিন পড়িয়া হাত-পা ছেঁচিয়া ফেলিলে এই সব জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী তখন অবশ্য কেহ দেখিতে আসিলেন না,—কিন্তু পরে এক সময় অবসর বুঝিয়া সুষমার অসাক্ষাতে বেশ সোহাগের ভঙ্গীতে তাহার বিরুদ্ধে অভয়াশঙ্করের কানে রঙ চড়াইয়া যা-তা বলিয়া লাগাইতে আসিল। তারা বলিল,—ছেলেমানুষ বৌ—যাহোক্ পেটে এখনো একটি ধরনি তো,—ছেলের ধকল চব্বিশ ঘণ্টা সইতে পারবে কেন, বাবা? ওকেই যে এখন দেখতে হয়··· এই যে ছেলেটাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়া দিলে, তাতেই তো বাছা

দুম্ করে পড়ে গেল।···রগের কাছটা ছিঁড়ে গেছে! ভাগ্যে ছুটে গিয়ে চারটি দুব্বো ঘাস এনে ছেঁচে লাগিয়ে দিলুম।

অভয়াশঙ্কর মনে-মনে বিষম চটিলেন। কি! ছেলেটা পড়িয়া গেল, তা দেখা নাই! তার উপর আবার ভূতের ভয় দেখাইয়া ফেলিয়া দেওয়া! ঠিক! এ তো নিজের মা নয়, সাজা মা। নিজের মা হইলে কি আর এটা পারিত? কিন্তু এ রাগ তিনি প্রকাশ করিলেন না, মনে চাপিয়া রাখিলেন।

তারপর আবার সেদিন। সুষমা গা ধুইতে গিয়াছে। নিখিল সেই অবসরে ছোট আলমারির মাথায় চড়িয়া লীলার ছবির উপর সুষমা নিজের হাতে গাঁথিয়া মস্ত যে ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিয়াছে, সেটা টানিতে গিয়া ছবিখানাকে দুম্ করিয়া ফেলিয়া দিল। কাঁচ ভাঙ্গিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। সেও অমনি তড়াক করিয়া লাফ দিয়া যেমন পলাইবে, পায়ে ভাঙ্গা কাঁচ ফুটিয়া গেল। কিন্তু সে কথা কাহারো কাছে বলা চলে না! সেই কাঁচ্-ফোটা পায়েই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে একেবারে ছাদের সিঁড়ি বহিয়া চিল-কোঠায় গিয়া আশ্রয় লইল। সুষমা আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া অবাক। চীৎকার করিয়া ডাকিল,—নিখিল···

নিখিলের সাড়া নাই। ভৃত্যেরা খোঁজ করিয়া আসিয়া জানাইল, খোকা-বাবু বাড়ী নাই! সুষমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারিধারে লোক ছুটিল। অভয়াশঙ্কর গৃহে ছিলেন না। নিখিলের কোনো সন্ধান কেহ আনিতে পারিল না—ওদিকে সন্ধ্যা ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিল, সুষমা অশ্রু-সজল চোখে কত দেবতার মানত করিতেছে, এমন সময় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিখিল আসিয়া হাজির। চিল-কোঠায় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে এত খোঁজ চলিয়াছে,

সে তাহার কিছুই জানে না। মার বুকে মুখ লুকাইয়া ছবি ভাঙ্গার কথা সে ধীরে ধীরে বলিল।

সুষমা বলিল,—ছি, তোমাকে না কত দিন বলেচি নিখিল, ও আলমারির উপর উঠবে না! কথা শোনোনি? আমি আর কক্‌খনো তোমায় ভালোবাসবো না, গল্পও বলবো না আর!

নিখিল কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—না মা, সত্যি বলচি মা, আর-কক্‌খনো এমন কাজ করবো না মা।

বাড়ীতে তখন হুলস্থূল বাধিয়া গেল। গরম জল,—নরুণ,—চুণ—ডাক্তার! শুনিয়া আত্মীয়ার দল কেহই উপরে উঠিলেন না,—কি জানি, যদি খাটিতে হয়! তাঁহারা নীচে বসিয়া টিপ্পনী কাটিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া ছবির কাঁচ ভাঙ্গা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। লীলার ব্রোমাইড-এনলার্জ্জমেণ্ট কত টাকা ব্যয়ে বিলাত হইতে করানো হইয়াছে, কত যত্নের সামগ্রী—সেই ছবির এই দশা! সগর্জ্জনে তিনি ডাকিলেন—নিখিল···

নীচে রান্নাঘরে নিখিল তখন খাইতে বসিয়াছে, সুষমা পাশে বসিয়া পাখা করিতেছে, কাজেই তখনি উঠিতে পারিল না। মানদা ঠাকুরাণীকে সে বলিল—একবার যান্ না পিসিমা, উনি এসে ডাকচেন,—কি চাইছেন! নিখিলের খাওয়া না হলে আমি যেতে পারচি না···বামুনদিরও হাত জোড়া।

মানদা-ঠাকুরাণী উপরে আসিয়া কহিলেন—কি বাবা? নিখিলকে ডাকচো? সে খাচ্ছে, বৌমা খাইয়ে দিচ্ছেন। তাও বলি বাবা, এখন ডাগর হচ্ছে, নিজের হাতে খেতে শিখুক। এখন থেকে অভ্যাস করা ভালো। ঠেশে খাইয়ে দিলে পেটের মাপ বোঝা যায় না। শেষে কি জন্মের মতো লিবারের দোষ জন্মে যাবে! নতুন

বৌমার সব ভালো, কেবল ঐ গোঁ,—নিজে যা ধরবেন! যত বলি, ওরে বেটী, তুই সেদিনের মেয়ে, এ-সব বুড়োদের কথা মান্‌তে শেখ্‌! তা—যাক্‌, হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার খাবার আনতে বলবো, বাবা?

অভয়াশঙ্কর বিরক্তির স্বরেই বলিলেন—না। তার পর নিজের মনে বলিলেন,—ছবিখানা ঝুলচে কোথায় সেই তেশূন্যে, তার উপর যুদ্ধ করতে যাওয়া! নিখিল আজকাল ভারী পাজী হয়েচে, দেখচি।

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন—আহা, বকো না বাবা, মা-হারা কচি বাচ্ছা! ওর কি জ্ঞান আছে, বলো? আর তাও বলি, ছেলেদের একটু দাবে রাখা ভালো। অত আদর দিলে যে মাথা খাওয়া হয়। তা তো বৌমা শুনবেন না। এ তো আদর করা নয়, একে বলে শত্রুতা-সাধন। এই যে আমাদের কাছে এ্যাদ্দিন ও ছিল—কৈ, এ রকম হয়নি তো! কেন হবে? কি বংশে ওর জন্ম!

অভয়াশঙ্কর আরো বিরক্ত হইলেন, বলিলেন,—থামো তুমি। কি কথায় কি কথা!

মানদা ঠাকুরাণী তখন গালের মধ্যে একরাশ তামাকের গুল পুরিয়া খানিকটা পিক্‌ ফেলিয়া বলিলেন,—ও ছেলে কি ও-ছবি নামাতে পারে! বৌমার আমার যেমন ছেলেমান্ষী···বল্‌লেন, আলমারির উপর দাঁড়িয়ে পাড়ো তো! ছেলেমানুষ টাল্‌ রাখতে পারবে কেন? গেল ওটা দুম্‌ করে পড়ে। পায়ে কাঁচ ফুটে পাখানা যায়! শেষে কত করে কাঁচ তুলে দিই। চুণ দিয়ে রেখেচি,—আওরাবে না।

মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এমন অনর্গল মিথ্যা বলিতে পারে, চোখে না দেখিলে কে ইহা বিশ্বাস করিবে? কাজেই এ ধারণা অভয়াশঙ্করের মোটেই হইল না যে, কথাটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা! তাই তিনি সুষমার উপর

বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—কেন, ও-ছবি পাড়বার কি দরকার হয়েছিল ?

—কাঁচ-টাঁচ সাফ করবার জন্য,—হবে।

—তা চাকর-বাকর কাকেও বললে চল্‌তো না ? ঐ একরত্তি ছেলেকে ফরমাশ করা !

—যাক্, বকো না বাবা, ও কথা আর তুলো না। ছেলেমানুষ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। বেচারী ! আমিও অনেক বুঝিয়েচি। তবে মনে থাকে না তো ওঁর ! বড় হলে, জ্ঞান হলে এ-সব দোষ সেরে যাবে বৈ কি।

বিরক্ত হইয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—জ্ঞান আর কবে হবে ! চিতেয় সেঁধুলে ? আরো একজন মানুষও তো ছিল…কৈ, তার…

তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া মানদা-ঠাকুরাণী বলিলেন—ও বাবা, কিসে আর কিসে ! তাঁর মতো বৌ কি আর জন্মায় গা ? আমাদের যদি সে বরাতই হবে বাবা, তাহলে কি ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চলে যায় !

মানদা ঠাকুরাণীর দু চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি এখন যাও।

মানদা ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন। অভয়াশঙ্কর নিজের ঘরে আসিয়া কৌচে পড়িয়া রহিলেন। বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, চারিদিকে বিষম বিশৃঙ্খলা ! আসল যার যায়, নকল দিয়া সে চায় আসলের অভাব পূরণ করিতে ! নির্ব্বুদ্ধিতা !

বেচারী সুষমা ওদিকে জানিতেও পারিল না, তাহার নামে এখানে একজন স্বামীর মনে কি বিষটাই ঢালিয়া দিয়া গেছে ! তাহার সঙ্গে শত্রুতা নাই, তাহার কাছে কোনো অপরাধ করে নাই, কাজেই সন্দেহ হইবে কেন ?

অভয়াশঙ্কর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গম্ভীরভাবে কৌচের উপর পড়িয়া

রহিলেন। লীলা…লীলা…লীলা! হায় রে, কি স্ত্রীই তিনি হারাইয়াছেন। সুষমার বিরুদ্ধে নালিশ তুলিযা তিনি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন, এমন প্রবৃত্তি অভয়াশঙ্করের ছিল না। নিজেকে তাহাতে অত্যন্ত খাটো করা হইবে! তবে…তবে…

ভাবিয়া অভয়াশঙ্কর একটা পথ বাহির করিলেন।

সুষমা নিখিলকে লইয়া ঘরে আসিলে অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন—নিখিল…

সে স্বরে নিখিল বেশ বুঝিল, বিচারকের কৈফিয়ৎ তলবের সুর!

—বাবা—বলিয়া অপরাধী নিখিল বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ছবির কাঁচ ভাঙ্গলো কি করে?

বাপের মুখের পানে চোখ তুলিতেই নিখিল দেখিল, কি গম্ভীর, রোষ-রক্ত সে মুখ! ভয়ে নিখিলের মুখে কথা ফুটিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—বলো ··

সুষমা আসিয়া বলিল—ও আর কখনো করবে না, বলেছে। এবারটি ওকে মাপ করো।

—তুমি চুপ করো। অভয়াশঙ্করের স্বরে যেন বাজ হুঙ্কার দিয়া উঠিল। এমন স্বর সুষমা ইহার পূর্ব্বে আর কখনো শোনে নাই—তাহার সমস্ত মন চকিতে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার বেয়াদবি বড্ড বাড়চে, নিখিল। কাল থেকে আমি আলাদা বন্দোবস্ত করচি, দাঁড়াও। আদরে-আব্দারে তুমি একেবারে গোল্লায় যেতে বসেচো—কাল থেকে সব ব্যবস্থা আমি উল্টে দিচ্ছি। পরে একটু স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আজকের মতো শোওগে যাও।

ফৌজদারী আসামীর মতোই অতি ধীর পায়ে নিখিল গিয়া

বিছানায় শুইয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর কৌচটার উপর তেমনি বসিয়া রহিলেন।

সুষমা এতক্ষণ কাঁটা হইয়াছিল, এখন মুখ তুলিয়া বলিল,—বসে রইলে যে! খাবে না?

—না।

—অত রাগ করচো কেন? একখানা কাঁচ অসাবধানে ভেঙ্গে ফেলেচে…

—অন্য দশখানা কাঁচ ভাঙ্গলে দোষ হতো না। এ কোন্ ছবির কাঁচ, লক্ষ্য করে দেখেচ?

কথার শেষ দিকটায় স্বরে যেন অনেকখানি শ্লেষ মাখানো! সুষমা তাহা লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করে নাই, এমনি ভাবে বলিল—জানি। দিদির ছবির কাঁচ—নিখিলের মার ছবি।

…হুঁ। বলিয়া অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন, পরে বলিলেন, —নিখিলের ভার,—এখন ও বড় হয়েছে—আমিই এখন নিতে পারবো। এতদিন তুমি যা করেছো, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ওর জন্য আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না—কাল থেকে তোমার ছুটী।

হঠাৎ এ কথাটা এমন বেমানান্ শুনাইল যে সুষমা প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারিল না, এ-সব কথা কেন? এ কথার মানে কি? একখানা ছবির কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে, তার জন্য ছেলে এত বড় কি অপরাধ করিয়াছে যে কৃতজ্ঞতা, ছুটী—এমনি সব অর্থহীন মস্ত-মস্ত কথা তোলা!

সুষমা বলিল,—তুমি কি বলচো, আমি বুঝতে পারচি না। এ সব কথার মানে?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—মানে আর কিছুই নয়! তোমার নিজেরো আবার শীঘ্রই ছেলে কি মেয়ে—একটা হবে তো! তাকে দেখা-শোনার ভার তোমার হাতেই পড়বে। এত তুমি পারবে কেন?

চকিতে একখানা কালো মেঘ সুষমার মনের উপর ভাসিয়া আসিয়া মনের সমস্ত স্বচ্ছতাটুকুকে ঢাকিয়া দিল। গর্ভে তাহার সন্তান আসিতেছে, সত্য—কিন্তু সুষমা কি তাহাকে চাহিয়াছিল? কোনোদিন স্বপ্নেও সে কামনা করে নাই! নিখিল আছে···নিখিলকে সে নিজের পেটের বলিয়াই জানে, তবে আর একটা নূতন সন্তান লইয়া সে কি করিবে? প্রয়োজন কি? স্বামী যে প্রায় রহস্য করিয়া বলেন,—তোমার পেটে যদি ছেলে হয়, তাহলে দুই ছেলেতে জমিদারী নিয়ে লাঠালাঠি করবে আর কি! আজ এ কথায় সুষমার মনে হইল, সে কথা তবে তামাসা নয়! তাহার গর্ভে এই জীবটির আসার সম্ভাবনা অবধি স্বামীর মনেও যেন অনেকখানি রূপান্তর ঘটিয়াছে! যে-সব কথা কখনো তোলেন নাই, এখন প্রায় সেই সব কথা তুলিয়া গুম্ হইয়া থাকেন। আজ এ কথায় অভয়াশঙ্করের মনটা সুষমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল; কোথাও আর এতটুকু ঝাপ্‌সা রহিল না। অমনি তাহার অপমানিত নারী-গর্ব্ব সবেগে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল,—কী তুমি এ-সব কথা বলো, বলোতো! যে আসচে, জানি না, কে! ছেলে···না···মেয়ে! কিন্তু যেই হোক্, এ যদি স্বয়ং ভগবানও হন, জেনো, নিখিলের মঙ্গলের জন্য, তোমার দুর্ভাবনা দূর করবার জন্য একে দু'হাতে গলা টিপে আমি মেরে ফেলতে পারি। নিখিলের অকল্যাণ করবে এ?···নিখিলকে আমি পেটে ধরিনি, সত্য, তবু আমি জানি, ও আমারি পেটে জন্মেচে, ও আমার এক—ও আমার সব। ওর মঙ্গলের পথে যে কাঁটা হবে, আমার সে পরম শত্রু। তুমি স্বামী, ইষ্টগুরু, তোমার চেয়ে বড় আর আমার কেউ নয়···এই তোমার দু' পা ছুঁয়ে শপথ করচি, যখন ঘুণাক্ষরেও এ কথা তোমার মনে জেগেছে, তখন জেনো, আজ থেকে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে আমি এই প্রার্থনা করবো, যেন জন্ম নেবার

আগেই এর মৃত্যু হয়!···আমি একে পেটে ধরচি, আমি এর মা—তবু সেই মা হয়েই বলচি, এ মরুক্,—এই দণ্ডে মরুক্!

সুষমা চিরদিন অল্প কথা কয়, আজ সে এ কী হইয়া উঠিল? উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অভয়াশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন।

সুষমার পায়ের তলায় মাটীটা তখন ভয়ঙ্কর বেগে দুলিয়া উঠিয়াছে! সুষমা আর দাঁড়াইতে পারিল না,—সমস্ত ঘর চকিতে চোখের সাম্‌নে ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং চারি-ধার নিমেষে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তাহার মূর্চ্ছিত দেহখানি ধীরে ধীরে শয্যার উপর বিছাইয়া দিলেন।

১০

তার পর এক মাস ধরিয়া প্রত্যহই প্রায় সুষমার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ীর লোক ব্যাপারটাকে যখন ফিট্-না-ফাট্, ঢং-না-ঢাং বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও টিট্‌কারীর বাণে খোঁচাইতে লাগিল, অভয়াশঙ্কর তখন কড়া মেজাজে চড়া দর দিয়া নিখিলের জন্ত এক মাষ্টার-মহাশয় আনাইয়া তাহাকে সেই মাষ্টারের জিম্মায় কায়েমি করিয়া দিতে নিযুক্ত রহিলেন। সুষমার এ মূর্চ্ছার সংবাদ তেমন করিয়া তাঁহার কানেও পৌছিল না। শেষে যখন এক প্রতিবেশিনী আসিয়া কুটুম্বিনী-মহলে হঠাৎ খানিকটা ভয় দেখাইয়া গেল,—ঠিক এমনি অবস্থা ও-পাড়ার ঐ নকুড় বাগচীর দ্বিতীয় পক্ষের বৌটারও হইয়াছিল গো। বেচারী বৌটা মুরা-সতীনের হাওয়া লাগিয়া মরিতে বসিয়াছিল, শেষে কোথা হইতে সেই বিশে

চাঁড়াল আসিয়া ঝাঁটার চোটে ভূত তাড়ায়। বৌটা অমনি জল-সমেত দু-দুটা বড় কলসী দাঁতে করিয়া বহিয়া লইয়া গেল।

শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। তাই তো, ভূত! মুখের হাসি মুখে চাপিয়া মানদা-ঠাকুরাণী কমিটী ডাকিয়া প্রস্তাব করিলেন, বিশে চাঁড়ালকে এখনি আনানো কর্ত্তব্য—না হইলে ভূতের সঙ্গে ঘর করা নিরাপদ নয়। কিন্তু…

এই কিন্তুটা সকলেই মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিল। অভয়াশঙ্কর চিরদিন একরোখা, ঠাকুর-দেবতাকেই মানিতে চান না, এ তো কোথাকার ভূত-প্রেত! তাহার উপর অত-সোহাগের বৌ মরিয়া ভূত হইয়াছে, এ-কথা যাহার মুখে শুনিবেন, সে যত বড় গুরুজন হোক্ না কেন, তাহার সে-মুখ তদ্দণ্ডেই শাণের মেঝেয় ছেঁচিয়া দিবেন! কাজেই ভরসা করিয়া তাঁহার কানে ব্যাধি ও প্রতিকারের উপায়টা কেহ তুলিতে পারিল না,—শুধু ভয়ে কাঁটা হইয়া সকলে টিপ্পনী কাটা-কাজটাই বন্ধ করিল। তাহাতে সুষমার বিপদ বাড়িল। এই কমিটী বসিবার পূর্ব্বে মূর্চ্ছার সময় তবু দু-চারিজন গিয়া তাকে একটু ধরিত, মুখে-চোখে জল-আছড়া দিত, এখন ফিট্ হইলে সে ত্রিসীমা কেহ মাড়াইতে চায় না,—বরং সেদিক হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়।

সেদিন মধ্যাহ্নে ঘরের খড়খড়ির সাম্নে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সুষমার ফিট্ হইল। ফিটের মাত্রা সেদিন একটু বেশী। পাশে কেহ ছিল না। খড়খড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে সার্শির কাঁচ ভাঙ্গিয়া সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দে অভয়াশঙ্কর উপরে আসিলেন; আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, কিন্তু বিরক্তির মধ্যে মমতাও যে একটু না জাগিল, এমন নয়! বেচারী! অভয়াশঙ্কর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়া স্মেলিং সল্টের শিসির ছিপি খুলিয়া ঘ্রাণ দিয়া রোগীকে কোনোমতে

চাঙ্গা করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এ তো বিষম উৎপাতে পড়া গেল। একটু স্বস্তিতে থাকিবার আশা করিয়া কী বিপত্তিই না ঘাড়ে করিয়াছেন! এ সব বালাই কোনো কালে ভোগেন নাই! গৃহে কাহারো অসুখ দেখিলে শত হস্ত দূরে থাকাই ছিল তাঁহার বিধি—কিন্তু এখন এ-অবস্থা দেখিয়া সরিয়া থাকিলে চলে না! বাড়ীতে এই যে এতগুলা স্ত্রীলোক তাঁহারই অন্ন ধ্বংস করিয়া শুইয়া বসিয়া আরামে গা গড়াইয়া পড়িয়া আছে, ইহাদের কি এতটুকু আক্কেল হয় না? তাঁহার মন সুষমার দিকে নাই বা রহিল ততখানি, তবু তাহাকে তিনি আনিয়াছেন বিবাহ করিয়া…এ গৃহের কর্ত্রী এখন সুষমা! ইহারা সেই-কর্ত্রীকে এ-রকম অবহেলা করিবে!

উপরে অভয়াশঙ্করের হুঙ্কার শুনিয়া মানদা-ঠাকুরাণীর দলের দু-চারিজন সেখানে আসিয়া উদয় হইলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই যে লোকটা হাত-পা কেটে রক্তগঙ্গা হলো, তা তার মুখে জল দেবার জন্য তোমাদের কারো দেখা নেই! আমি সেই বাইরে থেকে এসে মুখে জল দি। তোমাদের দ্বারা এটুকু উপকারও হবে না?

ঠাকুরাণী-কোম্পানির দল ভাবিল, একবার ভূতে-পাওয়ার কথাটা পাড়া যাক্, কিন্তু অভয়াশঙ্করের রাগের ঝাঁজে বাতাস তখনো এমন তাতিয়া আছে, যে সে-কথা বলিতে কাহারো সাহস হইল না। অভয়াশঙ্কর বিষম ক্রুদ্ধভাবেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলে রমণীরা সুষমার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ বৌমা, এ তো ভালো কথা নয়, বাছা। রোজ রোজ এমন কাণ্ড—বিশেষ এই অবস্থায়! একজন রোজা ডাকিয়ে দেখানো দরকার। আচ্ছা, কি-রকম ছায়া-টায়া ছাখো বলো দিকি? পাশে-পাশে শুধু ঘোরে? না, ভয় দেখায়? কার মতো দেখতে, চিনতে পারো?

কথাগুলার অর্থ না বুঝিয়া সুষমা তাহাদের মুখের পানে কৌতূহল-দৃষ্টি তুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর তাহারা যখন স্পষ্ট করিয়াই খুলিয়া বলিল, জানাইয়া দিল যে,—এই প্রথম নয়, অমন কত জায়গায় দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীরা মৃতা সপত্নীর হাতে বিষম নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে! স্বামীর ভাগ দেওয়া কি সহজ কথা। নাই বা বাঁচিয়া থাকিল! সুষমার পেটে একটি এই আসিতেছে, কাজেই নিজের ছেলেটির পাছে কোনো খোয়ার হয়, এই ভয়ে মৃতা সপত্নী সেটির উচ্ছেদের জন্যই এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে! হোক্ বোন্,—এক-স্বামী হইলে মার পেটের বোনও পর হয়, এ কোন দূর-সম্পর্কের বোন্ বৈ নয়!—তাও জীবিত-কালে কেহ কারো মুখও দেখে নাই,—তখন সে কথা শুনিয়া সুষমার সমস্ত মন এমন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল যে কষ্ট হইলেও সে কোনোমতে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ওদিকে অভয়াশঙ্কর ভাবিতেছিলেন, সুষমার এই অবস্থায় প্রত্যহ এ রকম ফিট হওয়াটা ভালো কথা নয়! একজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া যাক্। তারপর দেখাশুনার জন্য একজনকে কাছে রাখা দরকার! কাহাকে রাখা যায়? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, শাশুড়ীর শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নাই! কিন্তু তিনি কি আসিবেন? লীলার মৃত্যুর পর তাহারি সাজানো ঘরে পা দেওয়া! তবু তিনিই যখন ধরিয়া-বাঁধিয়া আবার বিবাহ দেওয়াইয়া-ছেন, এবং সুষমা যখন সম্পর্কে তাঁহারই ভাই-ঝী, তখন হয়তো তিনি আসিলেও আসিতে পারেন!

ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া তিনি শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া দিলেন। তাঁহার যে শীঘ্র আসা দরকার, চিঠিতে সে-কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলেন।

ছেলে বলাইয়ের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির একটা পাকা রকমের বন্দোবস্ত করিয়া শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তীর্থ-দর্শনে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অভয়াশঙ্করের ডাক গিয়া পৌছিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুষমার শীর্ণ শরীর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—শরীরের এমন অযত্ন করছিস্ কেন মা? তোর হাতে যে মস্ত ভার রয়েছে। সকলের আগে সেই জন্যই যে তোর নিজের শরীরের উপর নজর রাখা দরকার। না হলে এ ভার রাখতে পারবি কেন?

পিসিমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া সুষমা বলিল,—শরীর আমার ভালোই আছে পিসিমা।

তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন লইয়া পিসিমা বলিলেন,—ভালো কত তা দেখতেই পাচ্ছি।

দুপুর বেলায় আহার করিয়া উপরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সুষমা ঘরের মেঝেয় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নূতন বন্দোবস্তে নিখিলের জন্য মাষ্টার-মহাশয় আসিয়াছেন। মাষ্টার-মহাশয়ের কাছে তাহাকে এখন রুটিন-মত সারা সকাল ও দুপুরটা থাকিতে হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাষ্টার-মহাশয়ের সঙ্গেই সে হাঁটিয়া খানিক বেড়াইয়া আসে। অর্থাৎ অন্তঃপুরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক খাওয়া-পরা বাদ একেবারে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিখিলের দিদিমা ভুবনেশ্বরী আসিয়া সুষমাকে বলিলেন,—শুয়ে কেন রে? অসুখ করেছে?

সুষমা উঠিয়া বসিল। বলিল,—না। এমনি শুয়ে আছি, পিসিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—একটু গল্প-সল্প কর্ দিকি আমার সঙ্গে। এসে এখানকার ব্যবস্থা তো আমি ভালো দেখচি না, মা। তুই কি কিছু দেখিস্ না·· শুনিস্ না?

সুষমা মুখ নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কতক্ষণই বা এখানে এসেচি! তবু আমি সবই বুঝতে পারচি, মা। এদের ঝাঁজেই তুই এমন শুকিয়ে মলিন হয়ে গেছিস্! অমন যে কাঁচা সোনার রঙ্…তাও বলি, এরা কে, বল্? ·· অভয় তো যত্ন-আত্তি করে?

সুষমা বিপদে পড়িল। সে কি বলিবে? স্বামী যত্ন-আত্তি করেন বৈ কি! তাহার অসুখ-বিসুখে দেখা-শুনা, ডাক্তার ডাকা,—তা-ছাড়া গহনা-পত্র, কাপড়-চোপড় প্রচুর দিয়াছেন, দিতেছেনও—সংসারের কর্ত্তৃত্ব তাহারি হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন,—কিন্তু হায়, এইগুলাই কি নারীর সব-পাওয়ার মধ্যে! নারী কি এইগুলা পাইয়া গৃহ-রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেই তাহার দুঃখ ঘোচে?

সুষমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন—এও আমার কেমন মনে হচ্ছে, মা, যে অভয় বুঝি তোকে তেমন ঘেঁষ দেয় না! তাকে তোর কাছে একটিবারও দেখলুম না,—এরি বা মানে কি? নিখিলই বা কোথায়? এসে সেই যা একবার দেখেচি,—এরা কোথাও গেছে নাকি?

সুষমা বলিল,—না। নিখিল বাইরে মাষ্টার-মশায়ের কাছে পড়তে গেছে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মাষ্টার-মশায় আবার এলো কবে?

সুষমা বলিল,—মাস-খানেক হবে। নিখিল সকালে খাবার খেয়ে বাইরে যায়, তার পর ন'টার পর ভিতরে আসে, চাকরের কাছে নায়,

নেয়ে ভাত খেয়ে আবার বাইরে যায়। সেইখানে বসে ছবি আঁকে, খেলা করে—মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে থাকে। দুপুর বেলা দুধ পাঠানো হয়। খেয়ে পড়ে, লেখে, তার পর পর চারটের সময় ভিতরে এসে জল-খাবার খেয়ে গা-টা মুছে বেড়াতে বেরোয়।

শুনিয়া ভুবনেশ্বরী কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে রহিলেন, পরে ডাকিলেন, —সুষু...

—পিসিমা—বলিয়া ভুবনেশ্বরীর পায়ের কাছে সুষমা মাথা লুটাইয়া দিল। তাহার দুই চোখের পিছনে জল ঠেলিয়া আসিয়া ছিল, কিছুতেই সে জল সুষমা চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন-—কাঁদিস্ নে মা। এর জন্ম দায়ী আমি। কিন্তু এ-রকম হবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি! তাই তো, তোর জীবনটা এম্‌নি করেই আমি নষ্ট করে দিলুম মা! ভুবনেশ্বরী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুষমা বলিল,—এই নিখিলকে কেড়ে নেওয়াই আমার বড় বেশী বাজচে, পিসিমা। আমার জন্ম আমি ভাবি না, কোনো দুঃখই নেই আমার। আমি নিজের জন্ম তেমন কিছু প্রত্যাশাও করিনি কোনোদিন। কাজেই সেজন্ম দুঃখ হবে কেন?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা আমি জানি। তোমার যে কত-বড় উঁচু মন, প্রথম-দিন তোমায় দেখে আমি তা খুবই বুঝেছিলুম। সেই দেখেই ভেবেছিলুম, তুমি আবার সব ঠিক করে নিতে পারবে, তোমারও কোনো দুঃখ থাকবে না। কিন্তু এ কি হলো! হায়রে, শুধু ঐ একরত্তি ছেলেটার মুখ চেয়ে নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে তোর এত-বড় সর্ব্বনাশ আমি করে বসলুম!

তারপর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বসিয়া সুষমার মুক্ত কেশরাশির মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—অভয়কে আমি বলবো একবার।

সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া শশব্যস্তে বলিল,—না, না পিসিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার সম্বন্ধে তুমি কোনো কথা বলো না ওঁকে, লক্ষ্মীটি!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা বলে তুই এতখানি হেনস্তা সয়ে পড়ে থাকবি? কিছু পাবি না—তোর সম্বল বন্ধে, সান্ত্বনা বলে? এত বড় পাপের ফল যে কখনো ভালো হতে পারে না, মা—সেই ভেবেই আমি আরো শিউরে উঠ্‌চি।

সুষমা বলিল,—না পিসিমা, আমার এখানে কোনো দুঃখ নেই। তোমায় তো বলেচি, এই এত বড় সংসারের কর্ত্তৃত্ব উনি আমারি হাতে তুলে দিয়েছেন। দাস-দাসী, লোক-জন, এ সমস্ত আমারি তাঁবে রয়েছে। নিজের হাতে আমি তাদের মাইনে দিচ্ছি, কাজ-কর্ম্ম দেখচি-শুনছি—আমাকে তারা এতটুকু অমর্য্যাদা বা অসম্মান করে না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এইটেই কি মেয়ে-মানুষের সম্বল? এইতেই তার সব পাওয়া হলো, এই কথা তুই আমায় বোঝাতে চাস্, সুষু?

সুষমা বলিল,—সব মেয়ে-মানুষের বুদ্ধি সমান না হতে পারে, পিসিমা। কেউ কর্ত্তৃত্ব পেয়েই সব পায়, কেউ বা আরো কিছুর কাঙাল!

বাধা দিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কিন্তু তুই কি ঐ কর্ত্তৃত্বের কাঙাল—এই কথা আমায় বোঝাতে চাস্?

সুষমা কিছু বলিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এ আমি জানি যে, তুই নিখিলের মধ্যে তোর সব কামনা ডুবিয়ে বসে আছিস্! সেই নিখিলকে তোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোকে একেবারে কাঙালের অধম করে ওরা ছেড়ে দেবে, এ আমার কখনই সহ্য হবে না। আমার সে নেই—কিন্তু তোকে ধরেই তার সব আমি তেমনি অটুট বজায় রাখতে চাই!

তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার

বলিলেন,—নিখিলের সম্বন্ধে এমন বন্দোবস্ত হঠাৎ হলো কেন? নিখিল তোকে মানে না? না, সে তোর কাছে আসতে চায় না?

সুষমা বলিল,—আমায় আর তেমন পায় না বলে বেচারী কি শুক্‌নো মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পিসিমা! তার চেহারা দেখেচো তো! মুখে তার হাসির চিহ্ন নেই!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—হুঁ, দেখেছি বটে—আমার কাছেও এলো না তেমন। খাবার সময় আমি বললুম,—হাঁরে, তোর মা কোথায় গেল? আসেনি? তাতে বললে, মার যে অসুখ, দিদিমা। নীচেয় নামলে মার কষ্ট হবে। বাবা আমাকে বায়না করতে বারণ করে দেছে।—আহা, বাছার চোখদুটি ছল্‌ছলিয়ে উঠলো। তারপর ঐ মানদা ঠাকরুণ বললেন, নিজের হাতে না খেয়ে ওর অসুখ করেছিল কি না, তাই ডাক্তারে বলেছে, কেউ যেন খাইয়ে না দেয়!···তাছাড়া আমার অত ন্যাওটো ছিল, তা আমার সঙ্গেও দুটো ভালো করে কথা কইলে না রে!···খাওয়া হতেই বাইরের দিকে ছুটলো, বল্‌লে,—তুমি এখানে কেন দিদিমা? যাও, মার কাছে বসো গে যাও, মার অসুখ। আমি বাইরে যাচ্ছি—মাষ্টার-মশায়ের খাওয়া দেখতে হবে আমায়।—তখন এত বুঝিনি!

সুষমা বলিল,—ঐ কথাই বলেছেন, যে নিখিল মাষ্টার-মশায়ের খাওয়ার সময় তাঁর কাছে বসে তাঁর খাওয়া দেখবে, কোনো অসুবিধা কি কষ্ট না হয় তাঁর! বলেন, ছেলে বড় হচ্ছে, এখন থেকেই ওর সব দিকে শিক্ষা হওয়া দরকার।

—বটে! বলিয়া ভুবনেশ্বরী চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ভুবনেশ্বরী স্থির করিয়াছিলেন, পাঁচ-সাত দিন এখানে কাটাইয়া তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িবেন—কিন্তু তাহা পারিলেন না।

এই বাড়ীর মধ্যে অন্তঃপুরখানি দখল করিয়া অভয়াশঙ্করের অন্নে যে জীবগুলি শরীরের পুষ্টি সাধন করিতেছিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা ও ধরন-ধারণ হইতে ভুবনেশ্বরী স্পষ্ট বুঝিলেন,—সুষমার বিরুদ্ধে মিথ্যা করিয়া কিছু লাগাইতে পারিলেই সকলে বর্ত্তাইয়া যায়! অথচ সুষমার দোষ যে কি, তাহারও একটা সুস্পষ্ট আভাস কেহ দিতে পারে না। ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই যে একটা আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব, সুষমার অসুখেও কেহ তাহার দ্বারে উঁকি দিয়া উদ্দেশ লইতে চাহে না—এই সহানুভূতির অভাবই সুষমাকে মারিয়া রাখিয়াছে! চোখে তিনি স্পষ্টই দেখিয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলে নানা গল্প ফাঁদিয়া হাসির দমক তুলিয়া আসর জমাইয়া দিয়াছে, সুষমা যেমনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সকলের হাসি-গল্পের স্রোতে ভাঁটা পড়িল, কাজের অছিলা তুলিয়া কে কোথায় সরিয়া গেল। কেন—এ কেন? ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভুবনেশ্বরী ইহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না।

অথচ এই-সবগুলার জন্যই যে সুষমার মনে সুখ নাই, শরীর ক্রমশঃ কৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ইহাও তিনি বেশ বুঝিলেন। এ-অবস্থায় সুষমার মনটাকে স্ফূর্ত্তিতে রাখা ভারী প্রয়োজন—নহিলে পেটের সন্তানই নয়, সুষমাকেও শেষে রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে। ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, যতদিন সুষমা ভালোয়-ভালোয় প্রসব না হয়, ততদিন তিনি এখানে থাকিয়া যাইবেন। তা ছাড়া অভয়াশঙ্করকে বলিয়া নিখিলকে

সুষমার সঙ্গী করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া নিখিলকে এখন সুষমার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

সেদিন সুষমাকে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আজ অভয় খেতে এলে আমি বলবো, যে পর্য্যন্ত ভালোয়-ভালোয় তোরা দু'জন দু'ঠাঁই না হোস্, নিখিলকে যেন তোর কাছেই রাখে। তোর মনও তাতে ভালো থাকবে।

মিনতির সুরে সুষমা বলিল,—না পিসিমা, আমার কথা কিছু ওঁকে বলো না তুমি।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কিন্তু তোর মনটাকে যে ভালো রাখা দরকার মা।

সুষমা বলিল,—তোমার যেমন কথা! আমার মন বেশ আছে, পিসিমা। কে বললে তোমায়, আমার মনে স্ফুর্ত্তি নেই?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—শরীর যা হয়েচে, পেটের ওটা বাঁচবে কেন?

উত্তরে সুষমা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল, বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ঐ মাগীগুলোর দিকে ফিরেও তাকাস্ নে মা। এ তো আত্মীয় পোষা নয়, সাপ পোষা। তাকেও কি কম জ্বালান জ্বালিয়েছে! ঐ মানদা-ঠাকরুণ—ওঁর বিষ কি কম! এক বারের কথা বলি তবে, শোন্,—সেদিন দ্বাদশী,—দ্বাদশীর দিন ভোর হবার আগেই মা আমার উঠে স্নান-টান সেরে ওঁকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে ওঁর জলখাবার সাজিয়ে দিত—সেদিনও তাই করে শ্বেত-পাথরের রেকাবিখানি সাজিয়ে সামনে যেই ধরে দেছে, জানিনা, ওঁর কি হয়েছিল,—উনি কট্‌মট্ করে চেয়ে সেই রেকাবিতে মারলেন এক লাথি—লাথি খেয়ে সে-বেচারী মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল, রেকাবিখানাও দেয়ালে ঠুকে ভেঙ্গে চুরমার! মা আমার তখনি উঠে মাগীর সেই পা

ধরে সেধেছে,—কি অপরাধ হয়েছে?…উনি এমন মানুষ! তা ওদের কথায় কিছু মনে করিস্‌নে, মা!…কে ওরা?

সুষমা বলিল,—না পিসিমা, আমি ও-সব কিছুই মনে করি না। ওঁদের খাওয়া-দাওয়া সব আমি নিজে দেখি-শুনি—সাধ্যমত কোনো ত্রুটি থাকতে দিই না। মুখ ফুটে নিন্দাও করিনি কোনোদিন, তবু কারো মুখে হাসি দেখলুম না কখনো, এই আমার বড় দুঃখ, পিসিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—হাসির বরাত করে' কি ওরা এসেছিল মা, যে ওদের মুখে তুই হাসি দেখবি! সব সংসারেই এই রকম গোম্‌ড়া-মুখো সাপ দু'একটা আছে। আমাদেরো একটু-আধটু ভুগতে হয়েছিল বৈ কি, মা—তোদের বয়সে। তবে এতখানি নয়। যাই হোক্‌, অভয়কে আমি বল্‌চি, যে বাবা, ছেলে যদি মানুষ করতে চাও তো তাকে এ সংসর্গে রেখো না, অন্য ব্যবস্থা করো। অভয়ের মনেও এজন্য কম অস্বস্তি! লীলা থাকতেও ছিল, এখনো রয়েছে।

বৈকালে নিখিল খাইতে আসিলে দিদিমা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—তোর মার অসুখ নিখিল, তা তুই তোর মার কাছে দু'দণ্ড বসিস্‌ না কেন রে?

নিখিল বলিল—সেজঠাকুমা বলছিল, মার অসুখ, মার কাছে গিয়ে মাকে জ্বালাতন করতে বাবা বারণ করেছে—তাই যাই না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মার জন্য মন কেমন করে না তোর?

নিখিল মুখে কোনো জবাব দিল না—দিদিমার কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ একেবারে ছল-ছলিয়া উঠিয়াছে।

দিদিমা বলিলেন,—আয় মার কাছে। মার কত আহ্লাদ হবে।

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, সুষমা-বেচারীকে সঙ্গ দিয়া নিখিল যে তাহাকে

একটু সুখে রাখিতে পারে, এটুকুর বিরুদ্ধেও ঐ রমণীগুলার কি এ নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! অথচ···কেন? সুষমা কি করিয়াছে? কি অপরাধ? কোনো ধনে কাহাকেও সে বঞ্চিত করে নাই—কোনো বাদ সাধে নাই! নামেই সে সংসারের কর্ত্রী—কিন্তু আসল কর্ত্তৃত্ব তো উহাদেরি হাতে!

নিখিলকে পাইয়া সুষমার খুব আনন্দ হইল, নিখিলও কতদিন পরে মাকে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল। মার বুকে মুখ গুঁজিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সে ডাকিল—মা···মা··

—বাবা—বলিয়া সুষমা দু-হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া তাহাতে অজস্র চুমা দিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভুবনেশ্বরী সে-দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সেদিন হইতে নিখিলের সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলা একটু শিথিল হইল। সুষমার শরীর ও মন যদি একটু স্বস্তি পায়—পাক্! মাষ্টার-মহাশয়ের কাছে পড়ার সময়টুকু ছাড়া দিনের বাকী সময়টুকু সে সুষমা আর দিদিমার কাছে গল্পে খেলায় কাটাইবার অনুমতি পাইল।

## ১৩

দু-তিন মাস মন্দ কাটিল না। তারপর একদিন শেষ-রাত্রে হঠাৎ সুষমার সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া এক ভীষণ যন্ত্রণা ঠেলিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল জ্বর দেখা দিল।

ডাক্তারের ভিড়ে বাড়ী ভরিয়া গেল—এবং অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে পাঁচ-সাত দিন কাটাইবার পর সুষমা এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া একেবারে নিশ্চেতন হইয়া পড়িল।

পাশ-করা নার্শের তদারকে এবং ভুবনেশ্বরীর অক্লান্ত সেবায় প্রায় সপ্তাহ-পরে কঙ্কাল-সার দেহখানি নাড়িয়া সুষমা কোনোমতে পাশ

ফিরিয়া শুইল,—পরে শীর্ণ চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষীণ স্বরেই ডাকিল,—পিসিমা···

ভুবনেশ্বরী কাছেই ছিলেন, বলিলেন,—কেন মা ?

শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি ভুবনেশ্বরীর পায়ের উপরে রাখিয়া সুষমা বলিল—কৈ···পিসিমা ?

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, সুষমা কি চাহিতেছে। নার্শকে ইঙ্গিত করিলে নার্শ ঘাড় নাড়িয়া চোখের ইসারায় জানাইল, না !

সুষমা ক্ষীণ কণ্ঠে আবার ডাকিল—পিসিমা···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বুঝেচি মা, কি চাইছো। আগে সেরে ওঠো, তখন দেখো।

সুষমা বলিল—না পিসিমা, তুমি বলো···

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ছেলে।

সুষমার মুখে আনন্দের এতটুকু আভাষ দেখা গেল না। সে চুপ করিয়া চোখ বুজিল।

ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—এখন কথা কয়ো না মা, চঞ্চল হয়ো না, ডাক্তার বকবে। আগে সেরে ওঠো—সব পাবে।

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল,—বেঁচে আছে ?

নার্শ বলিল—আছে বৈ কি, বৌদিদি।

সুষমা বলিল,—এত এতেও আছে !···কি হবে পিসিমা ?

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল আসিল। তিনি কিছু বলিলেন না, সজল চক্ষে সুষমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

সুষমা চোখ বুজিয়া ছিল—তাহার চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুষমা ডাকিল,—পিসিমা···

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কেন মা ?

অতিকষ্টে মৃদু স্বরে সুষমা বলিল—ঠাকুর-দেবতাও মিথ্যা হলো, পিসিমা ! আমি যে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলুম…

—কি প্রার্থনা, মা ?

—ও যেন মরে !

ভুবনেশ্বরীর দুচোখে বাণ ডাকিল। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া তিনি বলিলেন,—ষাট্, ষাট্ ! ও কথা বলতে আছে মা ? মা হয়ে সন্তানের সম্বন্ধে ? ছি মা…

সুষমা বলিল—না পিসিমা, ওকে তোমরা মেরে ফ্যালো।

—সুষু…

সুষমা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—সত্যি মেরে ফ্যালো, পিসিমা। ও আমার নিখিলের শত্রু—তার বিষয়ের ভাগ নেমে, তার সঙ্গে লাঠালাঠি করবে। মেরে ফ্যালো, ওকে মেরে ফ্যালো।

—ছি, ছি, চুপ করো ! ও সব কি বলছো মা ?

ভুবনেশ্বরী দেখিলেন, সুষমার ঘন-ঘন শ্বাস পড়িতেছে—সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

নার্শ বলিল,—আপনি ঘুমোন্ বৌদিদি।

সুষমা বলিল,—না, আগে ওকে মেরে ফ্যালো, তবে ঘুমোবো। মেরে ফ্যালো ওকে…মারবে না ? তাহলে দাও, আমাকে দাও। বলিয়া সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

ভুবনেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—কাকে মারবে মা ? সে কি আর আছে ? সেই দিনই সে গেছে।…তেমন বরাতই যদি তোমার হবে…

সুষমা বলিল,—গেছে ! নেই ? সে মারা গেছে ? পিসিমা, সত্যি করে বলো।

আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সে কি বেঁচে এসেছিল মা, যে যাবে! পেটের মধ্যেই তার সব শেষ হয়েছিল। যে পাষাণী মা তুমি!

—সত্যি?…সত্যি পিসিমা?

—হ্যাঁ মা, কেন মিথ্যে কথা বলবো! মা হয়ে তুমি যখন ঐ প্রার্থনাই করেছিলে…

—সাধে করেছিলুম, পিসিমা!…আঃ, বাঁচলুম! বলিয়া ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিলেন। ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া, বুক দেখিয়া ইংরাজীতে বলিলেন,—প্রোগ্রেসিং ফেয়ার্লি, তবে ভারী সাবধানে রাখতে হবে। কোনো এক্‌সাইটমেণ্ট না হয়।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—সাবধানেই রাখা হবে। যে ব্যবস্থা বলবেন, তাই করবো।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া সুষমা আবার এ পাশ ফিরিয়া অভয়াশঙ্করের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—এবারে আর তুমি রাগ করবে না আমার উপর? বলো…

অভয়াশঙ্কর কাছে আসিলেন, সুষমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া তাহার কপালে হাত রাখিলেন; রাখিয়া বলিলেন,—রাগ কেন করবো সুষমা!

অতি মৃদু কণ্ঠে সুষমা বলিল,—রাগ নয়? নিখিলকে তবে কেড়ে নিয়েছো কেন…যদি ছেলে হয়, ঝগড়া করবে বলে? কেমন, বলেছিলুম তো, প্রার্থনা করচি, সে মরবে। ঠাকুর আমার সে প্রার্থনা শুনেচেন। …তুমি আর রাগ করবে না? বলো।

সুষমা ধীরে ধীরে অভয়াশঙ্করের হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল।

অভয়াশঙ্করের বুকের মধ্যে কি-একটা যেন ঠেলিয়া উঠিতে ছিল! স্থির দৃষ্টিতে তিনি সুষমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন,—মমতায় প্রাণ ভরিয়া গেল।

রোগ-শীর্ণ দৃষ্টিতে অভয়াশঙ্করের পানে চাহিয়া সুষমা বলিল,—আর রাগ করো না, লক্ষ্মীটি! সে গেছে, আর তো নিখিলের ভয় নেই। তুমিও নিশ্চিন্ত হলে!…বলো, রাগ নেই আমার উপর? বলো…

অভয়াশঙ্কর কোনো জবাব দিলেন না। তাঁহার পলক-হীন চোখ হইতে এক ফোঁটা গরম জল টপ্ করিয়া সুষমার গালের উপর ঝরিয়া পড়িল।

১৪

প্রায় তিন মাস পরে সুষমা তাহার শীর্ণ শরীরটাকে কোনোমতে খাড়া করিতে পারিলে ডাক্তার আসিয়া পরামর্শ দিলেন, রোগীর একবার চেঞ্জে যাওয়া দরকার;—বাহিরের জল-বাতাসে চট করিয়া সারিয়া উঠিবেন।

বাড়ীতে তখন কমিটি বসিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ সাব্যস্ত করিলেন, লোকজন সঙ্গে দিয়া সুষমাকে তাহা হইলে কাছাকাছি এই দেওঘরেই পাঠানো যাক্। অভয়াশঙ্করের যাওয়ার সুবিধা হইবে না; সম্প্রতি বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তদারক একটু ঢিলা পড়িয়াছিল, সেটাকে আবার আঁটিয়া লইতে হইবে। এবং নিখিলের পক্ষে যাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ নূতন করিয়া তাহার পড়াশুনার বন্দোবস্ত হইয়াছে! তাছাড়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া অভয়াশঙ্কর একা এখানে তিষ্ঠিতে পারিবেন না।

তবে সুষমার সঙ্গে ভুবনেশ্বরীকে যাইতে হইবে,—নহিলে সে-বেচারী ছেলেমানুষ···তাকে কে দেখিবে ?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিল সঙ্গে গেলে ভালো হয় বাবা, ওরও শরীর সারতে পারে। তাছাড়া নিখিলের একলাটী এখানে মন টি'কবে কেন ?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার কাছে থাকবে নিখিল,—তাছাড়া নিখিলকে পাঠিয়ে আমি একলা থাকতে পারবো না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুমি মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে এসো।

অভয়াশঙ্কর এ-কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

দুপুর বেলায় নীচে আবার কথাটা উঠিল। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিলকে আমি নিয়ে যাবো। ওর মন পড়ে থাক্‌বে সেখানে, আর ও তাতে ভালো থাক্‌বে ? কখনো না।

মানদা-ঠাকুরাণী বড় একটা ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া গলায় এক-ঘটি জল ঢালিয়া কহিলেন,—বাপ্‌রে, ওকে পাঠিয়ে আমরা এ শূন্য-পুরীতে থাকবো কি করে বেয়ান্? বলে, ও আমাদের চোখের মণি!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তোমাদের দিক না দেখে ছেলের দিকটা দেখতে হবে তো!

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন,—ছেলে বেশ থাকবে, বেয়ান্, সে জন্য তুমি ভেবো না। বাপের কাছে আদর কি ওর কম! বলে, ওকে তিলেক না দেখলে অভয় অস্থির হয়ে ওঠে!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মার জন্য ছেলে হেদুবে না ?

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন,—তা হেদুবে না। আমরা রয়েছি—তাছাড়া ও ভারী সেয়ানা ছেলে বেয়ান, সব বোঝে। বাছা মুখে কোনো কথা বলে না—না হলে ও সবই জানে। দেখেচো তো, এ-বৌমার

কাছে আজকাল মোটে ঘেঁষতে চায় না !···কেন ঘেঁষবে ? রক্তের টান তো নেই !

মানদা-ঠাকুরাণীর এ-ইঙ্গিতের অর্থ ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন,—কিন্তু এই নীচ ইতর আভাস-ইঙ্গিতগুলা লইয়া আলোচনা করিতে তাঁহার ঘৃণা হইল, কাজেই তিনি ও-প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দিয়া নিঃশব্দে ভোজন সারিয়া লইলেন,—সারিয়া উপরে সুষমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুষমা তখন ঘরে একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল. পাশে বসিয়া নিখিল। নিখিলের মুখ মলিন,—আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় একান্ত কাতর বিষণ্ণ। ভুবনেশ্বরী আসিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে, তোর মা পশ্চিম যাচ্ছে, মাকে ছেড়ে এখানে থাকতে পারবি তুই ? মার জন্য মন কেমন করবে না ?

এ-কথায় নিখিল একেবারে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমিও যাবো, দিদিমা।

ভুবনেশ্বরী তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিলেন,—ছি বাবা, এখন লেখাপড়ার সময়। এখন তোমায় লেখাপড়া করতে হবে। মার অসুখ, তাই মাকে নিয়ে আমি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি। মা বেশ সেরে টেরে আসবে, আবার তখন মার সঙ্গে থাকবে—কেমন ? এখন সেখানে গেলে তোমার লেখাপড়া যে বন্ধ যাবে ধন !

অভিমানের সুরে নিখিল বলিল,—কেন, সেখানে বই নিয়ে গেলে বুঝি পড়া হয় না ? মাষ্টার-মশাই তো সঙ্গে যেতে চাইছেন।

এ কথার কি জবাব দিবেন, ভুবনেশ্বরী খুঁজিয়া পাইলেন না ! নিজের মনে তিনি বুঝিতেছেন,—ঐটুকু তো ছেলে, ভারী তার পড়া যে দু'মাস বাহিরে গেলে সব একেবারে রসাতলে যাইবে ! বটে ! তবু এ-ব্যাপারে সমস্ত কদর্য্যতার দিকটা দু-পায়ে মাড়াইয়া ধরিয়া তিনি খুব হাল্‌কা সহজভাবেই তাহার সমাধান করিয়া দিতে চাহিলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বাবা যে একলা থাকবে এখানে তুমি কাছে না থাকলে বাবাকে কে দেখবে?

নিখিল বলিল,—বেশ, বেশ, যাও সব, আমায় নিয়ে যেয়ো না। আমি এখানে না ঘুমিয়ে রাত্তিরে লুকিয়ে কেঁদে-কেঁদে খুব অসুখ করবো, দেখো। তখন তোমাদের বেশ হাওয়া খাওয়া হবে!

ভুবনেশ্বরী নিখিলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণটা ডাক ছাড়িয়া বিরাট ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কোনোমতে সে কান্নার বেগ চাপিয়া একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—ছি দাদা, এ সব কথা বলতে আছে কি! বড় হয়েছো, বুদ্ধি হয়েছে, এখন এ-রকম বায়না করে? তাহলে মারও অসুখ সারবে না। সে কি ভালো হবে? তখন কে আদর কর্‌বে? গল্প বল্‌বে? কার কাছে বায়না করবে, মাণিক?

নিখিল আর কোনো কথা বলিল না,—দিদিমার বুকে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

## ১৫

নির্দ্দিষ্ট দিনে কয়জন দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া ভুবনেশ্বরী ও সুষমা দেওঘর রওনা হইলে ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিখিল চুপিচুপি সুষমার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটাকে ফুলাইয়া রাঙা করিয়া তুলিয়া শেষে সেই বিছানাতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর কি-একটা কাজে ঘরে আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, তারপর নিঃশব্দে বাহিরে গিয়া বারান্দায় রেলিঙ্‌ ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে একরাশ নক্ষত্র অজস্র জুঁই ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক-টুকরা কালো মেঘের আড়ালে ত্রয়োদশীর ফুটন্ত চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে; আলোর আভা চারিদিকে আধ-জাগা-গোছ ছড়াইয়া রহিয়াছে। অভয়াশঙ্করের মনে হইল, সমস্ত আকাশটায় যেন এই বিচ্ছেদের করুণ শোকের ছোপ লাগিয়াছে। সারা বাহিরটা তাই বেদনার অশ্রু কোনোমতে স্তম্ভিত রুদ্ধ রাখিয়া স্থির হইয়া আছে। তিনি ভাবিলেন, তাইতো, কাজটা অত্যন্ত রূঢ় হইয়াছে, বটে! নিখিলকে এখানে এমন করিয়া রাখা ঠিক হইল না! বেচারী সুষমা! বেচারী নিখিল! ক্রূর ঈর্ষার বশে দুই-দুইটা প্রাণীকে এই বিচ্ছেদের কষ্ট দিলাম! ঈর্ষা? ঈর্ষা ছাড়া আর কি! পড়াশুনার কষ্ট প্রভৃতি কথাগুলা—ছল, ছল, শুধু ছল! উহারা কোনো দোষ করে নাই তো। তবে? তবে? অভয়াশঙ্করের মনে বিবেক তীব্র কশাঘাত করিল।

ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় নিখিলের পাশে শুইয়া অভয়াশঙ্কর তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন,—তাহার ঘুমন্ত মুখে বারবার চুম্বন করিলেন।

নিখিলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ডাকিল,—মা…

—বাবা—বলিয়া অভয়াশঙ্কর আবার পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, ডাকিলেন,—নিখিল…

নিখিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—দেওঘরে যাবে নিখিল?

নিখিল সন্দিগ্ধভাবে বাপের মুখের দিকে চাহিল, কোনো কথা বলিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এঁর জন্য মন কেমন করছে?

বাপের কথায় সহানুভূতির সুর পাইয়া নিখিল বলিল,—হুঁ। তাহার চোখ ছল-ছলিয়া উঠিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—দেওঘরে যাবে ?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, যাইবে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বেশ, যাবো, আমরা দুজনেই যাবো। এখন এসো, দুজনে আমরা একসঙ্গে খেয়ে আসি।

নিখিল অভয়াশঙ্করের সঙ্গে খাইতে চলিল। মুখে কিছু দিতে পারিল না—বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠনলীকে চাপিয়া ধরিবে —দু গ্রাস গিলিয়া, দুবার ওয়াক্ তুলিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—থাক্, আর খেতে হবে না। শুধু দুধটুকু খেয়ে নাও।

মানদা-ঠাকুরাণী আসিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—এসো দাদা, আমি খাইয়ে দি, এসো। কেমন গল্প বলবো। খাওতো দাদা—বলিয়া একগ্রাস মুখে দেওয়াইতে গেলেন, নিখিল সেটা তুলিয়া ফেলিল।

অভয়াশঙ্কর বিরক্ত হইয়াছিলেন—এই যে ছেলেটা একলা ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, খাওয়া-দাওয়া করে নাই, তা এ লোকগুলার সেদিকে হুঁশও নাই! তিনি নিজে তাহাকে খাওয়াইতে না আনিলে নিখিলের খাওয়াই হইত না! সুষমা থাকিলে এগুলায় কোনো গোল বাধিত না! হায়রে! ইহারা করিবে ছেলেকে মানুষ, ছেলের তদ্বির! নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই চব্বিশ ঘণ্টা সকলে মত্ত! ইহার উপর মানদা-ঠাকুরাণীর এই মন-জোগানো গোছের আদর দেখিয়া রাগিয়া তিনি বলিলেন.—বলচি, ও আর খাবে না, শুধু দুধটুকু থাক্,—না, আবার গিলিয়ে দিতে আসা হলো।

একটা ধমক দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যাও, তোমরা ওকে বিরক্ত করো না। ওর যা খুশী, খাবে—জোর করে গিলিয়ে দিতে হবে না।

ধমক্ খাইয়া মানদা-ঠাকুরাণী সরিয়া পড়িলেন,. নিখিল দুগ্ধ পান করিয়া পিতার সঙ্গে উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

দেওঘরে যে বাঙলাখানা লওয়া হইয়াছে, সেটা নন্দন-পাহাড়ের কাছে। বেশ ঝরঝরে বাঙলা। দেখিয়া সুষমা বলিল,—নিখিল এলে কি চমৎকারই হতো পিসিমা! এই খোলা জায়গায় পাহাড়-টাহাড় দেখে ভারী খুশী হতো সে।

ভুবনেশ্বরী কোনো কথা বলিলেন না।

সুষমা বলিল,—একসঙ্গে সকলে কেমন বেড়িয়ে বেড়াতুম! এ মিছে আসা হলো, পিসিমা।

তবু সকালটা-বিকালটা বেড়াইয়া গোলেমালে এক-রকম করিয়া কাটিয়া যায়; দুপুরে আর সন্ধ্যার পর হইতে সময়টা অত্যন্ত ভারী হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসে। একান্তে নির্জ্জন ঘরে দুটি রমণী প্রাণের মধ্যকার সমস্ত বেদনা নিঃশেষে তখন নিংড়াইতে বসে। তাহার তীব্র বিষাক্ত রসে দুইজনের মনই জর্জ্জর অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুইজনের চিন্তা এক—নিখিল এখন কি করিতেছে? কাহার কাছে আছে? কে দেখিতেছে? আহা, হয়তো মুখখানি চুণ করিয়া খোলা জানলার সামনে বসিয়া আছে—জানলার বাহিরে ওধারে অনিবিড় বন স্তম্ভিত হইয়া তাহার শিশুচিত্তের নির্ব্বাক বেদনা লক্ষ্য করিতেছে! বেচারা নিখিল!

সেদিন বৈকালের দিকে নন্দন-পাহাড়ের নীচে দু-তিনটি তরুণী বাঙালী-নারী ছেলে-মেয়ে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিল। ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হরিণ-শিশুর মতো নাচিয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল, আর

তরুণীরা তৃণশয্যায় বসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিল। এই অপরিচিত ছেলেমেয়েদের খেলার লীলা-ভঙ্গে সুষমার ক্ষুব্ধ মন কোন্ সুদূর পল্লীগ্রামে অমনি এক লীলা-চঞ্চল অন্তরের সন্ধানে ছুটিয়া গেল। বিরস বদনে একান্ত মন্থর পঙ্গুর মতো কোন্ নির্জ্জন কোণে কাতর হইয়া পড়িয়া আছে নিখিল!

সুষমার মন অসহ্য যাতনায় ভরিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—চলো মা, বস্‌লে কেন? চলো, পাহাড়ের উপর একটু বেড়িয়ে আসি।

সুষমা বলিল,—আজ আর পারচি না পিসিমা, এইখানেই একটু বসো। রোজই তো পাহাড়ে উঠচি।

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই ছেলেমেয়েগুলিকে দেখিয়া সুষমার নিঃসঙ্গ মন মাতৃত্বের ক্ষুব্ধ বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন,—তা বেশ, এইখানেই বসি।

সুষমা বলিল,—ওরা কারা, পিসিমা? ওদের চেনো? আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে, ছাখো। ভাব করলে হয়! এখানে নেহাৎ একলা রয়েচি, এসে অবধি কারো সঙ্গে ভাব-সাব হলো না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ভালো কথা বলেচিস্ সুষু।

দুজনে উঠিয়া তরুণীদের কাছে গিয়া বসিলেন। তিনটিই তরুণী,—দুজন সধবা, একজন বিধবা। আলাপ করিয়া জানিলেন,—সধবা তরুণী দুটি সম্পর্কে জা,—বিধবাটি ননদ,—বয়স অল্প। কলিকাতায় বাড়ী—পরিবার লইয়া দুই ভাই চেঞ্জে আসিয়াছে। ছোট-জা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—নিজের ছেলেপিলে হয় নাই, সপত্নীর একটি পুত্র এবং একটি কন্যাকে সে মানুষ করিতেছে। ছেলে-মেয়ে উভয়েই তাহাকে নিজের মা বলিয়া জানে।

ছোটটিকে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি ভাই?

ছোট জা বলিল,—আমার নাম মণিকা।

সুষমার পরিচয়টুকুও ভুবনেশ্বরী সংক্ষেপে বলিলেন। শুনিয়া বড় জা বেলা বলিল,—ওমা, ছেলেকে রেখে এসেছো! আহা, বেচারীর কত মন কেমন করছে, না জানি!

ভুবনেশ্বরী পাকা গৃহিণী। ভিতরকার ব্যাপারগুলাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য তিনি বলিলেন,—ছেলে বড় হচ্ছে,—এখন লেখা-পড়ার সময়·· ছুটোছুটি করে বেড়ালে লেখাপড়া হবে না।

বেলা বলিল,—তা হোক্। ছেলের শরীর-মন আগে, না, লেখাপড়া আগে? আপনার জামাই ভালো কাজ করেন নি কিন্তু। এই যে আমার ঠাওর,—ঐ ছেলে-মেয়ে দুটি তার চোখের তারা, মণিকা যখন বাপের বাড়ী-টাড়ী যায়, কখনো ওদের আটকে রাখে না···ওর সঙ্গে পাঠায়। বাপের বাড়ীতে মণিকা অমন একমাস দেড়মাস কাটিয়ে আসে। আমাদের কত মন কেমন করে। বলি,– ছেলেটি আমার কম ন্যাওটো নয়—আমি যদি বলি, অমিয় আমার কাছে থাকুক, তাতে আমার ঠাওর বলে,—না বৌদি, তুমি বোঝো না, ওর সঙ্গছাড়া থাকলে একদিন বুঝে ফেলবে, বুঝি এ আমার মা নয়,···সব ছেলেই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আমিই বা থাকি না কেন! আসল গাছের ডাল যখন নয়,—এক গাছের ডাল অন্য গাছে বেঁধে দেছো, তখন তিলেক ছাড়া-ছাড়ি করা ঠিক নয়,—এক সঙ্গে মিশে বাড়বে কেন?···মণিকে সে ঐ ছেলে-মেয়ের উপর অবাধ কর্তৃত্ব দিয়েছে। ব্যবহারে ঠিক পেটের ছেলের মতো,—আদর-শাসন, যখন যা দরকার, করবে, তাতে ঠাওর কখনো হাত দেয় না। বলে, বরাতে এ রকম অবস্থা যখন হলোই, তখন মানুষের হাতে সম্পর্কটাকে বড় করে তুলতে হলে চারধার থেকে জোগান্‌ও তেমনি দেওয়া চাই, নাহলে কোথায় একটু আল্‌গা থেকে গেলে সমস্ত বাঁধনটাই ঢিলে হয়ে আচম্‌কা একদিন খুলে যেতে পারে!

ভুবনেশ্বরী মনে-মনে এ-কথা খুবই বোঝেন, কিন্তু অভয়াশঙ্কর যে কেন এ-বিষয়ে রাশটাকে একটু ঢিলা করেন না, এইটেই তাঁর সব-চেয়ে বড় দুঃখ। মেয়ে তো গিয়াছেই—কাঁদিয়া-কাটিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাইবার যখন কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার যে স্মৃতি, যে চিহ্নটুকু বর্ত্তমান আছে, তাকে অটুট খাড়া রাখিতে গেলে আশে-পাশে যে কৃত্রিম খুঁটির আগড় বাঁধিয়া দেওয়া দরকার, সেগুলাকে বেশ কায়েমি করিয়া তোলাও যে একান্ত প্রয়োজন, নহিলে যেটুকু আছে, সেটুকুকে তেমন খাড়া রাখা যাইবে কেন?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভাগ্যবতী মণিকার পাশে নিজেকে এত ছোট মনে হইতে লাগিল, যে ইচ্ছা হইতেছিল, এখান হইতে উঠিয়া ছুটিয়া সে গৃহের কোণে গিয়া নিজেকে আবদ্ধ রাখে! কিন্তু পা দুটা পাথরের মত ভারী বোধ হইতেছে, নাড়া যায় না!

নানা গল্পে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায় হইলে সকলে গৃহে ফিরিল। ফিরিবার সময় ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমাদের বাড়ী এসো মা একদিন, বেশী দূরে নয়। এই কাছেই। ঐ সাহেবদের বাংলা আছে, তার ঠিক পাশে। সামনের ফটকে পাথরের উপর লেখা আছে, মার্ট্‌ল লজ্‌। সেই বাড়ীতে আমরা থাকি। ছেলে-পিলে নিয়ে এসো মা,—নেহাৎ একলা আছি আমরা।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সুষমা সেদিন গুম্‌ হইয়া রহিল। চোখের সামনে তাহার সুদীর্ঘ জীবন-পথ যেন প্রচণ্ড মরুভূমির মতে ধূ-ধূ করিতেছে! দুঃখ-ক্লান্তি ঘুচাইতে মাথা গুঁজিবার জন্য কোথাও এতটুকু আশ্রয় নাই,—সুদীর্ঘ পথে এমন একটা বৃক্ষ বা তরুকুঞ্জ

দেখা যায় না,—যাহার ছায়ায় দু-দণ্ড লুটাইয়া সে একটু বিশ্রাম করে! প্রাণ-ঝল্‌সানো তপ্ত রৌদ্রে চারিধার খাঁ-খাঁ করিতেছে! হায়রে, এখানে কোথায় মিলিবে স্নেহ-শীতল স্নিগ্ধ একতিল আশ্রয়-ভূমি!

ভুবনেশ্বরী ডাকিলেন,—সুষু…

—কেন পিসিমা?

—এখানে আর থেকে কি হবে? খুব হাওয়া খাচ্ছিস্! চ, বাড়ী যাই। তোকে সেখানে রেখে আমিও বেরিয়ে পড়ি। যা দেখ্‌চি. তোকে দগ্ধে মর্‌তে হবেই,—আমিই তার জন্য তোর চারি-ধারে বেড়া আগুন নিজের হাতে জেলে দিয়েছি মা।…তবু জেনে এ আগুন জ্বালিনি মা,—শুধু এই ভরসায় ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইছি। তাবলে তুই দিবারাত্র জ্বলবি, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো, একটু জলও দিতে পারবো না—প্রাণটাকে এত কঠিন করে এখনো গড়ে তুলতে পারিনি!

—তুমি কোথায় যাবে, পিসিমা?

—তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াবো। আর-জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম মা, তাই এ-জন্মে এত যন্ত্রণা ভোগ করছি। একটা মেযে—সেটাকে খুইয়ে সব শোক-দুঃখের জড় মেরেই বসেছিলুম, কোথা থেকে আবার তোকে ধরে এনে এ কি নতুন শোক-দুঃখ গড়ে তুললুম, বল্ দিকিন!

—তুমি চলে যাবে পিসিমা?…নিখিলের কথা ভাবচো না?

—নিখিল! সে আমার কে, মা? একটা কাঁটা…দিবারাত্র খচ্‌খচ্ করছে। কাজ নেই মা, আর আমার নিখিল-টিখিলকে জড়িয়ে। নিখিল যার ছেলে, সে তাকে দেখবে। এই তো আমি তাকে দেখতে এসেছিলুম, পারলুম দেখতে? ভগবান্ সে অধিকার দেন্‌নি মা, আমাকে! তার বাপ বেঁচে থাকুক শত বর্ষ পরমায়ু

নিয়ে, আমার ও পরের ধনে গিঁট বাঁধতে যাওয়া কেন?...তবে মাঝে থেকে তোকে আগুনে ফেলেচি, এইটেই হয়েছে আমার মস্ত জ্বালা!

—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো পিসিমা, তোমাকে দেখবো-শুনবো।

—তা হয় না মা। তোর এই বয়স···যৌবনেই যোগিনী হবি! সংসারের কোনো স্বাদই পেলিনে তো!

—সংসারের কোনো স্বাদ আমি পেতে চাইনে পিসিমা। ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছাও তা নয়। নাহলে পিসিমা, ভাবো দিকি, ছেলেবেলা থেকে কি ঘটনা-চক্রেই না পড়চি! তা ছাড়া সংসারও আমাকে চায় না, পিসিমা—তুমি তো স্বচক্ষে সব দেখেচো।···আমার জন্য সংসারে কোথাও কারো এতটুকু বাধবে না।

ভুবনেশ্বরীর প্রাণ দুঃখে গলিয়া গেল। করুণ দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—তবু আশা রাখো মা। এর মধ্যেই নিরাশ হয়ো না। সংসার মস্ত পরীক্ষার জায়গা। অনেকখানি ধৈর্য্য নিয়ে এখানে চলতে হয়—একটুতে অধীর হলে সব ছারে-খারে যায়, সুষু।

—কিন্তু এ কি একটু, পিসিমা?

পিসিমা কোনো জবাব না দিয়া সুষমার মুখের পানে চাহিলেন, দেখিলেন, সুষমার দুই চোখে জল টল্‌টল্‌ করিতেছে। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সংসার ছেড়ে আমার সঙ্গে ঘুরতে যাবি, বলছিস্—তোর নিখিলের মায়া তুই ছাড়তে পারবি?

মৃদু হাসিয়া সুষমা বলিল,—নিখিল আমার কে, পিসিমা? তার উপর আমার কি জোর, কিসের অধিকার আছে যে···

কথাটা সুষমা শেষ করিতে পারিল না, মুখের সে মৃদু হাসিটুকুও অদৃশ্য কিসের আঘাতে মুহূর্ত্তে যেন প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মতো দপ্‌

করিয়া নিবিয়া গেল, গলার স্বরও কিসের বেদনায় ভারী হইয়া বাধিয়া গেল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিল তোমার কে, তা তুমি জানো না মা, আমিও জানিনা। তোমার অন্তর্যামী যিনি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—না মা, আমি মিথ্যা কথা বলছিলুম এতক্ষণ। আমার মন এখনো স্বার্থের বিষে ভরে আছে, তাই তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না। তোমাকে থাকতেই হবে, সুষু। আমার নিখিলকে ঐ একরোখা জামাই আর তার বাড়ীর সেই রাক্ষসীগুলোর হাতে রেখে আমি কোথাও নড়তে পারবো না। তোমার যত কষ্টই হোক্, সব সয়ে নিখিলকে নিয়ে তুমি থাকো। বলো, থাকবে? আমার সব-হারা অন্তরের আশীর্ব্বাদ, চিরদিন তোমার এ-দুর্দ্দশা কখনো থাকবে না সুষু, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। আমি যদি যথার্থ হিঁদুর মেয়ে হই,—যদি সতী হই, তাহলে আমি বলচি, আজ যে-পুরীতে সকলে তোমায় দু'পায়ে থেঁৎলে বেড়াচ্ছে, সেই পুরী আবার একদিন মাথায় তুলে তোমাকে সেখানকার সিংহাসনে বসাবে, সে-পুরীতে তুমি রাজরাজেন্দ্রাণী হয়ে বসবে। এ যদি না হয়, তোর পিসির সতীর গর্ভে জন্ম হয়নি জানিস্,...আর জানিস্, তোর পিসি নিজেও অসতী!

উত্তেজনায় ভুবনেশ্বরীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। সুষমা তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল,—তুমি ক্ষেপেচো পিসিমা, এ-সব কি বলছো! ছি ছি, চুপ করো।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—না মা, আর আমি পারি না। যেদিন অভয়ের ওখানে তোমাকে দেখতে ঢুকেছিলুম, সব দেখে-শুনে সেই দিন থেকে ভিতরে-ভিতরে গুমে গুমে জ্বলে আমি ছাই হচ্ছি! চুপ করতে আর পারলুম না।...তোর কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেছি। কিন্তু এও জানি, তোর মন বড় উঁচু, এ-পৃথিবীর কাদা-মাটিতে গড়া নয়।...আমার জহুরীর চোখ

মা, প্রথম দিন তোকে দেখেই এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। লীলাকে হারিয়ে আমার প্রথমে বড় ভাবনা হয়েছিল,...এমন-একজনকে এনে তার জায়গায় বসাবো, যাতে আমার সব বজায় থাকে। আমায় তুই চিনতিস্ না—ভাবতিস্, পিসিমা তোকে অত আদর-যত্ন করে! কিন্তু ঐ একটি স্বার্থের জন্তই তোকে এই বুকে টেনে নিয়ে ছিলুম—বুকে রেখেওচি, রাখবো চিরদিন।...জানতুম, পুরুষ-মানুষের বৌ-মরার শোক দু'দিনের! জানতুম, দু'দিন, না হয় দশদিন, না হয় দশমাস, নাহয় দশ বছর পরে অভয় আবার বিয়ে করবে, তখন কোথাকার কে-একটা এসে সব ভাসিয়ে একাকার করে দেবে,—তাই তাড়াতাড়ি তোকে তার হাতে অমন করে গছিয়ে দিয়েছিলুম! আমি যথার্থ বলচি মা, যতদিন বাঁচবে, তীর্থে তীর্থে কোনো দেবতার কাছে নিজের পরকালের কোনো প্রার্থনা জানাবো না, নিজের কোনো কামনা নয়,—শুধ্ এই প্রার্থনা করবো, যেন সংসার তোকে চিনতে পারে চিনে তোর যোগ্য মর্য্যাদা তোকে দেয়!... ঐ সংসারে আমার নিখিলকে কোলে নিয়ে একদিন তুই রাজরাণী হয়ে বসবি —আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ হবেই সুষু, আমার মন আমাকে এ-কথা বলছে!

## ১৭

সুষমার দেওঘরে আসিবার তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা অভয়াশঙ্করের কাছ হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত—নিখিলের অসুখ, এখনি সকলে চলে এসো।

ঠাকুর-দেবতার পায়ে প্রাণের অজস্র মিনতি ঢালিয়া সুষমা ও ভুবনেশ্বরী আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন। উদ্বেগে ভুবনেশ্বরীর প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল। বুঝি, অবহেলার মস্ত পাপের ফল এইবার ফলিয়া

যায়! ভগবান নিরপরাধীর উপর এ অত্যাচার সহিবেন কেন? সুষমা শুধু কাতর অন্তরে ডাকিতে লাগিল—ঠাকুর···ঠাকুর···

সন্ধ্যার পর প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ী থামিলে সুষমা সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বিরাট পুরী কি এক দুর্ভাবনায় গুম্ হইয়া রহিয়াছে,—আর তাহার অন্তর ভেদ করিয়া এক দারুণ আতঙ্ক রাক্ষসের মতো হাঁ করিয়া আছে! ভুবনেশ্বরী ও সুষমা পাগলের মতো পুরী প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতেই সম্মুখে দামু চাকরকে দেখিয়া বলিলেন,—খপর কি রে, দামু?

দামু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—খোকাবাবুর বড্ড অসুখ, দিদিমা। কেবল মাকে ডাকছে,···মার কাছে যাবে বলে কেবলি কেবলি বায়না করছে।

—কি অসুখ?

—জ্বর, খুব জ্বর। আজ সাতদিন একজ্বরী, দিদিমা। কলকাতা থেকে দু'জন বড় ডাক্তার এসে মাথার শিয়রে বসে আছে। ঘড়ি ঘড়ি ওষুধ খাওয়াচ্ছে।

ভুবনেশ্বরী ও সুষমা ছুটিয়া নিখিলের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঘরে লোক গম্‌গম্ করিতেছে, আর বিছানার উপর জীর্ণ পাতের মত ছোট্ট দেহখানি পড়িয়া—কপালে পটি আঁটা,···মাথায় রবারের ব্যাগ ধরিয়া পাশে বসিয়া অভয়াশঙ্কর ও কি নিখিল? বাছারে!

কোনো বাধা না মানিয়া সুষমা একেবারে তাহার শিয়রে গিয়া বসিল—অভয়াশঙ্করের হাত হইতে রবারের ব্যাগ কাড়িয়া খুব সহজভাবেই নিজের হাতে লইল। অভয়াশঙ্কর নিঃশব্দে তাহার হাতে ব্যাগ ছাড়িয়া নিতান্ত অপরাধীর মতো একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখের পিছনে অশ্রুর স্তূপ জমাট বাঁধিয়া ঠেলা দিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরী জামাতার খুব কাছে আসিয়া বলিলেন,—আছে তো বাবা?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আজ একটু ভালো আছে। জ্বরটা কমছে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বাঁচবে?

দারুণ আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল!

কাছেই যে ডাক্তার বাবুটি মেজর-গ্লাসে ঔষধ ঢালিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—ভোর নাগাদ জ্বর ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। ভাবনা নেই,—সেরে যাবে! তার উপর ওর মাকে এনেছেন—মার জন্যই ভাবতো কি না, তাই থেকেই অসুখ।

শুনিয়া ভুবনেশ্বরী এমন এক কঠিন দৃষ্টিতে অভযাশঙ্করের পানে চাহিলেন, যে সে-দৃষ্টির অর্থ অভয়াশঙ্কর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন। সে-দৃষ্টি একেবারে কাঁটার চাবুকের মতো তাঁহার হাড়ে গিয়া বিঁধিল!

অনেক রাত্রে অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি এসে অবধি মুখ-হাতও ধোওনি সুষমা! যাও, হাত-পা ধুয়ে মুখে কিছু দাও গে, দিয়ে এখানে এসে বসো। ব্যাগটা ততক্ষণ আমাকে দাও। বরফ ফুরিয়ে গেছে। বলিয়া ব্যাগ লইবার জন্য তিনি হাত বাড়াইলেন।

সুষমা সেদিকে লক্ষ্যও করিল না—চকিতের জন্য সে উঠিয়া জল ফেলিয়া ব্যাগে আবার বরফ পুরিয়া নিখিলের মাথায় সেটা চাপিয়া বিছানায় বসিল। চোখের অপলক দৃষ্টি নিখিলের মুখের উপর।

নিখিলের কপালে হাত রাখিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এসে যা দেখেছিলুম, তার চেয়ে নরম পড়েচে না জ্বরটা?

কপালে হাত দিয়া সুষমা বলিল,—হ্যাঁ।

মানদা-ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন,—তুমি উঠে মুখে কিছু দিয়ে এসো বৌমা। আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, আমরা বসছি!

দু চোখে তীব্র ঘৃণা ভরিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তার চেয়ে তুমি

ঘুমোওগে বেয়ান, খেয়ে-দেয়ে একটু না গড়াতে পেলে তোমার অসুখ হতে পারে!

এ-কথার পর মানদা-ঠাকুরাণী ঘর হইতে সরিয়া পড়া কঠিন ভাবিয়া প্রথমে সেইখানেই খানিক দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর মেঝেয় চুপ করিয়া বসিলেন, এবং আরো কিছুক্ষণ পরে গা গড়াইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ভোরের দিকে—মা—বলিয়া নিখিল চোখ মেলিল। বাহিরে তখন ভোরের পাখী সবেমাত্র প্রভাতের বন্দনা-গান জাগাইয়া তুলিয়াছে।

চোখ খুলিয়া নিখিল ডাকিল,—মা···

সুষমা বলিল,—এই যে বাবা, আমি।

—তুমি এসেচো?

—এসেচি বাবা।

নিখিল খানিকক্ষণ চাহিয়া সুষমাকে দেখিল, পরে সুষমার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, তুমি আমার সত্যি-মা নও? আমি তোমার পেটে জন্মাইনি?

সুষমার বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! বাপরে, এ কি কথা! সুষমা বলিল—হ্যাঁ বাবা, আমিই তোমার মা—আমার পেটেই তুমি হয়েছো।

মানদা ঠাকুরাণী তখন ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন,—দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া হাই তুলিয়া ঘুম ছাড়াইবার অভিপ্রায়ে খোলা জানলার পানে চাহিয়া আছেন।

নিখিল বলিল—না মা, তুমি মিছে কথা বলছো! তুমি যদি সত্যি মা, তবে পশ্চিমে যাবার সময় আমাকে কেন সঙ্গে নিয়ে যাওনি? তুমি

মিছে কথা বলচো। আমি জানি। আমি আর-এক মার পেটে জন্মেছি। আমার ভালো মা···ঐ ছবির মা,—আমি সব জানি!

সুষমা বলিল,—এ কথা কে তোমায় বলেচে? ছি, বলতে নেই। তুমি আমার এই পেটেই হয়েচো, আমিই তোমার মা।

আব্দার তুলিয়া নিখিল বলিল,—না, তুমি আমার মা নও। সেজ-ঠাকুমা বলে, তুমি সৎমা। আমি বোকা, কিছু জানি না বুঝি?

ভর্ৎসনার সুরে সুষমা বলিল,—ছি নিখিল, পাপ হয়, মাকে এ-কথা বলতে নেই। যে তোমাকে বলেচে, সে জানে না, মিথ্যা কথা বলেচে। বলিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে সে মানদা-ঠাকুরাণীর পানে চাহিল।

অভয়াশঙ্করও সেই মুহূর্তে দু চোখে আগুন জ্বালিয়া মানদার পানে চাহিলেন। সে-দৃষ্টি মানদাকে নিমেষে দগ্ধ করিয়া দিল। মানদা দ্রুত সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অভয়াশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—পাজী, হতভাগা মাগী! যার খাবে, তারই বুকে আগুন জ্বালবে! শয়তানী!

সুষমা তাড়াতাড়ি বলিল,—ছি ছি, ওগো, কি বলছো তুমি? চুপ করো। তোমার ঘরে এই রোগা ছেলে···এখনি গাল দেবে, শাপ-মন্যি দেবে!

## ১৮

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর জোর-তাগিদে সুষমা স্নান সারিয়া ভিজা চুলগুলাকে পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া নিখিলের শিয়রে আসিয়া বসিল। নিখিলের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, বিছানায় শুইয়া দিদিমার হাত হইতে আঙুর লইয়া একটা-দুটা করিয়া মুখে

দিতেছিল। সুষমা শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

নিখিল সুষমার পানে চাহিয়া বলিল,—বলোনা মা, একটা গল্প…

নিখিলের শীর্ণ গালে হাত বুলাইয়া সুষমা সস্নেহে বলিল,—কি গল্প বলবো, বলো?

—সেই শঙ্খমালার গল্পটা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তাহলে তুমি মার কাছে থাকো দাদা, আমি স্নান করে আসি,—কেমন?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া বলিলেন,—একবার টেম্পারেচারটা দেখলে হয় না? ডাক্তারকে স্নান করতে পাঠালুম, সারা রাত জেগেছে। আর তাও একটা রাত নয়, ক'দিনই চলেছে। নেয়ে কিছু খেয়ে বেচারী একটু ঘুমিয়ে নিক্। নিখিল বেশ কথা কইছে! ও ভালোই আছে, বোধ হয়! বলিয়া তিনি নিখিলের কপালে হাত রাখিলেন। নিখিল বাপের মুখের দিকে চাহিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেমন আছো, বাবা? ভালো আছো এখন —না?

নিখিল বলিল,—হুঁ।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আর অসুখ করবে না। এবারে সেরে উঠবে। সেরে উঠলে রেলে চড়ে কত দূরে বেড়াতে যাবো আমরা… কেমন?

নিখিল বলিল,—আমি মার সঙ্গে যাবো, বাবা!

মাথা নাড়িয়া স্মিত হাস্যে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হুঁ।

সুষমা থার্মোমিটর ঝাড়িয়া অভয়াশঙ্করের হাতে দিলে ভুবনেশ্বরী

বলিলেন,—এখন ভালোই আছে, বাবা। আর কেন ওকে কাটি-মাটি দিয়ে জ্বালাতন করা।

অভয়াশঙ্কর থার্ম্মোমিটর দেখিলেন,-টেম্পারেচর ৯৭ ডিগ্রী। তিনি বলিলেন,—কি ইচ্ছা হচ্ছে এখন, নিখিল?

নিখিল বলিল,—মার কাছে গল্প শুনবো।

নিখিলের স্বর যেন একটু কুণ্ঠিত—ব্যাকুল নিবেদনে ভরা।

অভয়াশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া নিখিলের পানে চাহিলেন,—তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুমি যাও বাবা, স্নান-টান করে নাওগে। তোমারো তো আর এক-রাত্তিরের ধকল যাচ্ছে না। যাও অভয়, সুষু এখানে আছে, আর তোমায় কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। আমিও স্নান করে এখানে এসে বসছি। তুমি পুরুষ-মানুষ, এ-সব কি তোমার কাজ! নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলের ভার তুমি ওর হাতে দিতে পারো। ছেলেও এবার দেখো, সেরে উঠবে। আর কোনো ভয় নেই, আমি বলচি।

ভুবনেশ্বরী স্নান করিতে গেলেন।

অভয়াশঙ্কর কোনো কথা বলিলেন না—নিখিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি তাহলে নাইতে যাই, বাবা—কেমন? এঁর কাছে তুমি থাকো··· গল্প শোনো।

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলেন। ছেলে আরাম হইয়া উঠিয়াছে, আর বোধ হয় জ্বর আসিবে না—ইহা ভাবিয়া মন হাল্কা হইলেও একটা চিন্তা বেদনার ঢেউ তুলিয়া ক্রমাগত ধাক্কা দিতেছে। এই ছেলেকে তিনি

প্রাণের অজস্র আদর আর স্নেহ দিয়াও ভুলাইতে পারেন নাই,—আর আজ·· সুষমাকে দেখিবামাত্র ছেলের শরীরে-মনে সর্ব্বত্র হাসির কী জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

ইহাতে দুঃখ কি! বেদনাই বা কেন? নিখিলকে আরামে রাখিবার জন্যই তো সুষমাকে গৃহে আনা! তবে? ছেলেকে সে ভালো রাখিবে, বুকে পূরিয়া রাখিবে—ছেলের অত-বড় অভাবের বেদনা মাথা ঝাড়া দিয়া আর না দাঁড়াইতে পারে!

ছেলের আরামের জন্য এই যে আর-একজনকে আনিয়া হৃদয়ের আসনে বসাইয়াছেন, বাপের ইহাতে কতখানি ত্যাগ, কতখানি দরদ! তবু সেই-বাপকে সুষমার জন্যই না ছেলে উপেক্ষা করিতেছে! এই অত্যন্ত-হীন ক্ষুদ্র চিন্তা উদয় হইবামাত্র অভয়াশঙ্করের সমস্ত মন একান্ত কুণ্ঠিতভাবে ছি-ছি করিয়া উঠিল! অতি-বড় দাতার আসনে বসিয়া এতখানি যে দান করিতে পারে, এই ছোট্ট দানটুকুর জন্য সে কুণ্ঠিত হয়! অভয়াশঙ্কর জোর করিয়া এ-চিন্তাকে দু-পায়ে চাপিয়া মাড়াইয়া স্নান করিতে গেলেন।

স্নানান্তে নিখিলকে আবার দেখিতে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন, নিখিলের পাশে সুষমাও আড় হইয়া শুইয়া তাহাকে গল্প বলিতেছে—নিখিলের সমস্ত প্রাণ সে-গল্পে কেমন সাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন সুষমার সে-গল্পের রস নিখিল প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছে, ··সুষমার ভিজা চুলের রাশি বালিশের উপর এলানো···তাহার মুখে-চোখে আনন্দের কি দীপ্তি···সহজ সরল কথায়-বার্ত্তায় নিখিলকে সুষমা এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে রোগের পাণ্ডুরতা মুছিয়া নিখিলের সমস্ত অবয়বে স্বচ্ছ হাসির লহর খেলিয়া যাইতেছে—তখন অভয়াশঙ্করের প্রাণটা

মুহূর্ত্তের জন্ম অসহ্য কি-এক ভাবের উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল!

ভুবনেশ্বরী অন্যত্র ছিলেন। অভয়াশঙ্করকে দেখিয়া সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া বলিল,—তুমি একটু জিরোওগে,—নিখিল ভালোই আছে। আমি রযেচি,—ও বেশ গল্প শুনছে।

অভয়াশঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই পর-মেয়েটির কাছে তাঁহার মাতৃ-হীন পুত্র কি চমৎকার পোষ মানিয়াছে! এতটুকু অস্থিরতা নাই,—কি সহজ প্রফুল্ল ভাব! যে-ছেলের সুখের জন্ম, আরামের জন্ম তিনি ব্যাকুল, সেই ছেলেকে সুষমা এমন আনন্দ দিতে পারিয়াছে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে-চিন্তা মনকে দংশনের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিতেছিল, সে চিন্তার গলা টিপিযা মন হইতে তিনি দূর করিয়া দিলেন। মনকে বলিলেন, না, না, সুষমার কাছে ইহার জন্ম কৃতজ্ঞ থাকা চাই,—সুষমাকে আর উপেক্ষা করা নয়, উপেক্ষা করা চলিবে না!

## ১৯

দশ-বারো দিন পরে নিখিল পথ্য পাইলে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমায় এবার তোমরা ছুটি দাও বাছা। আমার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এবার অভয়কে দেখে আমার দুশ্চিন্তাও কেটে গেছে। আর তোর ভয় নেই, সুষু!

শেষের কথাগুলার দিকে মনের কিছুমাত্র ঝোঁক দেয় নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া সুষমা বলিল,—তুমি কোথায় যাবে, পিসিমা?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বলেচি তো মা, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াবো। আমার আর সংসারে থাকা চলে না মা, থাকা উচিত নয়।

সুষমা এবার আসিয়া অবধি একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছে,—তাহার প্রতি অভয়াশঙ্করের অতিরিক্ত মনোযোগ আর যত্ন! সুষমার খাওয়া-দাওয়ার তত্ব লওয়া, সুষমার বিরুদ্ধে মানদার দলের ভিতর হইতে কোনো অভিযোগ উঠিলে গভীর তাচ্ছল্যে সেগুলাকে উপেক্ষা করা,—নিখিলকে সুষমার কাছে রাখা—এ-সবগুলায় অভয়াশঙ্করের কি সুগভীর মনোযোগ!

তবু সুষমার বয়স তরুণ,—এই আদর-যত্নের মধ্যে স্বামীর ভালোবাসার চেয়ে কৃতজ্ঞতার ভাগই যেন বেশী,—এটুকু সে স্পষ্ট বুঝিল। বুঝিয়া নিজের মনকে সে ঠিক করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিয়াছে—অভিনয় করিবার জন্য তাহাকে যে-পার্টটুকু লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইটুকুই সে বলিয়া যাইবে! যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারি মধ্যে শেখানো-মত অভিনয়টুকু সে সারিয়া যাইবে,—নিজের মনকে সে-অভিনয়ে মিশাইতে গেলে চলিবে না! আনন্দে মন ভরিয়া উঠিলেও যদি তখন করুণ রসের ভূমিকা-অভিনয়ের পালা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে মুখে-চোখে যেমন করুণ ভাব ফুটাইতে হইবে,—তেমনি আবার বেদনায় মন ভাঙ্গিয়া ছেঁচিয়া গলিয়া গেলেও কৌতুক-রসের পালা আসিয়া পড়িলে সেই ভাঙ্গা-ছেঁচা মনকেই জোড়া-তাড়ায় খাড়া করিয়া তাহাতে হাসির ফুল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে! হায়রে, এ-জন্মটা এমনি কলের পুতুলের মতোই তাহাকে শুধু অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে!

ভুবনেশ্বরী বাহিরটাই দেখিতে ছিলেন, মনের ভিতরকার অলি-গলির অত তত্ত্ব রাখেন নাই। কাজেই সেদিককার কিছুই তিনি জানিলেন না।

তাই অভয়াশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া ব্যাপারটা তিনি ভালো বলিয়াই বুঝিয়াছেন। সুষমাও ভিতরকার কথা ভাঙ্গিল না। সে মেয়ে-মানুষ, স্বামীর ভালোবাসা কি বস্তু, আর যত্নই বা কি,—এ দুটা জিনিষে প্রভেদ কোথায়, সে তা খুবই বোঝে। ভুবনেশ্বরী যে সে-সবের কোনো সন্ধান পান নাই, ইহা দেখিয়া সুষমা আরাম পাইল। বেচারী পিসিমা! এটুকু জানিয়াই তিনি শেষের কটা দিন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিন্! দুঃখ যা-কিছু, তা সুষমারই থাক্! নিজের মনকে ভাঙ্গিয়া থেঁতো করিয়া বেদনা যতটুকু পাইবার, তাহা পাইয়াও যদি নিখিলকে সে সুখে রাখিতে পারে, নিখিলকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, তবেই সুষমার জীবন সার্থক হইবে! ইহার বেশী আর কিছুই সে এ-জন্মে কামনা করে না!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুই কি বলিস্? অভয়কে কাল রাত্রে আমি বলেচি, তার অমত নেই···তুইও অমত করিস্ নে মা, পায়ে আর আমার শিকল দিয়ে এঁটে রাখিস্ নে—ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে পড়ি! এর পর আবার কোন্‌দিন কি ঘটবে, কে জানে! আমি কানেও কিছু শুন্‌তে চাইনে, চোখেও কিছু দেখ্‌তে আস্‌বো না।

সুষমা বলিল—হ্যাঁ পিসিমা, তুমি যাও। সত্যই তো, আমরা নিজেরা যদি পরে কোনোদিন দুঃখই পাই, তাবলে তার মধ্যে তোমায় আর জড়িয়ে আনি কেন! তুমি পরকালের কাজ করোগে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বেঁচে থাকো মা, সুখী হও, সবাইকে সুখে রাখো। মা-কালীর কাছে এই প্রার্থনা করি, তোমার যেমন বড় মন, এমনি বড়-সুখেই তুমি সুখী হও! তবে মধ্যে মধ্যে খোঁজটা-খপরটা দিয়ো! নিয়ম করে খপর চাইছি না, তার বড় দোষ,—তবে ন'মাসে-ছ'মাসে খপর পেলেই চলবে।

সুষমা বলিল—তাই হবে, পিসিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিলের সম্বন্ধে তোমায় কোনো কথা বলবার নেই,—তবে এইটুকু শুধু বলে যাই মা, অভয়ের মেজাজ বড় ভালো নয়। তোমার দাম সে আজো বোঝেনি। বুঝবে বলে মনেও হয় না। যদি কোনোদিন বোঝে, তাহলে তার নিজেরই তাতে মঙ্গল।...ও সে-দাম বোঝেনি বলেই বলচি, যদি নিখিলকে নিয়ে কোনো দিন ওর দুর্বাক্য এমন হয়ে ওঠে যে তোমার পক্ষে তা সওয়া অসম্ভব তবু আমাকে মনে করে তা সহ্য করো।...এইটুকু জেনে রেখো সুষু, যতদিন তুমি, ততদিনই নিখিল। তুমি যদি কোনোদিন নিখিলকে ত্যাগ করো, তাহলে জেনো, সেইদিনই ওর সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! তুমি ছাড়া কেউ ওকে রাখতে পারবে না!

সুষমা বলিল,—তুমি থামো, পিসিমা। এ-সব কি বকতে বস্‌লে, বলো দিকি। আমার কি হয়েচে যে তাকে আমি ছেড়ে যাবো! আর যাবোই বা কোথায়, পিসিমা? সে ঠাঁই কি আমার আছে! বলিয়া সুষমা হাসিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—বলেচি তো মা, ধৈর্য্যের বাড়া গুণ আর নেই। যত-বড় কষ্টই পাও, সহ্য করো। সহ্য করাই মনুষ্যত্ব। যে সহ্য করে, ভগবান তার মুখ চাইবেনই একদিন,—দুঃখ তার কাটবেই। অধৈর্য্যে সর্ব্বনাশ। সংসারে অধীর হলে চলে না! যে অধীর, সে কোনোদিন সুখী হতে পারে না।

শেষের কথাগুলা সুষমার কানেও গেল না। সে ভাবিতেছিল, কত-বড় আশা লইয়া সে এ-ঘরে ঘর করিতে আসিয়াছিল! এই নিখিল তাহার হইবে, এই নিখিলকে সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত-অধিকারে পাইবে, ইহাকে সে নিজের মনের মতো মানুষ করিয়া তুলিবে! ছেলেবেলায় পুতুল লইয়া খেলিতে বসিয়া তাহাকে যেমন যেমন খুশী নাড়িয়া-চাড়িয়া শোয়াইয়া বসাইয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া আরাম পাইয়াছে—সে-বিষয়ে

কোনোদিন কেহ একটা কথা বলিতে আসে নাই—তেমনি ভাবেই নিখিলকে লইয়া আজ সে মানুষ করিতে বসিবে, সে-ব্যাপারে কেহ হাত দিতে আসিবে না, বাধা দিবে না! কিন্তু হায়, কোথা দিয়া এ কি হইয়া গেল! অন্ধের মতো সে ভবিষ্যৎটাকে হাৎড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার! এখনকার এই যে এই আলোর রশ্মি—এ শুধু বিদ্যুতের ক্ষণিক রেখা! চকিতের জন্য!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আকাশের দিকে চাহিল। ধৈর্য্য! ধৈর্য্য তাহাকে ধরিতেই হইবে! মস্ত বড় কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়াছে! যেমন করিয়া হোক্, এ-কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিতেই হইবে! নিজের গোপন বেদনায় বুক যদি ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, সে ভাঙ্গিতে দিবে না!

## ২০

দশ-বারো দিন পরে ভুবনেশ্বরী চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে একবার বলাইয়ের সঙ্গে দেখা-শুনা করিয়া কাশী-হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়া শেষে কাশীতে কি বৃন্দাবনে বাকী কটা দিন স্থায়ীভাবে কাটাইয়া দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

ভুবনেশ্বরী চলিয়া যাইবার পর নিখিল এবং সুষমাকে লইয়া অভয়াশঙ্করও পশ্চিমে বাহির হইলেন। চুনার, মুঙ্গের, মিহিজাম ঘুরিয়া নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া শেষে শিমুলতলায় আসিয়া আস্তানা পাতিলেন।

সুষমা ও নিখিল এখানে আসিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়ার চিহ্ন নাই,—পরিষ্কার ঝরঝরে রাস্তা,—কোথাও দোতলার সমান খাড়া উঠিয়াছে, কোথাও একেবারে নীচু হইয়া সেই পাতালে গিয়া ঠেকিয়াছে,

—দুধারে গাছপালা, পুকুর, ঠিক ছবির মতো! পথে লোকের ভিড় নাই। সকালে-বৈকালে একজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়া কতদূরে চলিয়া যায়—কোনো ঝঞ্ঝাট নাই। ষ্টেশনের ধারে-ধারে ছোট পাহাড়—সেই সব পাহাড়ে চড়িয়া দুজনে বসিয়া থাকে। মাথার উপর স্বচ্ছ নীল নির্ম্মল আকাশ,—সামনে বহুদূর-বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তর অভিনব বৈচিত্র্য ফুটাইয়া পড়িয়া আছে—তাহারই বুকের উপর দিয়া খেলা-ঘরের ছোট গাড়ীগুলির মতো ট্রেন আসিয়া দেখা দেয়—সে ট্রেন আবার কত শত যাত্রী লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় কত দূর-দেশে চলিয়া যায়।

সেদিন বেড়াইতে বাহির হইলে ভৃত্য বংশী বলিল—এখানে একটা নদী আছে মা··মহাজোড়···সেখানে বেশ এক ঝর্ণা আছে—দেখতে যাবেন?

ঝর্ণার নাম শুনিয়া নিখিল একেবারে আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, যাবো, ঝর্ণা দেখবো।

মহাজোড়ের রাস্তা ঠিক যেন ব্রাহ্মণের গায়ে সূক্ষ্ম পৈতাটির মতো সহরের বুকের উপর দিয়া ঈষৎ বাঁকিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে। সুষমা ও নিখিল সেই পথে নদী দেখিতে চলিল। পথের দুধার ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। দুধারেই গভীর খাদ। সম্মুখে বহুদূরে প্রকাণ্ড পাহাড়—ওদিক্‌কার সমস্ত পৃথিবীকে যেন সে আড়াল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে! অনেকখানি হাঁটিয়া এক-জায়গায় বালুময় চরের মাঝখানে জলের শীর্ণ রেখা কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া আগাছার অগভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছে। জলটুকু বরফের মতো শীতল।

সুষমা ও নিখিল গিয়া বালি খুঁড়িতে জলের ছোট ছোট কুণ্ড ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নিখিল মহা-খুশী···বলিল—এইখানে মা আমরা রোজ রোজ বেড়াতে আসবো এবার থেকে।

ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিল। বংশী বলিল,—আর দেরী করবেন না মা। এখানকার লোকেরা বলে, ঐ জঙ্গলে নাকি বাঘ বেরোয়!

হাসিয়া সুষমা বলিল—দূর, কি খেতে বাঘ বেরুবে রে? এখানে মানুষ কোথায়?

বংশী বলিল—কেন মা, এই যে রাস্তা,—এই রাস্তার ওধারে করো বলে গাঁ। এই রাস্তা দিয়ে সিধে গেলে বঙ্কিনাথে পৌছুনো যায় মা। কত লোক চলে।

বাঘের নাম শুনিয়া নিখিলের কৌতূহল এমন বাড়িয়া উঠিল যে হাতের ছোট কঞ্চিটা লইয়া সে ছোট জঙ্গলের গাছ-পালা ঠ্যাঙাইতে সুরু করিয়া দিল। ওদিকে করো-গাঁয়ের দিক হইতে কজন সাঁওতাল রমণী আসিতেছিল—তাহাদের কাহারো কাঁখে ছোট কলসী, কাহারো মাথায় মাটি-লেপা ছোট ধামা। কলসীতে ঘী বা তেল, আর ধামায় আনাজ-তরকারী। রমণীদের বিচিত্র বেশ আর হাস্যময় মুখ-চোখ দেখিয়া সুষমা একজনকে কাছে ডাকিল, বলিল,—হ্যাঁ রে, এধারে বাঘ আছে না কি?

সাঁওতাল রমণীরা সুষমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না।

বংশী বলিল—ইধর শের হ্যায়?

রমণীদের মধ্যে বয়সে যে কিশোরী, সে অগ্রসর হইয়া ভাঙ্গা বাঙলায় কথা কহিল, বলিল,—না মা, শের কুথাসে আসবে? এই হামরা রাত-বিরেতে ই-পথে আসা-যাওয়া করি, শের কভি দেখেনি। আদ্মি-লোক বলে—হামরা কুছ চোখে দেখিনে। হিথা চোর আছে, মা, তুমি জেবর গায়ে ইধারকে এসো না। তোমার বাড়ী কলকাত্তায়,—না মা?

—হ্যাঁ। বলিয়া সুষমা হঠাৎ পাশের দিকে ফিরিয়া দেখে, নিখিল কাছে নাই। কোথায় গেল? সুষমা শিহরিয়া উঠিল, ডাকিল—নিখিল ··নিখিল···

খানিক দূরে জঙ্গলের ওধার হইতে নিখিল সাড়া দিল,—যাই মা। আমি ঝর্ণা খুঁজচি।

সুষমা তখন রমণীদের জিজ্ঞাসা করিল,—এধারে ঝর্ণা কোথায় আছে রে?

ঝর্ণা কথা শুনিয়া চোখে এমন বিস্ময়ের দৃষ্টি ভরিয়া রমণীরা তাহার পানে চাহিল, যে সুষমা অবাক হইয়া গেল! সে ভাবিল, ঝর্ণা কথাটার অর্থ বোধ হয় ইহারা জানে না। তখন ভালো করিয়া বুঝাইয় দিয়া সুষমা বলিল,—ঝর্ণা···বুঝচো না? পাহাড়ের গা থেকে পানি পড়ে? তাকেই আমরা বলি, ঝর্ণা!

—ও।···হাঁ, হাঁ। বলিয়া তাহারা জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল; পরে বলিল,—ঐ উরি ভিতর আছে। কিন্তু আর দেরী করোনা, মা—এখানকার লোক ভারী গরীব আর শয়তান আছে। খেতে পায় না। দু' তিন পয়সার লেগে জান্ মেরে দেয়! ঘর্‌কে যাও মা। এই কথা বলিয়া তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া গাঁয়ের দিকে চলিয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া সুষমার একটু ভয় হইল। সে ডাকিল,—নিখিল···

ঠিক তাহার ডাকের প্রতিধ্বনি তুলিয়াই যেন জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা শব্দ উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের ক্রন্দন-জড়িত চীৎকার জাগিল—ওগো মা-গো···

ভয়ে ধড়মড়িয়া বংশীর দিকে না চাহিয়াই চীৎকার লক্ষ্য করিয়া সুষমা ছুটিয়া গেল। ছোট ছোট শিশু-গাছের ডাল-পালা সরাইয়া এধারে

ওধারে ঝুঁকিয়া খানিক অগ্রসর হইয়া সুষমা দেখে, পাথরের কটা উঁচু টিপির পাশে নিখিল হুমড়িয়া পড়িয়া আছে।

—ওরে বংশী, আয়, আয়, আয় রে! বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কাছে গিয়া সুষমা দেখে, নিখিলের কপালের কাছটা পাথরে ছেঁচিয়া গিয়াছে,—মুখে রক্ত, ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে, নিখিল কাঁদিতেছে। সুষমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাছে আসিয়া দু' হাতে ধরিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল, জিজ্ঞাসা করিল—কি করে হলো?

কাঁদিয়া নিখিল কহিল,—পড়ে গেছি।

বংশী আসিয়া সুষমার কাছ হইতে নিখিলকে লইয়া কোলে তুলিল।

সুষমা বলিল—চ', জলের ধারে নিয়ে চ'। ছি বাবা, একলা কেন এলে, বলো দিকিন্! না এলে তো এ অনর্থ ঘটতো না।...এখন কি যে করি...

নিখিলকে লইয়া বংশী বালির উপর বসিল, আর সুষমা কাপড়ের আঁচল জলে ভিজাইয়া সেই ভিজা আঁচলে তাহার কপালের আর নাকের-মুখের রক্ত ধুইয়া মুছাইয়া দিল। মুছাইয়া দিয়া দেখে, উপরের-ঠোঁটের কোণটা ফুলিয়া মার্বেলের মতো হইয়াছে।

সুষমা বলিল,—এখন বাড়ী যাই, চলো। এতখানি পথ হেঁটে যেতে পারবে নিখিল?... কেন মরতে এধারে এসেছিলুম!

সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে নিখিল বলিল—বাবা মারবে। বাবাকে তুমি বলো না, মা।

সে স্বরে আশ্রয়-ভিক্ষার এমন করুণ মিনতি যে সুষমার সমস্ত প্রাণ মমতায় গলিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল—না, না, মারবেন কেন! আমি তাঁকে বলবো। নিজের দোষে তো পড়োনি!

নিখিল বলিল—বাবা শুনবে না, মা।

হায়রে, সুষমাও এ-কথা ভালো করিয়া জানে! তাই জোর করিয়া ছেলেকে সে কোনো ভরসা দিতে পারিল না। সুষমা কে—তাহার এমন কি জোর আছে যে নিখিলকে সে আশ্বাস দিবে! একটা কথা মনে হইল···এতদিন সময়টা এখানে বেশ এক-রকম কাটিয়া যাইতেছিল, কোনো জ্বালা ছিল না। নিখিলকে একেবারে অন্তরে পাইয়া সুষমা বর্ত্তাইয়া গিয়াছে। শুধু আসিবার পর একদিন সেই যা একটু গোল বাধিয়াছিল! ষ্টেশনের ওধারে নার্শারির কাছে সেই বাড়ী,—সে বাড়ীর গৃহিণী তাদের ডাকিয়া সেদিন আলাপ করিতেছিল। তাই কথায়-কথায় রাত্রি হইয়া যায়। নিখিলকে লইয়া সুষমা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। অভয়াশঙ্কর সেদিন একটুও তিরস্কার করেন নাই, গম্ভীর হইয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিবার পর শুধু একটি মাত্র বক্রোক্তি করিয়াছিলেন,···বলিয়াছিলেন,—স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে না বলেই এদেশের মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া চলে না। বেড়াতে বেরুলো যদি তো বাড়ী ফেরবার কথা মনেও থাকবে না—এ যে সর্ব্বনেশে বেড়ানো!

এ-মন্তব্যের অর্থ বুঝিয়া সুষমা শুধু বলিয়াছিল,—একজনরা ডেকে আলাপ করলেন, তাঁদের গাইয়ের দুধ দুইয়ে সে-দুধ জ্বাল দিয়ে নিখিলকে না খাইয়ে কিছুতে ছাড়লেন না!

অভয়াশঙ্কর অমনি ছোট একটা ঝঙ্কার তুলিয়া জবাব দিলেন,—বটে! বাড়ীতে ফিরতে রাত হলে সকলে ভাববে, রাগ করবে, এ-কথা বললে কোনো লোক ধরে রাখতে পারে কখনো!

সুষমা এ-কথার জবাব দেয় নাই! কি জবাবই বা দিবে? অভয়াশঙ্কর বুঝিবেন কি,—পরের কাছে এ-কথা বলিতে মেয়ে-মানুষের কতখানি বাজে! নিজের ঘরে নিজের জনের উপর এটুকু শক্তিও

তার নাই! সে এমন হতভাগিনী! এ-কথা পাঁচজনের কাছে কোন্ মুখে সে বলিয়া বেড়াইবে!

বলিলে লোকে তাহার স্বামীকেই বা কি ভাবিবে! ভাবিবে, এমন মেজাজ যে পাণ হইতে চুণটুকু খশিলেই সর্ব্বনাশ! সত্যই তো, এমন করিয়া কেহ কখনো সংসার-ধর্ম্ম পালন করে না। একটু প্রেম, একটু প্রীতি, একটু সহানুভূতির চোখে দেখিলে কি আর এটাকে ত্রুটি বলিয়া মনে হয়! অভয়াশঙ্কর না মানুন্, লোকের চোখে সুষমা তাঁর স্ত্রী! স্ত্রী বলিয়া তাহার একটা দায়িত্ব-বোধও আছে! সত্যই সে কিছু জেলখানার কয়েদী নয় যে হাজিরার ঘড়ি ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় মিলাইয়া দেওয়া চাই!

আজ নিখিলের এই অভয়-প্রার্থনার স্বরে সেদিনকার কথাটা সুষমার মনে পড়িল। মুখে সান্ত্বনা দিয়া ছেলেকে সে বলিল বটে,—কোনো ভয় নেই বাবা, সব আমি ঠিক করে দেবো। কিন্তু অন্তরাত্মা বুঝিল, ঠিক করা তাহার পক্ষে সহজ নয়! বড় কপাল-জোর হইলেই রক্ষা, নহিলে আজ গৃহে গিয়া ইহার জন্ত আর-একটা ছোট-খাটো তাল হয়তো সুষমাকে সামলাইতে হইবে!

বংশী বলিল,—এসো বাবু, কোলে এসো। এত পথ হাঁটতে পারবে না। হেঁটে গেলে বহুৎ রাত হোয়ে যাবে।

নিখিল বলিল,—না, আমি হেঁটে যাবো···দেরী হবে না।

তিনজনে আসিয়া বাড়ীর কাছে পৌছিলে সুষমা ভাবিল, যদি কিছু ভৎ‍র্সনাই মেলে! চাকরের সাম্‌নে বলিয়া অভয়াশঙ্কর রেয়াৎ করিবেন না! রাগ করিয়া এমন সব কথা হয়তো বলিয়া বসিবেন, যেগুলা তীরের মতো মর্ম্মে বিঁধিবে। সে কথার বাণ সুষমা একান্তে অনেকগুলা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারে, তাই বলিয়া চাকর-বাকরের কাছে? বড় লজ্জা করে! নিজে হইতে সে হেঁট হইয়াই আছে, তবে এমন

ভাবে ইহাদের কাছে আর অতখানি খাটো করা কেন! তাই বংশীকে বিপদের মুখ হইতে সরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে সুষমা বলিল,—তুই যা বংশী, সেই গজেনবাবুর বাড়ী—সেই যে ষ্টেশনের কাছে বাঙলা। তাঁরা আজ ভালো পাণ দেবেন, বলেছিলেন। বাবু শুক্‌নো পাণ খেতে পারেন না—সেই পাণ নিয়ে আয়, বাবুর জন্য। জল্‌দি যা।

## ২১

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। অভয়াশঙ্কর আলোর সামনে ইজি-চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে-ছিলেন, নিখিলকে পাশের ঘরে দাঁড় করাইয়া সুষমা একা আসিয়া অভয়াশঙ্করের কাছে দাঁড়াইল।

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমাদের ফিরতে আজ একটু দেরী হয়েচে..., না?

সুষমা বলিল,—হ্যাঁ, অনেক-দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। ও-ধারে কেমন একটা নদী আছে, দেখে এলুম। তুমি গেছ কোনোদিন?

—ঐ করো-গাঁয়ের দিকে তো?

—হ্যাঁ।

—ওকে নদী বলে! হুঁঃ—নর্দ্দামা! আমি দেখে এসেচি। তা সে যে অনেক দূরে। নিখিল অতদূর হাঁটতে পারলো?

—বেশ হেঁটেচে। বংশী কোলে নিতে চাইলে, গেল না। হাঁটা তো ভালো। নয়?

খবরের কাগজখানা মেঝেয় ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হাঁটা ভালো, তবে সামর্থ্য বুঝে হাঁটা চাই! তারপর কাল সকালে উঠে না

বলে, পায়ে ব্যথা হয়েছে !···তোমরা সীমা ঠিক রাখতে পারো না, এইটেই তোমাদের মস্ত দোষ! এই জন্যই তো তোমাদের বলি, অবুঝ!···যাক্, নিখিল গেল কোথায় ?

—ও-ঘরে আছে।

এইটুকু বলিয়াই সুষমা তাহার অত্যন্ত ভীত-কুণ্ঠিত মনকে নাড়িয়া-চাড়িয়া কোনোমতে সবল করিয়া তুলিয়া একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ; তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণে মুখ নামাইয়া খুব মৃদু স্বরে বলিল,—আজ সে একটা অন্যায় করে ফেলেচে। তুমি বক্‌বে না তাকে ? মাপ কর্‌বে ? বলো···

অভয়াশঙ্কর সোজা হইয়া বসিলেন ; বসিয়া বলিলেন—কি অন্যায় ?

তাঁহার গলার স্বর বেশ একটু কঠিন, কিন্তু অকম্পিত। তিনি বলিলেন,—কিছু হারিয়ে এসেচে ?

কুণ্ঠিতভাবে সুষমা বলিল,—না।

—তবে ? অভয়াশঙ্কর শিকারীর মতো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন,—কি ? নিখিল কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে বুঝি ?

ভয়ে সুষমার সমস্ত প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল,—কোনোমতে সে-ভয়কে ঠেলিয়া সরাইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল,—হ্যাঁ।

—কোথায় পড়লো ? ডাকো তাকে, দেখি।—নিখিল······

পিতার আহ্বানে নিখিল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,—তাহার সজল দুই চোখ এমন করুণ, এমন কাতর অনুনয়ে ভরা যে তাহা দেখিবামাত্র সুষমার সমস্ত অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

উঠিয়া নিখিলকে কোলের কাছে টানিয়া সে বলিল,—পড়ে ঠোঁট আর রগের কাছটা এই কেটে গেছে। জল দিয়ে ধুইয়ে দিয়েচি—এখনি একটু আইডিন দিয়ে দিচ্ছি। পাথর ছিল, তাতে কেটে গেছে।

নিখিলকে কাছে আনিয়া অভয়াশঙ্কর ক্ষত-স্থান দেখিলেন, পরে বলিলেন,—বংশী সঙ্গে রয়েচে, তুমি নিজে রয়েচো,—তবু এমন পড়লো কি করে ?

কথার এই যে ভঙ্গীটুকু, সুষমার প্রাণে এ-ভঙ্গী মুগুরের ঘা মারিল। এ তো ছেলের দোষে মাকে ভৎ র্সনা নয়, এ যে চাকরের সঙ্গে তাহাকে এক-পৈঁঠায় দাঁড় করাইয়া বিচারকের কড়া কৈফিয়ৎ-তলব !

সুষমা বলিল—আমি একজনের সঙ্গে কথা কইছিলুম,...নিখিল ঝর্ণা দেখতে গিয়ে পড়ে গেছে।

তারপর সুষমা ব্যাপারটা সংক্ষেপে খুলিয়া বলিল।

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর হইয়া শুনিলেন, পরে আরো গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হুঁ! তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—কাল থেকে ও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। তুমি আলাদা যেয়ো—ও সঙ্গে থাক্‌লে তোমার গল্প-সল্প কর্‌বার ব্যাঘাত হয়, দেখ্‌চি।...সেদিন রাত হয়েছিল, আজ আবার এই কাণ্ড! আগে আমি বুঝিনি, তাই তোমাকে দিয়ে ওর চৌকিদারী করাচ্ছিলুম। আজ শেষ। কাল থেকে তোমার ছুটি !

নিখিলকে ডাকিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে, নিখিল। ওঁর সঙ্গে গেলে তোমার বদমায়েসি বাড়ে। দেখি, আমার সঙ্গে বেড়িয়ে শান্ত-শিষ্ট হতে পারো কি না। এখন যাও, ও-পোষাক ছেড়ে তোমার ঘরে বই নিয়ে বসো গে।

এই বয়স হইতেই নিখিল পিতার আদেশ শক্তিমান্ রাজার দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মতো মানিতে শিখিয়াছে। আদেশ শুনিয়া সে-ঘর হইতে সে চলিয়া গেল। বাপের কাছে মার বা বকুনি খাইতে হইল না বলিয়া মনটা খুশী হইলেও মা এই অনর্থক এতখানি তিরস্কার ভোগ করিল, আর

সে শুধু তাহারই দোষে—এই অপ্রসন্নতা আগুনের হল্‌কার মতো নিখিলের মনে ছ্যাঁকা দিয়া অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল।

নিখিল চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর কাগজখানা হাতে লইয়া তাহারই অক্ষরগুলার পানে আবার মনঃসংযোগ করিলেন, সুষমা পুতুলের মতো নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আসিয়া একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ে হাত রাখিয়া বলিল,—তুমি রাগ করেচো? বলো...

—না, রাগ কিসের! আর কেনই বা রাগ কর্‌বো? বিশেষ তোমার উপর রাগ করতে পারি কখনো? তুমি আমার ছেলেকে অত-বড় সঙ্কট-পীড়া থেকে আরাম করে তুলেচো!

—ও কি কথা বল্‌চো!

ক্ষুব্ধ-অভিমানে সুষমার দু চোখে জল ছাপাইয়া আসিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—ও যদি তোমার পেটের ছেলে হতো, তাহলে কি আর ঐ জঙ্গলের ধারে তার কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারতে তুমি!

সুষমার চোখের সম্মুখে কি কতকগুলা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া ছোট-বড় মূর্ত্তি রচিয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—কি করে তোমায় বোঝাবো, কি কর্‌লেই বা তুমি বুঝবে? কিন্তু বড় ভুল বুঝচো তুমি! এই ভুলের জন্য নিজে কষ্ট পাও, আমায় কষ্ট দাও, ছেলেটার অবধি সে-কষ্ট বাদ পড়ে না! কেন যে এ ভুল বোঝো তুমি অত বিদ্বান হয়ে, বুদ্ধিমান হয়ে!

সুষমার দু চোখ বহিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই অভয়াশঙ্কর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন—যাই, নিখিলের পড়াটা একটু দেখে দি—ওর মাষ্টার-মশায় আরো পাঁচ-সাতদিন পরে আসবেন, লিখেচেন। এর

মধ্যে আসা ঘটবে না।...ভালো কথা, নিখিল আজ আমার সঙ্গেই খেতে বসবে—অর্থাৎ তোমার ঘাড়ের বোঝা যতটা হাল্‌কা করতে পারি! ...অনেক ঋণেই ঋণী আছি...ঋণের বোঝা আরো ভারী করে তুলি কেন!

এই সব কথার খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সুষমা যাতনায় জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, আর কোনো কথায় থাকা নয়—দাসী-চাকরদের মতোই সে শুধু এ-সংসারে কর্ত্তব্য সারিয়া যাইবে! স্নেহের আব্‌দার তুলিয়া এমন করিয়া স্নেহ-বস্তুটার অপমান ঘটিতে দিবে না!...কিন্তু কি করিয়া তা হয়? সে উপায় যদি থাকিত!

তাই মনের ক্ষতের সে-জ্বালা কোনোমতে চাপা দিয়া কুণ্ঠিত স্বরে সুষমা বলিল,—লুচি খেতে কি পারবে ও? ঠোঁট কেটে গেছে! ওর জন্য গাইয়ের দুধ দুইয়ে আন্‌তে পাঠিয়েচি—সে দুধ এলে আমি নিজে জ্বাল দিয়ে দেবো।

—শুধু দুধ? বেশ!...বলিয়া অভয়াশঙ্কর সে-ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। সুষমা তেমনি করিয়াই পুতুলের মতো নিস্পন্দ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

বংশী আসিয়া যখন সুষমাকে বলিল,—দুধ এনেচি মা। আর পাণ! আপনি রান্নাঘরে একবারও গেলেন না,—ঠাকুর জিগ্‌গেস করচে, একসঙ্গে ও-দুধ জ্বাল হবে, না, আলাদা হবে?—তখন সুষমার হুঁশ হইল। চমকিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া সুষমা দেখে, ন'টা বাজে! তাই তো, কতক্ষণ এমন কাঠের মতো সে দাঁড়াইয়া আছে! অপ্রতিভ হইয়া সুষমা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিল।

## ২২

পরের দিন সকালে উঠিয়া পোষাক পরিয়া নিখিল আসিয়া যখন সুষমাকে ডাকিল,—বেড়াতে যাবে না মা? বা রে, এখনো তুমি কাপড়-চোপড় পরোনি!—সুষমার মন তখন অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। নিখিলের পানে চাহিয়া সুষমা বলিল,—আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, বাবা। তাই আজ আর বেড়াতে যাবো না, মনে করচি।

সুষমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া নিখিল বলিল—কি-অসুখ করচে মা?

সুষমা দু হাতে তাহার মুখের পরশ লইয়া সস্নেহে বলিল,—এমন কোনো অসুখ নয় রে, পাগলা। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়-নি কি না, তাই বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছে না।

—আমি তবে কার সঙ্গে যাবো? বাবার সঙ্গে সত্যিই যেতে হবে? না মা, বাবার সঙ্গে যেতে আমার ভয় করে। আমিও তাহলে আজ বেড়াতে যাবো না।

সুষমা বিপদে পড়িল,—স্পষ্ট করিয়া নিখিলকে বলিবে, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, সে-শক্তি তাহার নাই। সেই যে কাল রাত্রে উনি বলিয়াছেন, আজ হইতে নিখিল তাঁহার সঙ্গেই বেড়াইতে যাইবে—কি জানি, সে-কথা যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন! তাহা হইলে···আজ আবার এ-কথা তুলিতে গেলে হয়তো নূতন একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে এবং সে হাঙ্গামায় আরো কত কথার হুল যে সুষমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিবে, তাহারো ঠিক নাই! সে নিখিলকে বলিল—আজ তাহলে বংশীর সঙ্গে বেড়াতে যাও, না হয়!

নিখিল বলিল,—না মা, থাক্ গে, বেড়াতে আর যাবো না। তার চেয়ে আমি ওই সাম্‌নের বাগানে বেড়াইগে, কেমন প্রজাপতি ধরবো—বেশ হবে। তুমিও একটু পরে এসো।

—আচ্ছা।

একটা বল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে নিখিল বাহির হইয়া গেল। সুষমা একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

নিখিল চোখের আড়ালে গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল—তোকে পেটে ধরি-নি, এ আমার কম আপ্‌শোষ! তোর উপর কোনো জোর, কোনো অধিকার খাটে না রে! তুই যদি আমার এই পেটে হতিস্‌, তাহলে দেখতুম, কে তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়,—এমনি উল্টো হুকুমে মার প্রাণ কেমন করে' সে বেঁধে রাখতে পারে!—আমি বেড়াতে যাবো না শুনে ঐ যে তুই বল্‌লি, তুইও যাবি না···এত দুঃখেও এ আমার কম সান্ত্বনা!—এটুকু না পেলে এতদিনে আমি পাগল হয়ে যেতুম!

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বিছানায় বসিয়া খোলা জানলার মধ্য দিয়া বাহিরে পথের পানে চাহিয়া রহিল। সাম্‌নে পরিচ্ছন্ন রাস্তা বাঁকিয়া কতদূরে সেই দুটা উঁচু টিলার মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রে চারিধার ঝলমল করিতেছে! ও পথে,—মাঝে মাঝে কত লোক চলিয়াছে। জোয়ান সাঁওতালরা গরু-মহিষ তাড়াইয়া গৃহে-গৃহে দুধ জোগাইতে চলিয়াছে! আনাজ-তরকারীর ঝুড়ি মাথায় সাঁওতাল-রমণীরা চলিয়াছে,—আবার···ঐ একটি বাঙালী বাবু স্ত্রী-পুত্র লইয়া মৃদু-মন্দ গতিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নাচিয়া-ছুটিয়া সঙ্গে চলিয়াছে, আর বাবুটি স্ত্রীর হাত ধরিয়া পিছনে চলিয়াছেন। সুষমা একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। বহুদূর হইতে ছেলেমেয়েদের কলরব আর হাসির ঝাপ্‌টা ফুলের গন্ধের মতো ভাসিয়া আসিতেছিল।

সুষমা ভাবিল, ইহাদেরই জীবন সার্থক,—সংসার সত্যই আরামের নীড়! ছোট-বড় কোনো ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কোনো পক্ষ হইতে

কোনো কৈফিয়ৎ-তলব নাই—সঙ্কোচ বা ভয় ঐ শুভ্র জীবন-পথে এতটুকু কালি ছিটাইতে পারে না!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা ভাবনার সাগরে ঝাঁপ দিল। তার এ ভাবনার কি আর শেষ আছে, না, সীমা আছে!

•

নিখিল ওদিকে বাহিরে বল লইয়া খেলা করিতেছে। বাগানের বেড়ার ধারে করবী গাছের শ্রেণী। বড় বড় গাছগুলায় লাল রঙের করবী ফুটিয়া চারিধার আলো করিয়া রাখিয়াছে। মালী ফুল তুলিতেছে, তাহার কাছ হইতে বড় একটা করবীর গুচ্ছ চাহিয়া লইয়া নিখিল মার কাছে ছুটিল। মা ফুল ভালোবাসে, মাকে দিবে। এমন সময় কে ডাকিল—নিখিল…

পরিচিত স্বর। সে-স্বরে চমকিয়া নিখিল চাহিয়া দেখে, সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া অভয়াশঙ্কর।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছো! বেড়াতে যাওনি?

নিখিল মৃদু কণ্ঠে কহিল,—না।

—কেন?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে কহিল—মার অসুখ করেচে। মা আজ বেড়াতে যাবে না।

অভয়াশঙ্কর মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া রহিলেন, বটে! একটা কথার ঘেঁষ সহ্য হইল না! মান করিয়া গট্ হইয়া বসিয়া থাকা! ছেলেটার মুখ চাহিয়াও একবার আসিয়া বলিতে পারিতে, নিখিলকে লইয়া বেড়াইতে যাই। তুচ্ছ একটা মুখের কথা বলিয়াছি, তাহাতে এমন ঝাঁজ? বেশ!

মুখে শুধু ছোট-একটা জবাব দিয়া তিনি বলিলেন—হুঁ।

ইহার পর কোনো পক্ষে আর কোনো কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে

নিখিল পা টিপিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অভয়াশঙ্কর বলিলেন—চলো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

প্রবল রাজার আদেশ প্রজা যেমন বিনা-দ্বিধায় মাথায় তুলিয়া পালন করিতে ছোটে, তেমনি ভাবেই নিখিল বলিল,—যাবো।

নিখিলকে লইয়া অভয়াশঙ্কর বেড়াইতে বাহির হইলেন। খানিকদূর গিয়া নিখিল দেখিল, একটা বাগানের ফটকের সাম্‌নে ছোট হাত-গাড়ীতে ভারে ভারে ফুল বোঝাই হইতেছে। লাল, নীল, হরিদ্রা—নানা বর্ণের ফুল—যেন রাশি-রাশি রামধনু ফুটিয়াছে! তাহার শিশু-চিত্ত তীব্র কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল,—এ ফুল উহারা গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে কেন? কি হইবে? কাহার ফুল?

কিন্তু কাহাকেই বা সে-কথা জিজ্ঞাসা করে? মা সঙ্গে থাকিলে ছোট-বড় নানা প্রশ্নে মাকে অস্থির করিয়া তুলিত, মাও তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিত! সে-মা আজ সঙ্গে নাই! যে-গম্ভীর মুখে পিতা পথ চলিয়াছেন—তাঁহাকে কোনো প্রশ্ন করিতে ভয় করে! এখ্‌নি বকুনি খাইতে হইবে।

সেদিনকার কথা এখনো মনে আছে! সেই যেদিন শিমুলতলায় আসা হয়, তার পরের দিন সকালে বাবা মা দুজনের সঙ্গে সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পথে গাড়ী-ঘোড়া নাই দেখিয়া মাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হ্যাঁ মা, একখানাও গাড়ী দেখতে পাচ্ছি না কেন? কাল ষ্টেশন থেকে হেঁটে এলুম—কেন মা? তারপর পথে নানারকমের গাছপালা দেখিয়া, লোকজনের বিচিত্র বেশ দেখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিল—ওটা কি ফুল, মা? এতে গন্ধ আছে?—দ্যাখো মা, কি রকম ফল ঐ গাছে…কি ফল মা? হঠাৎ পিতা রুদ্র-স্বরে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—বেড়াতে যাচ্ছো, বেড়াতে চলো, তা নয়, সাত-সত্তেরো কথা! ও-সব জ্যাঠামি করলে কোনোদিন বেড়াতে আস্‌তে পাবে না।—

সে-ভৎ'সনা আজো সে ভোলে নাই। কাজেই কোনো প্রশ্ন না তুলিয়া দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো নির্ব্বাক হইয়াই সে পিতার পিছনে-পিছনে পথ মাড়াইয়া বহুদুর অবধি বেড়াইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া মার ঘরে গিয়া দেখে, মা সেখানে নাই।…রান্নাঘরে। রান্নাঘরে গিয়া সুষমাকে সে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—তুমি রান্নাঘরে কেন মা? তোমার অসুখ করেছে বল্‌লে! অসুখ তাহলে সেরে গেছে?

তাহার মুখে চুমু দিয়া সুষমা বলিল,—হ্যাঁ বাবা, সেরে গেছে।

নিখিল আবার ডাকিল,—মা…

—কেন মাণিক?

নিখিল কোনো জবাব দিল না। আজিকার সকালটা যে তাহার নিরানন্দময়তার মধ্যে কাটিয়াছে, সে বেদনায় মন তাহার তখনো টাটাইয়া আছে!

সুষমা বলিল,—এবার ও-পোষাক ছেড়ে ফেলে বসে একটু জিরোও। জিরুনো হলে আমি নাইয়ে দেবো…কেমন? ব্যস্, তারপর ভাত খাবে।

নিখিল কোনো কথা কহিল না; ম্লান চোখে মলিন দৃষ্টি ভরিয়া সুষমার পানে চাহিয়া রহিল! সুষমা তখন রান্নাঘরে দ্বারের কাছে বসিয়া নিখিলকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল—কেমন বেড়ানো হলো নিখিল? কোন্ দিকে গিয়েছিলে আজ?

মার কাপড়ের আঁচলটা লইয়া আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে নিখিল বলিল—বাবার সঙ্গে আমি আর বেড়াতে যাবো না মা। একটা কথা কবার জো নেই! কেবলি ভয় করে।

—ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই। বলিয়া সুষমা তাহার মুখে আবার চুমু দিল।

বাহির হইতে অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—নিখিল, এদিকে এসো… নাইবে।

এ কথার উপর কথা কহিবে, মা বা ছেলে কাহারো সাধ্য ছিল না। নিখিল উঠিয়া স্নান করিতে গেল,—আর সুষমা রান্নাঘরের দ্বারে হতভম্বের মতো বসিয়া রহিল। হায়রে, এই যে ক'দিন আকাশ ফরর্শা দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, বর্ষার মেঘ বুঝি তবে এবারের মতো কাটিয়া গেল! কিন্তু এ কি, আবার সগর্জ্জনে মহা-আড়ম্বরে কালো মেঘ ঐ ঘনাইয়া আসে! গগনে-পবনে আবার তার এ কি ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য দেখা দিয়াছে! এ-মেঘ কি কখনো কাটিবে না? এ-আঁধার ঘুচিয়া শরতের স্নিগ্ধ আলো কি কোনো দিনই ফুটিবে না?

## ২৩

আরো চার-পাঁচদিন মুখ বুজিয়া পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর নিখিলের পানে ভগবান অবশেষে একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সেদিন বেলা দুপুরের প্যাশেঞ্জার-ট্রেনে নায়েব আসিয়া উপস্থিত…সঙ্গে বিস্তর কাগজ-পত্র-ভরা পোর্টম্যাণ্ট। তাহাকে দেখিয়া অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—কি হে শ্রীনাথ, তুমি হঠাৎ কি মনে করে? আগে কোনো খবর পাইনিতো!

প্রভুকে প্রণাম করিয়া শ্রীনাথ বলিল,—আজ্ঞে না; ভারী জরুরি কাজ, তাই খবর দেবার আর ফুরসুৎ হলোনা, একেবারে নিজে এসে হাজির হলুম।

—ব্যাপার কি?

শ্রীনাথ তখন ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সুনন্দার জমিদার দেবদুর্লভ

বাবুর আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ হইয়া পড়ায় তাঁহার যে-জমিদারী অভয়াশঙ্করের কাছে বন্ধক রহিয়াছে, দেবদুর্লভ এখন সে-জমিদারী বিক্রয় করিতে চান্। অভয়াশঙ্কর যদি কিনিতে না চান, তাহা হইলে ওধারকার মহেশ্বর উকিলের ও-জমিদারী কিনিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাকেই অগত্যা বেচিয়া ফেলিতে হয়। এ-সম্বন্ধে চিঠি-লেখালেখিতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইতে পারে বলিয়া দেবদুর্লভ বাবু শ্রীনাথকে একেবারে কাগজ-সমেত শিমুলতলায় আসিয়া বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিতে বলেন,—সেই জন্যই সে আসিয়াছে। খবর দিবার আর অবসর ছিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমাদের পাওনা হয়েছে কত টাকা?··· দেবদুর্লভ কি দর চায়?

পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া শ্রীনাথ একখানা মোটা খাতা বাহির করিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া সেটা দেখিয়া-শুনিয়া হিসাব পাড়িয়া বলিল, দর-কষাকষি করিয়া ঘর হইতে আর দশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিলেই জমিদারীটা হস্তগত হয়। এবং···

অভয়াশঙ্কর একটু উৎফুল্লভাবেই বলিলেন—আচ্ছা, এখন ও-সব রাখো, তুমি নেয়ে-খেয়ে নাও, তার পর দুপুরবেলা বসে হিসাব-পত্তর দেখা যাবে। ওর দলিল-দস্তাবেজ দেখাই আছে, তবে ইতিমধ্যে আর কোনো নতুন দায় জড়িয়েছে কি না, রেজিষ্ট্রী-অফিসে একবার সার্চ্চ করে' দেখা যাবে।

শ্রীনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিখিল বাহিরে আসিতেই শ্রীনাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। নিখিল খুশী হইয়া বলিল,—কি করে আপনি এখানে এলেন? এ্যাঁ! এখানেই থাকবেন?···বেশ হবে। কেমন পাহাড় আছে এখানে, দেখবেন।

শ্রীনাথ বলিল,—কিন্তু কৈ খোকাবাবু, তুমি মোটা হওনি তো! যেমন রোগা ছিলে, তেমনি আছো!

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—তুমি যাও শ্রীনাথ, নেয়ে-খেয়ে নাও। এখন আর আলাপ-আপ্যায়িতের সময় নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে—যাও, যাও।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যাচ্ছি। বলিয়া নিখিলকে কোল হইতে সে নামাইয়া দিল।

অভয়াশঙ্কর তখন নিখিলকে বলিলেন,—তুমি যাও নিখিল···কোনো চাকরকে ডেকে দাও,—সে এসে বাক্সটা তুলে রাখুক্, আর শ্রীনাথকে নাইবার জায়গা দেখিয়ে দেবে। যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। গায়ের মোটা কাপড়টা কাছেই দেওয়ালের একটা হুকে টাঙাইয়া রাখিয়া শ্রীনাথ জামা খুলিতে লাগিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—সুনন্দা গ্রামখানা নদীর ঠিক উপরেই, না?

—আজ্ঞে হাঁ, বাঘমতী নদীর উপর।

—গ্রামটা ভালো? ম্যালেরিয়া নেই?

—না। ঐখানেই দেবদুর্লভ বাবু বাস করেন। নানা শোকে তিনি জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছেন, তায় বিস্তর দেনা—সব বিক্রী-সিক্রী করে কাশী গিয়ে বাস করবেন, বলছেন। আপনি যদি জমিদারীটা নেন্, তাহলে তাঁর মনে তেমন দুঃখ থাকে না।

—বটে! বলিয়া অভয়াশঙ্কর কি-চিন্তা করিতে বসিলেন।

শ্রীনাথের আহারাদি শেষ হইলে অভয়াশঙ্কর কাগজ-পত্র পাড়িয়া তাহার সঙ্গে বসিলেন; প্রত্যেকখানি দলিল, প্রত্যেকটি কাগজ তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বেলা পড়িয়া আসিল। নিয়ম-মতো নিখিল ওদিকে সাজিয়া-গুজিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া পিতার ঘরের সম্মুখ দিয়া

কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল, অভয়াশঙ্করের সেদিকে লক্ষ্য নাই। অথচ পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এমন সাহস নিখিলের ছিল না। নিখিল দেখিল, কখনো শ্রীনাথ কাগজ পাতিয়া হিসাব লিখিতেছে, অভয়াশঙ্কর তাহা টানিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া কাটকুট করিয়া নানা আলোচনা পাড়িয়া কতকগুলা অঙ্ক পাড়েন, এমনিভাবে তুই জনে সেই বাক্স-ভরা কাগজ-পত্রের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া আছেন—বাহিরের জগতের দিকে কাহারো এতটুকু হুঁশ নাই!

ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিখিল শেষে মার কাছে গেল। সুষমা বলিল,—বেড়াতে যাওনি নিখিল?

—না।

—কেন? উনি কোথায়?

—বাবা কি-সব কাগজ দেখচে।

—তুমি ওঁর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলেই দেখতে পেয়ে যাবেন'খন।

—না মা, বাবা যদি বকে?

সুষমা এ কথার জবাব দিল না।

নিখিল বলিল,—আজ তুমি চলো মা,—তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।

—আমি আজো বেড়াতে যাবো না নিখিল।

—কেন? নিখিলের স্বরে অনেকখানি কাতরতা।

একটা ঢোক গিলিয়া সুষমা বলিল,—আমার শরীরটা আজো তেমন ভালো নেই। তাছাড়া···

—কি অসুখ করেছে মা তোমার? রোজ-রোজ বেড়াতে যেতে চাওনা?

—তেমন কোনো অসুখ নয়। শরীরটা এমনি ভালো বোধ হচ্ছে না।

—তবে তুমি গরম জামা গায়ে দাওনি কেন?

সস্নেহে নিখিলের গাল টিপিয়া দিয়া সুষমা কহিল,—বেড়াতে যাবোনা বলেই গায়ে দিই নি বাবা।

—বা রে, বেড়াতে গেলেই বুঝি গরম-জামা গায়ে দিতে হয়! আমি তবে দুপুর-বেলায় গরম জামা গায়ে দিয়ে থাকি কেন? এই তো এখন আমিও বেড়াতে যাচ্ছি না, তবে আমি কেন গরম জামা গায়ে দিয়ে থাকবো? দেবো না তো! কক্‌খনো না!

এই নিতান্ত সহজ আব্দারের সুরে সুষমার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে ভাবিল, হায়রে, তোর আর আমার মধ্যে বড়-বড় ব্যবধান তুলিয়া দুজনকে যত পৃথক করিতে চায়, ততই তুই কী এ স্নেহের পাকে-পাকে নিবিড় করিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিস্, নিখিল! এই যে বাঁধন আর মুক্তি—ইহারই মধ্য দিয়া ফাঁকে-ফাঁকে জীবনটা এ কোন্ পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার শেষ কি দাঁড়াইবে—তাহা ভাবিয়া সুষমার চোখের কোলে ফোঁটা-দুই জল গড়াইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া নিখিলকে কোলে টানিয়া সুষমা তাহার মুখচুম্বন করিল।

নিখিল বলিল,—তুমি বেড়াতে যাবে না তো মা? তোমার অসুখ করেছে বল্‌চো, বেশ, তাহলে চলো, তুমি ঘরে শোবে, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো।

—নারে পাগলা, আমার এমন অসুখ করেনি যে মাথায় হাত বুলোতে হবে! তুমি ঐ বাড়ীর বাইরে বাগানে বরং খেলা করে বেড়াও গে নিখিল।

—না মা, তার চেয়ে তুমি ঐ বাইরের চাতালে চলো, সেখানে বসে গল্প বলবে, আমি শুনবো। অনেকদিন তোমার গল্প শুনিনি।

—চলো! বলিয়া নিখিলকে লইয়া সুষমা চাতালে আসিয়া বসিল।

ওধারে অস্তগামী লোহিত সূর্য্য তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিকে দিকে রাঙা ঢেউ তুলিয়া বড় পাহাড়টার আড়ালে গড়াইয়া পড়িল। আকাশে কুয়াশার স্বচ্ছ স্তর ভেদ করিয়া চাঁদের আলো ফুটিল—জ্যোৎস্নায় চারিধার ঝলমল করিয়া উঠিল। সুষমা এক-মনে গল্প বলিতেছে.আর সুষমার কোলে মাথা রাখিয়া তাহারই মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া-চাহিয়া নিখিল সেই গল্প শুনিতেছে। গল্পের পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে-চড়া রাজপুত্রের মতোই সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তাহার শিশু-চিত্ত সেই কোন্ তেপান্তর মাঠের পারে গহন বনে অত্যন্ত শঙ্কিত ত্রস্ত পায়ে এমন উধাও হইয়া চলিয়াছে যে রাত্রি ওদিকে বাড়িয়া উঠিতেছে, সেদিকে দুই জনের কাহারো খেয়াল নাই। গল্পের রাজপুত্র আসিয়া শেষে ঠিক বনের সীমান্তে রাক্ষস-প্রহরী-রক্ষিত কঠিন পাষাণ-দুর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়াছে—এইখানটা শুনিতে নিখিলের গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল! উঠিয়া সে সুষমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া সুষমার মুখের পানে ভীত অধীর আগ্রহে চাহিল, এবারে কি হয়—হঠাৎ এমন সময় অভয়াশঙ্করের স্বর যেন সেই রাক্ষস-প্রহরীর বজ্র-বাণীর মতো গর্জিয়া উঠিল,—এই ঠাণ্ডায় বসে ওখানে তোমাদের কি হচ্ছে?

সুষমা ও নিখিল দুজনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল। সুষমা থমকিয়া গল্প থামাইয়া চারিধারে চাহিয়া দেখিল,—এতক্ষণ তাহার চৈতন্য ছিল না—তন্ময় হইয়া গল্প বলিতেছিল—খেয়াল হইতে সে দেখে, তাইতো, রাত্রি অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে! এই হিমে—ছি, ছি, এ সে কি করিয়াছে? সে কি পাগল হইয়াছিল?...

ধড়মড়িয়া উঠিয়া নিখিলের হাত ধরিয়া তুলিয়া সুষমা বলিল,—ওঠো নিখিল...সত্যি, রাত হয়ে গেছে। হিম লাগছে।

নিখিল উঠিয়া ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখে, অদূরে দাঁড়াইয়া পিতা

অভয়াশঙ্কর। তাহার পায়ে কে যেন ব্রেক্ আঁটিয়া দিল—নিখিল চলিতে পারে না!

সুষমা বলিল,—এসো…

দুজনে উপরের দালানে আসিলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হিমে এতক্ষণ বসেছিলে দু'জনে?

সুষমা কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—নিখিল বেড়াতে যেতে পেলে না, গল্প শুনতে চাইলো, তাই আমি গল্প বলছিলুম। এত রাত হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এমন বেহুঁশ! হিম লাগ্‌ছে তা খেয়ালই নেই!

ঘরের মধ্যে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া একটু হাসি ফুটাইয়া সুষমা বলিল,—বেশী নয়, এই আটটা! তা ওর গায়ে গরম জামা আছে…

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—দোষ হয়েছে, তবু স্বীকার করবে না!

তাঁহার স্বরে আবার তেমনি আগুনের ঝাঁজ!

সুষমা ভাবিল, যতই সহজভাবে সে এই সব বিশ্রী ব্যাপারগুলাকে উড়াইয়া দিতে চায়, ততই কি সেগুলা এমনি করিয়া চাপিয়া ধরিবে! সুষমা ঘরের দিকে যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—নিখিলের বেড়াতে যাওয়া হলো না কেন, শুনি?

ভয়ে চোরের মতো নিখিল একধারে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুষমা তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—ও ঠিক সময়েই সেজে-গুজে তৈরী হয়ে তোমার কাছে গিয়েছিল, তুমি ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমায় ডাকতে সাহস পায় নি।

—বেশ, আমি যেন ব্যস্ত ছিলুম, তুমি তো ঘরে ছিলে, তোমার সঙ্গে যেতে পারতো না?

সুষমার বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ বেদনা গুমরাইয়া উঠিল,—বটে, দোষ তাহারই বটে! হুকুম দিবার সময় তো হুকুম বেশ দিয়াছিলে! মাথায় কখন্ কোন্ খেয়াল চাপিয়া বসিবে, সুষমা জ্যোতিষ পাড়িয়া তাহা জানিয়া রাখে নাই! তুমিই হুকুম দিবে, আবার সে-হুকুম অমান্য করিবার স্পর্দ্ধা সুষমা দেখায় নাই বলিয়া কৈফিয়ৎও এই সুষমাকেই দিতে হইবে! চমৎকার বিধান! আজ এখন তাই সে ভাবিল, চুপ করিয়া এ সব আঘাতই বা বিনা-দোষে সে কেন সহিয়া মরিবে! এত বড় আঘাত! নিঃশব্দে যতই সে এ-আঘাত গ্রহণ করে, আঘাতেরও তত আর অন্ত থাকে না! আজ সে জোর করিয়া মুখ ফুটাইল। সুষমা বলিল,—তুমি ওকে বারণ করে দেছ আমার সঙ্গে যেতে। নিজে নিয়ে বেড়াতে যাবে, বলেছো···

বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ও, তাই? একটা কথা রাগের মাথায় না হয় বলেই ছিলুম, সেটাকে এমন রাজার অটল আদেশের মতো শিরোধার্য্য করে রাখতে হবে! কেন, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করে জোর করে ওকে নিয়ে যেতে পারতে না? আমি তাতে 'না' বল্‌তুম? তুমি যদি আজ ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতে, আর ফিরে এলে আমি যদি সেজন্য কৈফিয়ৎ তলব করতুম, তাহলে তুমি তার জবাবে এ কথা অনায়াসে বল্‌তে পারতে,—তুমি কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকো, নিখিলকে নিয়ে কখন বেড়াতে যাবে? আমি মা, আমার ছেলে···মার সঙ্গেই সে বেড়াতে গিয়েছিল—তাহলে আমি যে কোনো জবাব খুঁজে পেতুম না!...আর তোমাকে এমন দেখলে আমারো কতখানি আনন্দ হতো! বুঝতুম, যে-আসনে তোমায় এনে বসিয়েছি, সে-আসনের মর্য্যাদা তুমি ঠিক বজায় রাখছো।

তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অভয়াশঙ্কর আবার বলিলেন,—আমারি অন্যায় এটুকু প্রত্যাশা করা! পর কখনো আপন হয় না,

সুষমা! ও যদি তোমার পেটের ছেলে হতো, তাহলে কি আর আমার সে-হুকুম শুনে তুমি এমন উদাসী থাকতে পারতে? কখনো না। আমার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে তুমি ওকে নিয়ে যেতে!

কথাটা বলিয়া অভয়াশঙ্কর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সুষমা মাটীর মূর্ত্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি, এ! এই যে অনর্থক কথা-কাটাকাটি, বিনাদোষে এই অজস্র তিরস্কার, এই যে মনকে খুলিয়া কেহ কাহারো হাতে দিতে পারে না—এ-সবের পরিণাম কি? দু' জনে দু' জনকে এমনি ভুল বুঝিয়া ঠোক্কর খাইতে খাইতেই জীবনের সারা পথ চলিবে?

জোর করিয়া নিখিলকে সুষমা ছিনাইয়া লইবে? হায়রে, এতখানি স্পর্দ্ধা সে আজ দেখাইতে যাইবে কোন্ ভরসায়! একদিন তবু এ-ভরসা, এতখানি জোর ফলাইবার এক্তিয়ার আছে বলিয়া একটা বিশ্বাস সুষমার মনে ছিল! সে কী বিশ্বাস! তুমিই নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়াছ! স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছ, নিখিলের উপর সুষমার এতটুকু জোর খাটিবে না। সে শুধু ছবির মতো, মাটীতে-গড়া মূর্ত্তির মতো, শুধু খেলা-ঘরের মা সাজিয়া নিখিলকে ভুলাইয়া রাখিবে মাত্র! এ-ছাড়া সুষমার কোনো অধিকার নাই! এ-কথা বার-বার কাঁটার চাবুক মারিয়া বুকে বিঁধিয়া দিয়া আজ তুমিই কিনা আবার এমন অনুযোগ করো! হায়রে, এমন বেড়া আগুনে নিরুপায়ভাবে জ্বলিবার পুড়িবার জন্যই কি বিধাতা সুষমার এ-জন্মটার সৃষ্টি করিয়াছিলেন!

নিখিল আসিয়া ডাকিল—মা...

সুষমা কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল।

নিখিল বলিল—ঘরে চলো না, মা। তোমার শীত লাগচে, তুমি কাঁপচো।

সুষমা সত্যই কাঁপিতেছিল,—শীতে নয়! কি এক অদ্ভুতভাব তাহাকে যেন ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছিল।

সুষমা বলিল—চলো নিখিল।

ঘরে গিয়া সুষমা নিখিলকে বলিল,—তুমি যাও তো বাবা, ঠাকুরকে বলো, এই ঘরে তোমার খাবার দিয়ে যাবে—তুমি বসে বসে খাবে। আমার শীত করচে, আমি আর ওদিকে যেতে পারচি না!

—না মা, তোমায় যেতে হবে না, আমি ঠাকুরকে বলচি। বলিয়া নিখিল ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

## ২৪

পাঁচ-সাত দিন পরে শ্রীনাথকে লইয়া অভয়াশঙ্কর কলিকাতায় গেলেন। যাইবার সময় সুষমাকে বলিয়া গেলেন, সুনন্দার জমিদারীটা দেখিয়া কিনিয়া ফিরিতে প্রায় দশ-বারো দিন সময় লাগিতে পারে। নিখিলের সমস্ত ভার সুষমার উপরেই তিনি দিয়া গেলেন; বলিলেন, নূতন যে মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেও নিখিল বেড়াইতে যাইতে পারে, তবে সুষমাও যেন ঘরের কোণে বসিয়া না থাকে, তাহারো বেড়ানো চাই। নহিলে শরীর সারিবে না।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলে নিখিলের মনে হইল, তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীর উপর হইতে কে যেন একটা মস্ত ভারী আবরণ টানিয়া লইয়াছে! চারিধারে এত আলো ফুটিয়া উঠিল যে নিখিলের মনে হইল, এ যেন আর এক নূতন রাজ্যে সে হঠাৎ আজ পদার্পণ করিয়াছে! জীবনের ধারাই যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে! মুক্ত চঞ্চল মৃগ-

শিশুর মতোই নাচিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া তাহার আশা আর মিটিতে চায় না!

এমনি চঞ্চল আনন্দে মাতিয়া সে যখন বাহিরে একটা ফুল গাছের নীচে কতকগুলি কাঠি-কুটা কুড়াইয়া ছোট ছোট কুটীর বাঁধিয়া তাহার নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে জল ভরিয়া পুষ্করিণী তৈয়ার করিয়া নৃত্য সুরু করিয়াছে, তখন সুষমা ডাকিল,—নিখিল…

নিখিল ছুটিয়া আসিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—কি মা? কেন মা? ডাক্‌লে কেন মা?

—কি করছিলে নিখিল, বাইরে? ধূলো ঘাঁটছিলে? হ্যাঁ, এই যে গা-ময় ধূলো।

—না মা, বকোনা মা। আমার এত ভালো লাগ্‌চে মা যে কি আর বলবো! তুমি দেখবে এসো কেমন পুকুর করেচি, পাহাড় করেচি—দেখবে এসো।

কথাটা বলিয়া সুষমাকে এক-রকম টানিয়াই সে হাতে-গড়া পুকুর পাহাড় দেখাইতে চলিল।

নিখিলের এ আনন্দ দেখিয়া পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের কথা সুষমার মনে পড়িল। এই বিকচোন্মুখ শিশু-চিত্তটিকে কঠিন শাসনের পাষাণ-তলে ফেলিয়া কি-ভাবেই না চূর্ণ করা হইতেছে! বেচারা শিশু! আজ যদি নিখিলের নিজের মা বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এই কঠিন শাসন সে কি কখনও সহ্য করিত? পৃথিবীর এই অবাধ মুক্ত আলো-হাসি ও আনন্দ-গানের অজস্রতার মধ্যে সম্পূর্ণ বাঁধন কাটিয়াই সে-মা নিখিলকে ছাড়িয়া দিত! স্বামীর এই কঠিন তর্জ্জনী-আস্ফালন একটি ভ্রূ-ভঙ্গীতে কোথায় সে ছাঁটিয়া ফেলিত! সুষমা নিখিলের নিজের মা নয়, ভাড়া-করা মা—এই সহজ সত্য কথাটা সুষমা আজ স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে গেলে চারিধারে হুঙ্কার উঠিবে,—খবর্দ্দার!

কিন্তু না,—সুষমা ভাবিল, সেদিন রাত্রিকার সেই কথাটাকেই এবার হইতে সে শিরোধার্য্য করিয়া চলিবে। ছেলের উপর জোর না থাকুক, তবু সে জোর করিবে! সুষমা দেখিয়াছে, রাজা না হইয়াও অভিনয়ের সাজা রাজা বেশ কঠিন স্বরেই আদেশ দিয়া যায়—এবং সে আদেশ রক্ষাও হয়! তবে? সেও এবার হইতে জোর করিয়া নিখিলের ঐ কঠিন বাঁধনগুলাকে দু-হাতে কাটিয়া দিবে। চুপ করিয়া থাকিলেও যখন কু-কথা সহিতে হয়, অথচ তাহাতে ছেলের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হয় না, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না। কথা যদি সহিতে হয়, হোক, তবু ছেলেটাকে এই নির্য্যাতন হইতে কতক বাঁচাইতে পারিবে! ছেলের মনে আলো-বাতাসের ঝলক্ লাগিবে তবু!

নিখিলের বাঁধনের দড়িগুলা সুষমা কাটিতে সুরু করিল। সেদিন বেড়াইতে গিয়া নিখিল পথে দেখিল, কতকগুলা সাঁওতালী ছেলে একটা গাছের ডালে দড়ির দোলনা খাটাইয়া মহা আনন্দে দোল খাইতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সুষমা বলিল,—দাঁড়ালে যে?

—গ্যাখো মা, কেমন দোল খাচ্ছে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া নিখিলকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিয়া সাঁওতালী ছেলের দল আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, বলিল,—এসো রাজা-বাবু, দোল খাবে।

নিখিলের মন তাহাদের সঙ্গে অমনি দোলায় দোল খাইবার জন্য লাফাইতে ছিল। কিন্তু বাপের যে-শাসনে সে এত বড় হইয়াছে, তাহাতে মন ছুটিলেও উপায় ছিল না! তবু আজ সে-বাপ কাছে নাই বলিয়াই নিখিল দু’ চোখে কাতর মিনতি ভরিয়া মার পানে চাহিল; মুখে কোনো কথা বলিল না।

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া সুষমা হাসিয়া বলিল,—দোল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, না নিখিল?

—একটু দোল খাবো মা? ওরা বলচে···একটুখানি?

সুষমা 'না' বলিতে পারিল না। বেচারী! আহা!

সুষমা বলিল,—যাও···

নিখিল সানন্দে গিয়া দোলায় বসিল। দুটা সাঁওতালী ছেলে তাহার দু পাশে বসিয়া সতর্ক রহিল,—রাজাবাবু না পড়িয়া যায়,—আর দু-জনে দু দিক হইতে দোলায় দোল দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ দোলায় দুলিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় নিখিল মাকে বলিল,—মা, আমাদের বাড়ীতে একটা দোলনা করে দিয়ো না—তুমি দোল দেবে, আর আমি দুল্‌বো।

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, উনি ফিরে আসুন, ওঁকে বলে দোলনা খাটিয়ে দেওয়াবো।

ইহার পর ঐখানেই দু বেলা বেড়াইতে যাইবার জন্য নিখিলের মন এমন ঝুঁকিয়া ওঠে যে সুষমা কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। দুবেলা সাঁওতালীদের সঙ্গে দোলনায় দুলিয়া তাহাদের সহিত নিখিলের এমন অন্তরঙ্গতা জন্মিল যে একদিন দুপুরবেলা দু-তিনটা সাঁওতালী ছেলে অসঙ্কোচে তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিখিল অত্যন্ত সঙ্কোচে ভয়ে-ভয়ে তাহাদের লইয়া ফটকের ধারে কাঠি-কুটা দিয়া যে পাহাড় গড়িয়া ছিল, দেখাইল। পরে সকলে মিলিয়া সেই পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের ডাল পুঁতিয়া মাথার উপর নুড়ি-পাথর চাপাইয়া এক কেল্লা তৈয়ার করিল।

তারপর হইতে সাঁওতালী ছেলেরা প্রত্যহ দুপুরবেলা এমন ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল যে সুষমা প্রমাদ গণিল! স্বামীর ফিরিবার সময় আসন্ন—তিনি আসিয়া যদি ইহাদের দেখেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিবেন! তাঁহার ছেলে এই-সব বর্ব্বর ছোট-লোক ছেলেগুলার খেলার সাথী! অথচ কি বলিয়াই বা ইহাদের এ-আনন্দে সুষমা বাধা দেয়! গরিবের ঘরে নাহয় জন্মিয়াছে, তাই বলিয়া ইহারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, নীচ হিংস্র পশুর মতোই ইহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে! সেই যেদিন ইহারা অমন আগ্রহে অতখানি স্নেহে-সম্ভ্রমে নিখিলকে দোলায় তুলিতে ডাকিয়াছিল, সেদিন তাহারা কতখানি সরল উদার মনের পরিচয় দিয়াছিল, সুষমা তাহা জানে!

সেদিন খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছে···ক'দিনের চেষ্টায় পাহাড় প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে, পাহাড়ের তলা দিয়া সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের মাথার উপর বিচিত্র বর্ণের তকৃতকে নুড়ি-ও-পাথর-কুচিতে গড়া কেল্লাও দেখিতে জম্‌কালো···পাহাড়ের নীচে দিয়া তারের রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে। সাঁওতালীদের লম্বু কাঠ কাটিয়া গাড়ী তৈয়ার করিবার ভার লইয়াছে। আজ সে-গাড়ী চলিবে। এজন্য আজ একটু ধুমধামের ব্যবস্থা হইয়াছে। ছেলেরা রাজাবাবুর কাছে পুরী খাইতে চাহিয়াছে—পুরী খাইয়া গাড়ী চালাইবে। সুষমা বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘরে বসিয়া নিজে লুচি ভাজিতেছে, ছেলের দল বাহিরে কাঠের গাড়ীতে চাকা পরানো দেখিতেছে, এমন সময় নির্ম্মল মুক্ত আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিল! সভয়ে নিখিল হঠাৎ চাহিয়া দেখে, ফটকের অদূরে অভয়াশঙ্কর···কুলি-সঙ্গে বাড়ী আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে এমন ভয় পাইল যে সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে

না পারিয়া হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলের দল ওদিকে গাড়ীতে চাকা পরাইয়া মহা-কলরব জুড়িয়া দিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় অভয়াশঙ্করও বাড়ীর ফটকের মধ্যে পা দিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত···পরে রাগে জ্বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এ কি এ! উঁ! কারা এরা? কি হচ্ছে সব? তারপর নিখিলকে এ-সংসর্গে দেখিয়া তাহার কাণ ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন, কহিলেন,—বাঃ, ক'দিনে চমৎকার উন্নতি হয়েছে, দেখচি! শূয়ার, বাড়ী চলো! তারপর সাঁওতালী ছেলেরা ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই অভয়াশঙ্কর তাহাদের পানে চাহিয়া গর্জ্জন করিলেন—ভাগ্···

এই অতর্কিত-আঘাতে ছেলের দল ভীত হইয়া বাড়ীর বাহিরে পলাইয়া গেল—পলাইয়া দূরে গেল না, বাহির হইতে তাহাদের রাজাবাবুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া বজ্র-হুঙ্কারে ডাকিলেন.—নিখিল···

কাঁপিতে কাঁপিতে নিখিল কাছে আসিল, অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ওরা তোমার বন্ধু, বুঝি? যাও, ওধারে গিয়ে ওদের বলে এসো, এ-বাড়ীতে আর কখনো যেন ওরা না ঢোকে!

আহা, বেচারা সব! উহাদের কি অপরাধ যে এমন লাঞ্ছিত করিয়া গৃহ হইতে উহাদের তাড়াইয়া দিবে! নিখিল ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অভয়াশঙ্করের কথা শুনিয়া সুষমা ছুটিয়া আসিল, আসিয়া ব্যাপার বুঝিল। কাতর কণ্ঠে সুষমা বলিল—ওগো, থাক্। আহা, ওঁরা লুচি খেতে চেয়েছে, কখনো খেতে পায়না...আশা করে এসেছে, গরিব-দুঃখী, তায় ছেলেমানুষ—ওরা খেয়ে নিক্! তার্ পর আমিই ওদের বলে দেবো, এখানে আর কখনো ওরা আসবে না।

সুষমার কথায় কোনো জবাব না দিয়া তাহার প্রতি তিলমাত্র লক্ষ্য না করিয়াই অভয়াশঙ্কর মুখ-হাত ধুইবার জন্য বাথরুমে চলিয়া গেলেন।

ছেলেদের ডাকিয়া লুচি-তরকারী দিয়া ও মিষ্ট কথায় তাহাদের ভুলাইয়া সুষমা বিদায় করিল, পরে অভয়াশঙ্করের আহার শেষ হইলে নিখিলকে রান্নাঘরে ডাকিয়া আনিয়া সে যখন বলিল—তোমাদের বন-ভোজনের লুচি ওরা খেয়েছে, তুমি এবার খাও বাবা,—তখন নিখিলের রুদ্ধ অভিমান সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিপুল ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল,—না, না, ও লুচি আমি খাবো না, কক্‌খনো খাবো না।

সুষমা বলিল,—ছি বাবা, উনি শুনলে আবার বক্‌বেন। খাও···

—বকুক্‌, বাবা বকুক্‌, বাড়ী থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিক্‌—আমি চলে যাবো। আমি ঐ ওদের বাড়ী গিয়ে ওদের সঙ্গে থাক্‌বো। চাই না আমি এখানে থাকতে—এখানে থাকবো না আমি।

—আচ্ছা পাগল ছেলে তো! বলিয়া সুষমা নিখিলকে বুকে টানিয়া স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিল!

সন্ধ্যার দিকে নিখিল একটু ঠাণ্ডা হইয়া সুষমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেছিল; অভয়াশঙ্কর আসিয়া কহিলেন,—দোহাই তোমাদের, আমার যেগুলো ভালো লাগে না, সেগুলো আর করো না। ছোট লোকদের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি মোটে পছন্দ করি না। স্বামী বলে আমায় যদি একটুও মানো সুষমা, তাহলে দোহাই তোমার, ছেলেটাকে ওদিকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না।·· আর ক'টা দিন মাত্র···তারপর শীঘ্রই বাড়ী ফিরচি। তখন···ঠিক করেচি, সুনন্দায় গিয়েই থাক্‌বো। বাড়ী-ঘর মেরামত করবার বন্দোবস্ত করে এসেচি। ছেলে থাকবে মাষ্টারের জিম্মায়। এ-রকম

নাকি-কান্না আর মায়া-মমতার মধ্যে মানুষ করলে ছেলের চোখের পাতা চিরকাল ভিজে থাকবে, চোখের জল তার কোনোকালে শুকোবে না! যতদিন সুনন্দায় না যাই, ততদিন শুধু দয়া করে আমার এই ইচ্ছাটা একটু মেনে ছেলের হেফাযতী করো,—তাহলেই আমি কৃত-কৃতার্থ হবো। বুঝলে?

বিদ্যুতের মতো কথাটা এক-নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া বিদ্যুতের মতোই অভয়াশঙ্কর বাহির হইয়া গেলেন।

সুষমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে সে বলিল, এক তো এই গোয়েন্দার মতো খবর না দিয়া আসা—তারপর এই সব কথা! জবাব লইবারও অবসর হইল না—চলিয়া গেলে! সত্য কথা শুনিবার বা সহিবার সাহসটুকুও নাই! হায়রে!

নিখিল বলিল—বেড়াতে চলো না, মা…

—না বাবা, তুমি আজ মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে যাও।

—এই তো তুমি যাচ্ছিলে…বা রে!

—না বাবা, কথা শোনো…লক্ষ্মী ছেলে। যাও, আজ মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে যাও, কাল থেকে আমার সঙ্গে যেয়ো।

নিখিল বলিল,—তাহলে আমিও আজ যাবো না মা।

—না, যাও নিখিল…নাহলে উনি বকবেন।

—বকুন্ গে। ওঃ…সব-তাতে বকুনি! আমি বুঝেচি মা,—বাবা বকলো বলে তুমি যাবে না বল্‌চো!

—না রে, না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি সব জানি। বাবা যা বলে, আমি বুঝতে পারি। আমি তো—এই অবধি বলিয়া কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া নিখিল আবার বলিল,—হ্যাঁ মা, সত্যই তুমি আমার মা নও?

সুষমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ এ আবার কি কথা! সে

পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি একটা আশ্রয় পাইবার জন্য নিখিলকেই প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—ও কথা বলিস্ নে, বলিস্ নে তুই নিখিল, তাহলে আমি…আমি পাগল হয়ে যাবো, মরে যাবো…বুঝলি!

সুষমার মুখে কাতর কম্পিত স্বর শুনিয়া নিখিল ভয় পাইল, সেও সুষমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—না মা, তুমি মরে যেয়োনা মা, আমি ও-কথা আর বলবো না…কখনো বলবো না!

নিখিলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

—না, আর কখনো বলিস্ নে! মনেও ও-কথা আনিস্ নে, নিখিল। লোকে যদি কখনো অমন বিশ্রী কথা বলে, তুই তা কাণে তুলিস্ নে।… তুই ও-কথা মনে আন্‌লে কি হবে, জানিস্?

অত্যন্ত সশঙ্ক দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া নিখিল বলিল,—কি হবে মা?

নিখিলকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে সুষমা বলিল,—তোর মা তাহলে মরে যাবে, নিখিল!

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ১

সেই ঝড়ের রাত্রির পরের দিনকার কথা বলিতেছি···

মার আদরে মনের সমস্ত যাতনা ভুলিয়া নিখিল বলিল,—আজ মা, তুমি মাষ্টার-মশায়কে বলে পাঠিয়ো আমায় যেন শীগ্‌গির-শীগ্‌গির ছুটি দেন! তোমার কাছে সেই আগেকার মতো বসে গল্প শুনবো।

সুষমা বলিল,—তাই হবে। এখন তুমি পড়তে যাও। আমি এখনি গিয়ে নিজের হাতে তোমার জন্য মোহনভোগ তৈরী করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিস্‌মিস্ দেবো মোহনভোগে—কেমন?

—হ্যাঁ মা, অনেক···অনেক কিস্‌মিস্ দিয়ো। কিস্‌মিস্ আমার এত ভালো লাগে। আর মা, একদিন সেই—সেই—সেই জিনিষটা তৈরী করো···লক্ষ্মীটি—বড্ড খেতে ইচ্ছা করে।

—কি জিনিষ রে পাগলা?

নিখিল বলিল,—সেই যে···সেই শিমুলতলায় তৈরী করেছিলে, ডিম দিয়ে সেই পুডিং।

সুষমা হাসিয়া বলিল,—ও! আচ্ছা, ওবেলা বেড়াতে যাবার সময় পুডিং খেয়ে যেয়ো। দুপুরবেলা আমি তৈরী করবো।

মাকে চুমু দিয়া নিখিল পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল। সুষমাও তাড়াতাড়ি গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ছোট কড়া চাপাইয়া মোহনভোগ করিতে বসিল।

খুন্তি দিয়া সুজি নাড়িতে নাড়িতে অতীতের কথা ভাবিতেছিল।

শিমুলতলায় থাকিতে যে-কটা দিন সেই নিখিলকে কাছে পাইয়াছিল! এখানে আসিয়া অবধি স্বামী নিয়ম-কানুনগুলাকে এমন দুরন্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন যে দুজনে একত্র বসিয়া পরস্পরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিবে, এমন একটু ফাঁক রাখেন নাই! প্রথম-প্রথম এই ধরা-বাঁধা নিয়মগুলার বিরুদ্ধে সে একটু অনুযোগ তুলিয়াছিল, অভয়াশঙ্কর সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে গম্ভীর কণ্ঠে কি রূঢ়-ভাষাতেই না তার জবাব দিয়াছিলেন! অভয়াশঙ্কর আরো বলিয়া ছিলেন, অন্দরে সুষমার বাঁচিয়া থাকাটা প্রয়োজন, শুধু এই জন্যই যে মা-নাই বলিয়া নিখিল বুকের মধ্যে ফাঁকটা না বুঝিতে পারে! নহিলে তিনি যেমন জানেন, সুষমাও তেমনি ভালো করিয়া জানে,—নিখিল মাতৃহীন···সুষমা সত্য-সত্যই কিছু নিখিলের মা নয় যে নিখিলকে না দেখিলে দু-চোখে অন্ধকার দেখিবে!

এত বড় রূঢ় কথার ঘা খাইয়া সুষমার ছোট্ট-অভিমান-ভরা অভিযোগ-উদ্যত মনটা ভাঙ্গিয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল। তাহার এত স্নেহ, এই মমতা···অভয়াশঙ্করের চোখে ভাণ মাত্র,—অভিনয়-মঞ্চের একটি রাত্রির অভিনয়ের মতোই তাহা মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী! সত্য-স্নেহের অধিকার যেখানে কেহ দিতে চায় না, সেখানে স্নেহের দাবী করিতে যাওয়ার মতো অপমানের ব্যাপার আর নাই! বার-বার ঘা খাইয়া সুষমা এ কথাটা বেশ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে,—তবুও নিঃসম্বলের একটিমাত্র সম্বল বলিয়াই নিখিলকে স্নেহার্ত্ত দুই উদ্যত বাহুর বন্ধনে বাঁধিবার জন্য মন পাগলের মতো ছুটিয়া যায়!···তাছাড়া শুধু নিজের মনকে বুঝানোর ব্যাপার হইলেও বুঝাইয়া কোনোমতে না হয় সে নিরস্ত করিতে পারিত, কিন্তু নিখিল···বেচারা নিখিল! মাতৃহারা অভাগা ছেলেটা তাহাকেই মা বলিয়া জানে! এবং মা বলিয়া জানে বলিয়াই তো বাহিরের ঐ কঠিন বাঁধনের চাপে ব্যথিত জর্জ্জরিত হইয়া নিজের মনের পিপাসা মিটাইবার জন্য ছুটিয়া সে সুষমার কাছেই আসিতে চায়! অভয়াশঙ্করের কথায় প্রাণে পাথর

বাঁধিয়া সুষমাও তাহাকে রূঢ় নির্দ্দয় হুঙ্কারে তাড়াইয়া দিবে? বলিবে, না, ওরে না, পলাইয়া যা রে, পলাইয়া যা! তুই এ কাহার কাছে তোর ও-কিসের পিপাসা মিটাইতে আসিস্! আমি তোর মা নই, মা নই—যে-মার কাছে তোর স্নেহের আব্দার রক্ষা পাইত, যে-মা তোর সমস্ত ভুল-চুক, সমস্ত যাতনা মুছাইতে পারিত, সে-মা তোর মরিয়া গিয়াছে! সে নাই! সে নাই! দারুণ জ্বালায় অহর্নিশি নিজে তাই দগ্ধ হইতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া সুষমা এ-সব কথা বলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া নিখিলকে কিছুতেই সরাইতে পারে না। কোনোদিন সে তাহা করিতে পারিবে না!

কিন্তু বুকে টানিবার চেষ্টা করিয়াই বা ফল কি! অভয়াশঙ্কর কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করিবেন না। কেন? ওগো, এ বিরাগ কেন? এ প্রশ্নের কোনো সমাধানই সুষমা খুঁজিয়া পায় না! নিখিল অভয়াশঙ্করেরই পুত্র, নিখিলের সুখই তাঁহার একমাত্র কাম্য! সেই নিখিলের পায়ের কোথাও কাঁটা ফুটিলে অভয়াশঙ্কর সেখানে বুক দিয়া পড়িতে চান,—এমন গভীর তাঁহার ভালোবাসা। তবে সেই নিখিলকে সুষমা ভালোবাসিতে গেলে, সেই নিখিলকে সুখী করিতে গেলে কেন উনি মাঝে পড়িয়া দুজনকে দু-ঠাঁই করিবার জন্য এতখানি চঞ্চল হইয়া ওঠেন! সুষমা যদি পেটে একটা ছেলে ধরিত, তাহা হইলেও স্বতন্ত্র কথা ছিল! কিন্তু সন্দেহের সে মূলকে স্বামীর মন বুঝিয়াই না সুষমা নিজে হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! তবে? তবে? কেন তবে এই অমূলক শঙ্কা! অকারণ এই কঠিন শৃঙ্খলে বেচারার হাত-পা বাঁধিয়া দেওয়া কেন? ভাবিতে ভাবিতে সুষমার দু চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

তারপর এই কাল রাত্রিকার ঘটনা। বৃষ্টিতে ছেলের ঘরে ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। ছেলে না-আসায় সুষমার মনেও ভাবনা কম হয় নাই। নিজে পেটে না ধরিলেও নিখিলের জন্য কাতর হইয়া

কায়-মনে কেবলই সে ঠাকুরকে ডাকিয়াছে, এখানে-ওখানে চারিধারে লোক পাঠাইয়াছে, ঘর-বাহির করিয়া মরিয়াছে! সেই ছেলে ঘরে ফিরিয়া-না-আসার স্পষ্ট কৈফিয়ৎ যখন দিল, এবং সে-কৈফিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে-চোখে কত বড় অপরাধীর ক্ষমা-প্রার্থনার কি প্রকাণ্ড করুণ-মিনতি উছলিয়া উঠিল, তখন তাহাকে এমন রাক্ষসের মতো কঠোর শাস্তি দেওয়া—এ কি মানুষের কাজ! সারারাত্রি নির্জ্জন ঘরে ছেলেটা খুনী-আসামীর মতো চাবি-বন্ধ পড়িয়া রহিল, মুখে একটু জল অবধি দিতে পাইল না,—এ নৃশংসতা সুষমার বুকে বাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর বাজিয়াছে! কিন্তু কিছু করিবার উপায় ছিল না! সে মা নয়, মা নয়! সে যদি নিখিলের মা হইত, তাহা হইলে দেখিয়া লইত, অভয়াশঙ্কর কেমন করিয়া ঐ দুধের ছেলেকে মার কোল হইতে ছিনাইয়া অমন হাজত-বন্ধ আসামীর মতো ঘরে পুরিয়া রাখেন!

সুষমা ভাবিল, পাছে পরের মুখে ছেলে কোন্ দিন জানিয়া ফেলে, সুষমা তার মা নয়, তার মা মরিয়া গিয়াছে এবং জানিয়া কোনোদিন সে পাছে অশান্তি ভোগ করে, এজন্য বাড়ীর সমস্ত জঞ্জাল বাড়ীতে রাখিয়া স্বামী আসিয়া এই নির্জ্জন গ্রামে সুনন্দায় সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্যে নূতন বন্দোবস্তে জীবন-যাত্রার নূতন পালা পত্তন করিয়াছেন! কিন্তু এই যে-সব ব্যবহার—ইহাতে ছেলের কি আর সে দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে কিছু বাকী থাকিবে? সুষমার প্রতি এই যে ব্যবহার—এই দাসীর মতো, বাঁদীর মতো,—ছেলের মা বলিয়া বাহিরে লোকের সাম্‌নেও এতটুকু সম্মানের চোখে স্বামী তাহাকে দেখিতে পারেন না—ছেলে কোনোদিন এগুলার কারণ খুঁজিবে না? আর-পাঁচটা বাড়ীতে এবং তাহার পড়িবার বইগুলোতেও তো মা আর ছেলের সম্পর্কের কথা নিখিল নিত্য দেখিতেছে, পড়িতেছে!...তবে?

ভাবিতে ভাবিতে সুষমার মন শেষে তাতিয়া উঠিল। এটুকু সম্মান

দিবার শক্তি যদি না রহিল, তবে লোককে মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া মা-হারা ছেলেকে মায়ের অভাব জানিতে দিবে না বলিয়া ভড়ং করিয়া সুষমাকে বিবাহ করিয়া আনা কেন! বিবাহের পূর্ব্বে সুষমা সামনেও যে অত-বড় প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া ছিলে,—ওগো, আমার মা-হারা নিখিলের মা হয়ে তুমি থাক্‌বে, তোমাকেই সে নিজের মা বলে জানবে—সে কথা যখন রাখিতে পারিবে না, তখন কেন সুষমার এ সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে? কেন তাহাকে এ আগুনে পুড়াইবার জন্য এখানে ধরিয়া আনিলে? কেন এ মাতৃ-হৃদয়া নারীর স্নেহের পিপাসা চিরদিনের জন্য অতৃপ্ত রাখিলে? সুষমা তো তোমার কাছে কোনোদিন কোনো অপরাধ করে নাই! তোমার করুণার প্রত্যাশী হইয়াও কিছু সে-দিন সে তোমার পথে দাঁড়ায় নাই! তবে? হারে স্বার্থান্ধ পুরুষ, নিজের সুখটাকে ইন্দ্রের মতো সহস্র চক্ষু মেলিয়া বেশ দেখিতে পাও আর ক্ষুদ্র নারীর মনের অত-বড় যে ক্ষুধা, সেটা তোমার চোখেও পড়ে না!

দামু আসিয়া বলিল—মোহনভোগ হয়েছে মা?

ডিশে মোহনভোগ তুলিয়া সুষমা একখানা চামচ-সমেত ডিশটা দামুর হাতে দিয়া বলিল,—এইটে দিয়ে এসে খোকাবাবুর দুধ নিয়ে যেয়ো, দামু।

দামু গমনোদ্যত হইলে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—খোকাবাবু পড়ছে তো?

—হ্যাঁ মা, পড়ছেন।

—তোর বাবু কোথায় রে দামু?

—কি জানি মা, কোথায় গেলেন যেন! দুটি বাবু এসেছিল কোথা থেকে, তাঁদের সঙ্গে বেরুলেন।

২

নিখিল বসিয়া পড়িতেছিল,—C-l-o-u-d-s ক্লাউড্‌স্‌; ক্লাউড্‌স্‌ মানে, মেঘসকল। G-a-t-h-e-r গ্যাদার; গ্যাদার মানে, জড়ো হওয়া; in the sky মানে, আকাশে। Clouds gather in the sky মানে আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছে। T-h-e-r-e দেয়ার; দেয়ার মানে, সেখানে। w-o-u-ld উড্‌ b-e বী, would be মানে, হবে a—a মানে একটি। s-t-o r-m ষ্টর্ম মানে, ঝড়। There would be a storm মানে, সেখানে একটি ঝড় হবে। তারপর হঠাৎ মাষ্টার-মশায়ের পানে চাহিয়া সে বলিল—সেখানে কি, মাষ্টার-মশায়? কোন্‌খানে?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—ওখানে there কথাটা ইংরিজির মাত্রা—বুঝলে? ওটা idiom। ওর যে একটা বিশেষ কোনো মানে আছে, তা নেই,—অথচ there না দিলে ইংরিজিই হবে না। ও-সব ঘোর-প্যাঁচগুলো একটু বড় হলে বুঝবে। এখন there would be a storm কথাটার মানে বল্‌বে, ঝড় উঠবে।

ঝড়! নিখিলের মন অমনি পড়ার বই ছাড়িয়া কাল সন্ধ্যার সেই ঝড়ো হাওয়ায় গিয়া উঠিল। বিশাল নদী বাঘমতীর তীরে একটা গাছের তলায় কাল সন্ধ্যায় সে দাঁড়াইয়াছিল। ঘন কালো মেঘে ওপার ঢাকিয়া গিয়াছে, সেই মেঘের আঁধারে ওপারে গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, যেন প্রকাণ্ড একদল দৈত্য জলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, শুধু কাহার একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায়! সে ইঙ্গিতটুকু পাইলে এখনি ঝাঁপাইয়া পড়িবে! নিখিল তন্ময় হইয়া ভয়-ভারাতুর মনে গাছগুলার দিকেই চাহিয়াছিল। সহসা কোথা হইতে সোঁ-সোঁ গর্জ্জন উঠিল। আর সে ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই

চারিধার ঝাপ্সা করিয়া জোরে কী না বৃষ্টি নামিল! ভয়ে দিশাহারা হইয়া কোন্ দিকে সে পলাইবে কিছুই ঠাহর করিতে না পারিয়া একদিকে ছুট দিয়াছিল। সে কি ছুট! তারপর সেই ঘন-ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া এক কুটীরে আলোর একটু রশ্মি দেখিল, আর সেই কুটীরেই শান্ত-সুন্দর একটি গৃহকোণে সোনার, বনমালীর কি সে স্নেহ! কালিকার সেই দুর্য্যোগ-রজনীর ভয়-গম্ভীর ভীষণতা আজ এ স্নিগ্ধ প্রভাতে স্মৃতির মাধুরী মাখিয়া সুন্দর ছবির মতো মনে জাগিতেছে! সোনার সেই কল-কাকলী বাঁশীর তানের মতোই মধুর মনে হইতে লাগিল। সেই খড়ে-ছাওয়া, মাটীর দেওয়ালে ঘেরা মিট্‌মিটে প্রদীপের আলো-জ্বালা স্যাঁৎসেঁতে ঘরের মধ্যে কি সুখেই না তাহার সে সময়টুকু কাটিয়াছিল! সোনা ভাবিয়াছিল, সে রাজপুত্র,—তাহার তালপত্রের খাঁড়া আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে!

মনে মনে হাসিয়া নিখিল ভাবিল, সোনা নেহাৎ ছেলে-মানুষ কিনা, তাই ও-সব গল্পগুলাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে! তবু, হোক সে ছেলে-মানুষ,—সোনার চলায়-খেলায় কাল যে সে স্বচ্ছন্দ সরল ভঙ্গীটুকু দেখিয়া আসিয়াছে, মুক্ত স্বাধীনতার যে অবাধ হিল্লোল তাহার কথায়, দৃষ্টির ভঙ্গীতে লক্ষ্য করিয়াছে···নিজে ছেলে মানুষ হইলেও তাহা হইতে সে নিজে কি করুণভাবে বঞ্চিত, তাহা নিখিল বুঝিল। তাহার পিছনে এই যে মাষ্টার-মহাশয়, দাসী, চাকর, দ্বারবান প্রভৃতির কড়া পাহারা, মাথার উপর পড়ার চাপ, চলিতে-ফিরিতে আইন-কানুনের কাঁটা আষ্টে-পৃষ্ঠে ফুটিয়া বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সোনাকে দেখিয়া সোনার অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া আজ যেন তাহায় দম বন্ধ হইয়া আসিল! কল্পনা-নেত্রে সে দেখিতে লাগিল, এই যে বৃষ্টি-ভেজা প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ আলোয় নিখিল এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে এখন কতকগুলা ইংরাজী কথার মানে মুখস্থ করিয়া সারা হইতেছে, আর

সোনা হয়তো ওদিকে এ-সময় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের দলে মিশিয়া গাছ-তলায় ঝরা ফুল কুড়াইয়া আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে!

সামনেই খোলা জানলার মধ্য দিয়া ছুচোখের দৃষ্টিকে নিখিল বাহিরে প্রসারিত করিয়া দিল। ঘরের পাশেই ছোট বাগান,--গাছের পাতা-গুলা ভিজিয়া ধুইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, গাছের নীচে মাটীর শুষ্ক ঢেলা ভিজিয়া নরম হইয়া রহিয়াছে,—ছু-একটা পাখী নিঝুমভাবে বর্ষা স্নাত প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। এ সময়টা যদি একবার সে ছুটি পাইত! তাহা হইলে এখনই সে পা দিয়া দলিয়া পিষিয়া ঐ নরম মাটীর ভিজা স্তূপটাকে কেমন চোস্ত করিয়া ফেলিত—ভাঙা ছেঁড়া গাছের ডাল-পালা লইয়া নরম মাটীতে পুঁতিয়া ছোট-খাট একটা বাগান তৈয়ার করিয়া ফেলিত! পথের ওধারে যে মস্ত নালা ...জলে সেটা নিশ্চয় ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সেই জল নদীর স্রোতের বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে,—সেই নালার জলে যদি কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দিতে পারিত! আঃ, কি মজাই হইত! হায়রে, সে যদি বড়লোক জমিদারের ছেলে না হইয়া ঐ বনমালীর ঘরে সোনা কি তাহাদেরি ঘরের অন্য-একটা ছেলে হইয়া জন্মিত! নৈরাশ্যের তীব্র একটা নিশ্বাস নিখিলের মনের মধ্যে ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইল।

মাষ্টার মহাশয় তখন কাছে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতে ছিলেন; হঠাৎ নিখিলকে এত-বড় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া তাহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন। নিখিল তখন শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—বসে আছো কেন নিখিল? পড়ো।... তারপর...'Birds are flying to their nests...Birds মানে, পাখী—পড়ে যাও, গড়্‌গড় করে'।

নিখিলের মনে কল্পনার যে ফানুশ আকাশে উধাও হইয়া উড়িয়া চলিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয়ের কথায় সে ফানুশ ছিঁড়িয়া কোথায় অদৃশ্য

হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে সে আবার পড়িতে লাগিল,—B-i-r-d-s বার্ড্স্ মানে, পাখীগুলি।

বাহিরে দুই-চারিটা পাখী ভোরের আলোব দেখা পাইয়া রাত্রিকার দুর্য্যোগের কথা ভুলিয়া আনন্দে কলতান তুলিয়াছে,—সে কলরবে নিখিলের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত আবার ঐ মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশের পথে উধাও হইয়া উড়িয়া চলিল। মুখ শুধু বানান্ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ-চালিত কলের গান গাহিতে লাগিল—B·i-r-d-s বার্ড্স্; বার্ড্স্ মানে, পাখীগুলি—B-i-r-d-s বার্ড্স্; বার্ড্স্ মানে, পাখীগুলি……

৩

সারা দুপুরবেলা নিখিল হাতের লেখায় আর অঙ্ক কষার অনেকগুলা ভুল করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের হাতে সেগুলা শুধরাইবার জন্ম তুলিয়া দিল। মাষ্টার মহাশয় ভুল কাটিতেছিলেন, নিখিলের মন সে দিকে কিন্তু কিছুতেই সায় দিতে চাহিল না,—সে শুধু মাথা নাড়ার ফাঁকে-ফাঁকে বাঘমতীর তীরে কাজল-কালো মেঘের তালে নাচিতে নাচিতে গাছের তলায় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট ওপারের সেই গাছের সার, কালো জলে তরঙ্গের সেই মৃদু-মধুর বিচিত্র দোলে রঙ্গ-নৃত্য, লাল পেন্সিলের দাগের মত কালো আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের সে অগ্নিলেখা, আর সোনাদের ছোট কুঁড়ে ঘরখানি রঙীন্ ছবির মতো…তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল. আজও সে ঐ ধারে বেড়াইতে যাইবে। সোনাদের বাড়ীতে নাই গেল, সোনাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া সেই নদীরধারে জামগাছের তলায় গিয়া বসিবে,—ওপারের কোণ ঘেঁষিয়া নদীর বাঁক ঘুরিয়া গিয়াছে,

—নদীটাকে উঃ, কি মস্তই না দেখায়! সেইখানে গিয়া সে বসিবে, আর দিনের আলোয বনমালীদের বাড়ীখানাও ভালো করিয়া দেখিয়া লইবে! বনমালীদের সঙ্গে মিশিতে বাবার বারণ আছে, তাদের ঘর-বাড়ী দূর হইতে যদি সে চোখে দেখে, তাহাতে তো আর বারণ নাই!

কোনোমতে রুটিনের বাঁধা সময়টুকু এ খাতা পাড়িয়া ও-বই নাড়িয়া কাটাইয়া দিয়া সে খাবার খাইবার জন্য অন্দরে গেল। সুষমা ডিমের পুডিং করিয়া রাখিয়াছিল, পুডিং ও খাবার খাইয়া মার কাছেই সাজগোজ করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। সুষমা বলিয়া দিল,—আজ একলা যেযোনা যেন আবার"...আর সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরো। না হলে, জানো তো, উনি আবার রাগ করবেন।

—সে ভয় নেই মা। নন্দকে নিয়ে আমি বেড়াতে যাচ্ছি। বলিয়া তীব্র আগ্রহে নিখিল অনুগত নন্দ-ভৃত্যকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল।

নন্দ বলিল,—কোন্ দিকে যাবে, দাদাবাবু?

—চল্ না, এক-জায়গায় আমি নিয়ে যাই। বেড়ে জায়গা! দেখবি? কখনো দেখিস্ নে!

আকাশে তখন মেঘ ছিল না। নন্দর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল। হাটতলা পার হইয়া, শিবের মন্দির ঘেঁষিয়া, রায়েদের প্রকাণ্ড পানা-পড়া পুকুরটার পাড় ঘুরিয়া, অশথতলা দিয়া দুইজনে ক্রমে নদী-তীরের খোয়া-বাহির-করা পথে আসিয়া পড়িল। অদূরে গঙ্গা-যাত্রীর ঘাট, পাশে শ্মশান।

নন্দ বলিল—এই ঘাটে যদি রাত্তির বেলায় আসতে পারো দাদাবাবু, তবেই বলি, তুমি বীর!

নিখিল ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কেন রে?

—বাব্বা! জানো না তো দাদাবাবু, এই ঘাটে মড়া পোড়ায়। রাত্রে

এখানে ভূত-পেত্নীর মেলা বসে। ওঃ, সে সময় এধার দিয়ে চলবে, কার সাধ্যি!

কথাটা শুনিয়া নিখিল মজা পাইল! সে বলিল,—ধ্যেৎ, ভূত-পেত্নী নাকি আবার আছে! ও শুধু বইয়ের গল্প! মিথ্যা।

নন্দ বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলিল,—তবেই তুমি ভারী জানো! একদিন শুনবে তবে, দাদাবাবু? ঐ যে মহেশ ভশ্চায্যি আসে, এধারে তেনার বাড়ী এইদিক দিয়ে যেতে হয়—তা কর্ত্তাবাবু সেদিন পাঠালেন তেনাকে লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দিতে। তাই এসেছিলুম আমি—আসবার সময় বেশ এলুম,—তখন দু'জনে ছিলুম, কিছু হলো না। তারপর যখন ফিরছি,—আমি একলা,…অত আমার মনেও ছিল না, গান গাইতে গাইতে আসছি,—যেমন এই ঘাটের সাম্‌নে আসা, অমনি ভিতর থেকে দপ্‌ করে আলো জ্বলে উঠলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে ফটাফট্ ফটাফট্ কাঠ-ফাটার শব্দ! বাপ রে কি লড়াই! আমি তো চোঁচা দৌড় দিলুম। তারপর খানিকদূর এসেচি, আর পিছনে গোঁ-গোঁ আওয়াজ! আমি চালাক ছেলে, আর পিছনে ফিরি? দৌড়, দৌড়, দৌড়! দৌড়ে একেবারে সেই হাটতলায় পৌঁছে তবে দাঁড়াই! তা তুমি দাদাবাবু এদিক্‌বাগে বেড়াতে এলে, জানো না তো ব্যাপার!

হাসিতে হাসিতে নিখিল বলিল—তোর মিছে কথা. নন্দ। আচ্ছা, আজ তো এদিকে এসেচি, সন্ধ্যার…সময় তুই যদি ভূত দেখাতে পারিস্, তাহলে তুই যা চাবি, দেবো।

নন্দ ভীতস্বরে বলিল—না দাদাবাবু, আমি কিছু চাই না তোমার কাছে। ও দেখাতেও পারবো না। বাবারে, শেষে আমি মরি আর কি ভূতের হাতে! সেদিন যে পালান পালিয়েছিলুম!

এমনি গল্প করিতে করিতে নিখিল বনমালীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতরের উঠান

হইতে ছেলেমেয়েদের খেলার মিশ্র কলরব ভাসিয়া আসিতেছে। নিখিলের মন অমনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, একবার বনমালীকে ডাকিবে? সোনা কি খেলা খেলিতেছে দেখিয়া যাইতে দোষ কি! কাল রাত্রে অত যত্ন অত আদর করিয়াছে। আহা! নিখিল দাঁড়াইয়া বনমালীর কুটীরের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

নন্দ বলিল—দাঁড়ালে কেন দাদাবাবু? চলো।

নিখিল বলিল,—কাল রাত্রে এদের বাড়ীতে আমি ছিলুম। সেই যে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল···

নন্দর গায়ে কাঁটা দিযা উঠিল। এইখানে, সেই ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে! আর অদূরে ঐ ঘাট আর শ্মশান! কাল রাত্রে সে যখন বোসপাড়ার দিকে দাদাবাবুর খোঁজে বাহির হইয়াছিল, তখন ঝড়ের গর্জ্জনে কি ভয় না পাইয়াছিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে নন্দ নিখিলের পানে চাহিল।

নিখিলের প্রাণ ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল,—একবার ওদের ডেকে দেখবো নন্দ? কাল আমায় অত যত্ন করেছিল—একবার শুধু বলে আসবো, অত ভিজে কোনো অসুখ করেনি আমার! ওরা জানতে চেয়েছিল কি না—এইটুকু বলিয়া চপল আগ্রহে নন্দর উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া নিখিল একেবারে গিয়া বনমালীর কুটীরের দ্বারে ঘা দিল।

ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, —কে?

এ সোনার গলা!

অসহ্য আনন্দে নিখিলের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখ-চোখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তেই দ্বার খুলিয়া সোনা চীৎকার করিয়া উঠিল,—ও-মা, দ্যাখো, দ্যাখো, কালকের সেই রাজপুত্তুর এসেছে।

সোনার মা আসিয়া আদর করিয়া নিখিলকে ভিতরে লইয়া গেল।

উঠানে পাড়ার একপাল ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া কাণা-মাছি খেলিতেছিল, তাহারা নির্বাক বিস্ময়ে এই ইংরাজী-পোষাক-পরা ফুট্‌ফুটে ধনী-সন্তানকে দেখিতে লাগিল।

নিখিল বলিল,—সোনা ! তোমার বাবা কোথায় ?

সোনা খুব সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, বলিল,—বাবা গঞ্জে গেছে। এখনি ফিরবে। কথাটা বলিয়া সগর্ব্বে সে ক্রীড়া-সঙ্গীদের পানে চাহিল, অর্থটা—ছাখো, রাজপুত্রের সঙ্গে আমার ভাবের মাত্রাটা তোমরা একবার ছাখো।

সোনার মা একটা বেতের মোড়া আনিয়া উঠানের মধ্যে পাতিয়া দিলে নিখিল তাহাতে বসিল। নন্দ চোরের মতো দাওয়ার উপর বসিল। দৃষ্টি রহিল, মাথার উপর আকাশে বহু ঊর্দ্ধে একটা চিল উড়িতেছিল, সেই চিলের পানে।

সোনা বলিল,—আজ যদি আবার বৃষ্টি আসে, তাহলে বেশ হয়,—না ? কালকের মতো অনেক রাত্তির অবধি তুমি থাকবে। বলিয়া সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কথাটা শুনিয়া নিখিল মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিল, একবার আকাশের দিকেও চাহিল—আকাশ আজ পরিষ্কার, কোথাও মেঘ নাই। আঃ ! নিখিল আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

তারপর সোনার সঙ্গে কত কথাই যে হইল !···কোনোটা বইয়ে পড়া, কোনোটা মার কাছে শোনা···এমনি নানা গল্প বলিয়া নিখিল তাহার এই ক্ষুদ্র ভক্তটির চিত্ত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল। সোনা স্থির হইয়া গল্প শুনিতে লাগিল, আর তাহার খেলুড়ির দল প্রথম-বিস্ময়ের মাত্রা কাটিলে দূরে বসিয়া পড়িল এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে সে সব গল্প শুনিতে লাগিল !

সোনা বলিল—মার কাছে সেই বুড়ো দত্যির গল্পটা শুনবে ? বেশ গল্প। বলো না মা, রাজপুত্তুর সে গল্পটা শুনবে,—বলো—

সোনার মা ছোট একখানি পরিষ্কার ডালায় নারিকেলের কুচি ও সদ্য-ভাজা গরম মুড়ি আনিয়া নিখিলকে বলিল,—দুটি খাও, বাবা, খাও —নাহলে আমাদের মনে দুঃখ হবে। কাল ঐ রাত্রে তোমাকে পাঠিয়ে অবধি মন এমন হয়েছিল—যে বাছার আমার অসুখ না করে! সুখী প্রাণ, যে জল-ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে! সোনার বাপ বলছিল, আজ রাত্রে গিয়ে খপর আনবে—সারাদিন তো আর একতিল ফুরসুৎ পায় না।—আর সোনা কত কথাই বলছিল—কেবলি বলছিল,—আমি রাজপুত্তুরের বাড়ী যাবো! যাবার জন্য কি আব্দার ওযে ধরেছিল।

সোনার মা নন্দকেও মুড়ি দিল—নারিকেল দিল; তারপর নিখিলকে বলিল,—গল্প শুনবে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি গাইটাকে খড় দিয়ে এসে গল্প বল্‌চি।

সোনার মা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গল্প বলিতে বসিল। ও-দিকে সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসিয়া ক্রমে নিভিয়া গেল—বনমালীর উঠানও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। গল্প শুনিতে-শুনিতে নিখিল বা নন্দ কাহারো সেদিকে খেয়াল ছিল না। গল্প যখন থামিল, আকাশে তখন অনেকগুলা তারা ফুটিয়াছে। দেখিয়া নিখিলের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল! এ কি—এ যে রাত্রি হইয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ—আজ কি আর বাবার কাছে রক্ষা থাকিবে!

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, বলিল—রাত হয়ে গেছে, আমরা যাই।

সোনার মা বলিল,—একটা আলো দিই বাবা,—অন্ধকার পথ!

নিখিল খুব ব্যস্ত হইয়া বলিল,—না, না, আলোর দরকার নেই। আমি নন্দর সঙ্গে যাবো। বলিয়া সে আর বিদায়ের কালে কোনো কথা না পাড়িয়া একেবারে ছুটিয়া বাহিরে পথে গিয়া দাঁড়াইল—নন্দকে চুপি-চুপি বলিল—ছুট্‌তে পার্‌বি নন্দ? ছুটে যাই, চ, নাহলে বেশী রাত হলে বাবার কাছে বকুনি খাবো।

নন্দরও ভয় হইতেছিল। সে বলিল—ছুট্‌তে পারবো দাদাবাবু। ত্যাখো দেখি, তুমি যদি গল্প শুনতে না বসতে!

—তুই আমায় বললি নে কেন যে রাত হয়ে গেছে!

—বাঃ, আমিও যে গল্প শুনছিলুম—আমি কি খেয়াল রেখেচি যে রাত হয়েছে!

কথা কাটাকাটি করিয়া ফল নাই বুঝিয়া নিখিল বলিল,—আয়, ছুটে আয়। ছুটে গেলে কতক্ষণই বা লাগবে?

দুজনে তখন ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কত পথ ছুটিবে? খানিক ছুটিয়া নিখিল হাঁফাইয়া পড়ে, অমনি আবার ধীরে ধীরে চলে—আবার যেই দেখে, অন্ধকার খুব গাঢ় ঘন হইয়া আসিয়াছে, ঐ গাছপালায় ঝোপে-ঝাপে ঝিঁঝিঁর রব রাত্রিটাকে আরো ভারী করিয়া তুলিয়াছে, তখন সে আবার ছোটে। এমনিভাবে কখনো ছুটিয়া, কখনো ধীরে চলিয়া, আবার কখনো বা থামিয়া দম্‌ লইয়া নন্দর সঙ্গে নিখিল যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

চোরের মতো পা টিপিয়া ধীরে ধীরে সে পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সর্ব্বনাশ,—অভয়াশঙ্কর সেখানে বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সে ঘরে ঢুকিতেই অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—নিখিল···

—বাবা—বলিয়া নিখিল পিতার পানে চাহিল।

গভীর-কণ্ঠে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমি ঘড়ি দেখতে শিখেচো, না?

ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, শিখিয়াছে।

দেওয়ালে ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন, —কটা বেজেচে বলো তো?

সর্ব্বনাশ! নিখিল ঘড়ির দিকে চাহিয়া চোখ নামাইল, কোনো কথা বলিল না।

অভয়াশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—বলো।

নিখিল ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল,—ন'টা বাজতে বারো মিনিট।

—হুঁ। এখন পড়ো। রাত্রে দু'ঘণ্টা তোমার পড়বার কথা। এগারোটা বাজতে বারো মিনিট হবে যখন, তখন পড়া বন্ধ করে ভিতরে খেতে যাবে, তার আগে খাওয়া বা ঘুম কিছুই হবে না—বুঝলে? এ কথা মনে থাকবে?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, থাকিবে।

—বেশ। বলিয়া অভয়াশঙ্কর কক্ষ ত্যাগ করিলেন। নিখিল টেবিলের ধারে গিয়া বসিয়া বই খুলিল।

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—ভূগোলখানা খোলো। আজ এশিয়াটা সব দেখে রাখো, কাল সকালে উনি ঐ পড়াটা নেবেন, বলে গেছেন।

নিখিল ধীরে ধীরে ভূগোল খুলিয়া বসিল। এতখানি পরিশ্রমের পর শ্রান্ত, ক্ষুধায় কাতর দেহ, চোখে ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিতেছে, এবং চোখের কোণে জল জমিয়া উঠিতেছে,—সে জল শেষে এমন ঠেলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল যে বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে বড় বড় মোটা অক্ষরে লেখা এশিয়া কথাটা ঝাপ্সা হইয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল। কাণের কাছে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা দুলিয়া-দুলিয়া এমন শব্দ করিতে লাগিল যে নিখিলের মনে হইতে লাগিল, ঘড়িটা যেন রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর—এই কথাই বার-বার বিদ্রূপচ্ছলে চীৎকার করিয়া তাহাকে শুনাইতেছে! রাজপুত্র! হাঁ, রাজপুত্রই বটে—বন্দী রাজপুত্র!

৪

আদেশ দিয়া অভয়াশঙ্কর যখন উপরের ঘরে ঢুকিলেন, সুষমা তখন সেই ঘরেই জানলার ধারে বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়াছিল। অভয়াশঙ্করকে একলা দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নিখিল? সে খেতে গেছে?

গম্ভীরভাবে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—না।

ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া সুষমা বলিল,—তবে? সে যে ফিরেচে, শুনলুম।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হ্যাঁ, এই এখন ফিরচে, তাই তার সাজা হয়েচে, এগারোটা অবধি পড়ে তবে সে খেতে পাবে, শুতে পাবে। তার আগে নয়।

সে গম্ভীর স্বর শুনিয়া সুষমা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

একটু থামিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কাল রাত্রে ঐ শাসন হলো, আবার আজ এই!

কথাটুকু বলিয়া অভয়াশঙ্কর বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সুষমা ভয়ে কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সকালে সে কত করিয়া মনকে বুঝাইয়া শক্ত করিয়াছিল যে নিখিলের উপর স্বামী কড়া শাসন প্রয়োগ করিলে যেমন করিয়াই হোক, শাসনের সে বাঁধন সুষমা কতক শিথিল করিয়া দিবে, কিন্তু অভয়াশঙ্করের ক্রোধ-গম্ভীর স্বর ও কঠিন ভঙ্গী দেখিয়া কাজে তাহা করিতে পারিল না, শুধু ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি বিপদেই

তিনি পড়িলেন এই নিখিলকে লইয়া! ছেলে যদি একটুও তাঁহার মন বুঝিয়া চলিত! সে যদি বুঝিত, তাহাকে শাস্তি দিতে বাপের প্রাণে কতখানি বাজে! অথচ এই অপরাধ-করার-জন্য শাস্তি না দিলেও নয়! শাসন আলগা করিয়া ছেলের ভবিষ্যৎটা তো আর মাটী করা যায় না! সুষমা যে আসিয়া তার মার আসনে বসিয়াছে, সেই বা সে-মার কাজ কোথায় করিতেছে! সে তো নিখিলকে বুঝাইতে পারে, কোন্ কাজগুলা তাহার করা সাজে না, করা উচিত নয়! ছেলেকে বুকে তুলিয়া ননী-ছানা খাওয়াইলেই তো আর ছেলে মানুষ করা হয় না! তিনি চান, সুষমাকে ছেলে মার মতোই ভালো-বাসিবে, আবার সেই মার মতো ভয়ও করিবে। এই শাসনের ভারটা তাঁহার হাত হইতে সুষমা নিজের হাতে তুলিয়া লইলেই যে ভালো হয়! তাহা সুষমা বুঝিবে না! কি ভাবিয়া সুষমাকে তিনি বিবাহ করিলেন, আর কাজে এ ঘটিল! নিখিলকে লইয়া যে বিশৃঙ্খলা, সেই বিশৃঙ্খলাই রহিয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন,—সুষমা তেমনি পুতুলের মতো তখনো নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে। অভয়াশঙ্করের বিরক্তি ধরিল। এইখানেই তো প্রভেদ! নিখিলের এত-বড় শাস্তির কথা শুনিয়া সুষমা বেশ নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে! কেন, সে কি তাঁহার কাছে আসিয়া একবার মিনতি করিয়া বলিতে পারে না, ওগো, অত রাত্রে খাইলে ছেলেটার অসুখ হইবে,—খাইয়া সে এখানে আসিয়া একটু পড়ুক, তার পর যে ব্যবস্থা হয়, করিয়ো!…কিন্তু এ কথা সে কেন বলিবে? সে তো আর সত্যই কিছু নিখিলের মা নয়! সে যে…

ভাবিতে ভাবিতে অভয়াশঙ্করের বিরক্তি বাড়িয়া উঠিল। তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুষমা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শেষে বলিল,—শুলে যে! খাবে না?

বিরক্তির স্বরে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—না।

এ কথার পর কি বলিবে, কি জবাব দিবে, সুষমা তাহা ভাবিয়াও পাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার সেই জানলার ধারে গিয়া বসিল। আকাশে ছোট-ছোট কয়েক টুকরা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, পাশে বাগানের বড় বড় তালগাছের আড়ালে ক্ষীণ চাঁদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদ্য-আরোগ্য-পাওয়া রোগীর মতোই শীর্ণ তার মূর্ত্তি। ছোট ছোট মেঘগুলা কখনো চাঁদের গায়ে পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, আবার কখনো নিজেদের পাৎলা আবরণটুকু চাঁদের মুখ হইতে টানিয়া সরাইয়া লইতেছে। মেঘেদের এই লুকোচুরি-খেলায় ক্ষীণ চাঁদ হাসিয়া যেন সারা হইতেছে। শান্ত স্তব্ধ রাত্রি—অদূরে পল্লীর কোন্ আখড়া হইতে ছেলেদের গলায় গানের শব্দ সে স্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে চিরিয়া চিরিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সুষমা ভাবিল, বেচারা নিখিল! কি বেদনা বুকে লইয়াই না সে এখন পড়ার বই মুখস্থ করিতেছে! মুখে পড়া বলিয়া গেলেও বেচারা হয়তো এ বিপদে সুষমার কথাই ভাবিতেছে—মা আসিয়া কখন্ তাহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে! সে তো জানেনা, মার এ-মার শক্তি কতটুকু! একটা সামান্য দাসীর যে অধিকার আছে, এ-মার সে-টুকু অধিকারও নাই! সে যে কত-বড় অসহায়, কত নিরুপায়! হায়রে, এমনি করিয়াই উনি ছেলেকে বুঝাইবেন যে, না, সে মাতৃহীন হয় নাই! তাহার কোনোদিকে কোন অভাব নাই!

নিরুপায় চিত্তে সুষমা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। তার পর সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে আকাশের পানেই চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে ঐ একটা, দুটা, অনেকগুলা নক্ষত্র ফুটিয়াছে। ছেলেবেলায় সে শুনিয়াছিল, ওগুলা চোখ! যে-সব লোক মরিয়া যায়, তাহারাই সন্ধ্যায় জগতের কোলাহল থামিলে প্রাণের অসহ্য মায়ায় চোখ মেলিয়া তাহাদের

চির-পরিচিত সুখের নীড় এই পৃথিবীর পানেই চাহিয়া থাকে! ঐ নক্ষত্রের চোখ মেলিয়া নিখিলের মা কি পৃথিবীর এক কোণে এই বাড়ীটির পানেই অধীর একাগ্র দৃষ্টিতে এখন চাহিয়া নাই? ছেলেবেলা-কার সেই সরল বিশ্বাসটুকু আজো যদি সুষমার মনে তেমনি অটুট থাকিত! এই ছেলে-ভুলানো রূপ-কথাটা যদি নিছক কল্পনার না হইয়া সত্য হইত! সুষমা আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দুই উদাস চক্ষু ঘুমের ঘোরে কখন্ যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারিল না! হঠাৎ এক দাসীর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিলে সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে বুঝিল, তাইতো,—সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! আশ্চর্য্য! ঘুম তাহার চোখে আসিল কি করিয়া?

উঠিয়া চোখ মুছিয়া সে চাহিয়া দেখে, শয্যায় অভয়াশঙ্কর নাই। বিস্মিত হইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু?

দাসী বলিল,—বাবু নীচেয় খেতে গেছেন, দাদাবাবুকেও খাওয়াচ্ছেন। তাই মা, তোমায় ডাকতে এলুম—কি দরকার হয় না হয়!

সুষমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাসীর পানে চাহিল,—দাসী তো জানে না, স্বামীর সঙ্গে সুষমার কি সম্পর্ক! স্বামী উঠিয়া গিয়াছেন, সুষমাকে একবার ডাকা তিনি প্রয়োজন বুঝিলেন না! অভিমানের অসহ্য বেদনায় সুষমার বুক ফাটিয়া পড়িবার মতো হইল। কিন্তু হায়, এ তার কার উপর কিসের অভিমান! তাহার দুই চোখের পিছনে যেন সাগরের জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া আসিল! পাছে দাসীর কাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নীচে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর ও নিখিলের খাওয়া তখন চুকিয়া গিয়াছে। নিখিল আঁচাইতেছে, অভয়াশঙ্কর পাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—যা যা বলেচি, এবার থেকে সব মনে থাকবে? এক-চুল এদিক-ওদিক হবে না আর?

আঁচানো শেষ করিয়া অত্যন্ত ভীত মৃদু কণ্ঠে নিখিল বলিল,—না।

—আচ্ছা। বলিয়া অভয়াশঙ্কর নিকটস্থ আল্না হইতে একটা শুষ্ক তোয়ালে টানিয়া ছেলের হাতে দিলেন। নিখিল তোয়ালেয় মুখের হাতের জল মুছিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অভয়াশঙ্কর তখন আচমন শেষ করিয়া ছেলেকে বলিলেন,—আজকের মতো তোমার ছুটী। এখন শোবে চলো। দশটা বেজে গেছে।

সেনাপতির আদেশ-চালিত সৈনিকের মতো নিখিল নিঃশব্দে পিতার আগে-আগে সিঁড়ির দিকে চলিল। অভয়াশঙ্কর যাইবার সময় সুষমার পানে চোখের এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন যে সে-দৃষ্টি বিষ-মাখানো তীক্ষ্ণ তীরের মতোই সুষমার ঘাড় অবধি বিঁধিয়া তাহাকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। সে কেমন মূর্চ্ছিতের মতো হইল।

জ্ঞান হইল, যখন ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিল—খেয়ে নাও না মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাত তো অল্প হলো না।

সুষমা মৃদু স্বরে বলিল,—আজ আর আমি কিছু খাবো না। তুমি খাবার তুলে রাখো—আমার বড্ড অসুখ করচে!

কথাটা বলিয়া তাহার উত্তরের জন্ম আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা না করিয়া ঝড়ের বেগে সুষমা আসিয়া শয়ন-কক্ষে মেঝের উপর আপনার দেহভার লুটাইয়া দিল। চোখের জল আর বাঁধ মানিল না—সুষমার বুকের সমস্ত বেদনাকে ভাসাইয়া গলাইয়া দুই চোখ বহিয়া অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িল!

৫

সকালে স্বামীকে একান্তে পাইয়া সুষমা বলিল,—আমার একটা কথা রাখবে?

গম্ভীর কণ্ঠে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বলো···

সুষমা বলিল,—আমায় কোথাও পাঠিয়ে দেবে, দিন-কতকের জন্য অন্তত?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় যেতে চাও?

সুষমা বলিল,—যাবার আর জায়গা কোথায়, বলো? এক পিসিমার কাছে···না হয় দেশের বাড়ীতে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হঠাৎ এ খেয়াল?

সুষমা বলিল,—খেয়াল নয়! আমি অনেক ভেবে দেখেছি,—এ ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই।

—কিসের উপায়?

—তোমার শান্তির। আমাকে এনে অবধি তুমি অত্যন্ত অশান্তি পাচ্ছো। নিখিলের জন্যই আমাকে আনা, সেই নিখিলের আমি কিছুই করতে পারি না, করিও না। তুমি বিরক্ত হও···সে বিরক্তির যা-কিছু ঝাঁজ, ঐ ছেলেটার উপর গিয়েই পড়ে। ওর জন্য মায়া হয়, এ কথা বলচি না। কেননা, তা হবার কথা নয়! আর হয়েচে বললে তুমি বিশ্বাসও করবে না! আমি তো ওর মা নই, —তবে ওর উপর এই যে অনর্থক অত্যাচার হয়, এ-পাপের সব দায় আমার ঘাড়েই পড়ে! আর-জন্মে অনেক পাপ করেচি, তার জন্য এ-জন্মে এই তিলে-তিলে পুড়ে মরচি, এ-জন্মে জেনে-শুনে আর পাপ করি কেন!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বুঝেচি, আমার হাতে পড়েচো, এ তোমার মস্ত পাপের ফলে বৈ কি!

সুষমা এ কথার কোনো জবাব দিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—একটা কথা শুধু তুমি বোঝো—আমায় অপরাধী করো না। আমার কি অপরাধ? ভালো ভেবেই আমি এ ব্যবস্থা করেছিলুম। এ ব্যবস্থা করতে আমার বুকে কত বেজেছে, তা তুমি বুঝবে না!··কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তা কি ঘটে সব সময়? তুমি কোনোদিন আমার মন বোঝবার চেষ্টা করলে না তো! যদি করতে, তুমিও সুখী হতে পারতে, আমিও সুখী হতুম!

সুষমা একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, বলিল,—তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও গো, কি তুমি চাও? আমি জ্ঞানত কখনো তোমার মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিনি। তবে আমি মেয়েমানুষ, বুদ্ধি আমার কম, তোমার মতো লেখাপড়াও শিখিনি, এটা তো বোঝো। যদি আমি কোথাও ভুল বুঝে থাকি তো আমার সে ভুল শুধ্‌রে দাও। আমাদের চারিধারে কালো মেঘ জমে আছে—একটা কথার হাওয়ায় যদি সে মেঘ কেটে আকাশ ফরশা হতে পারে, তবে কেন তুমি সে কথা বলছো না? বলো, আমার কোথায় ত্রুটি, কি ত্রুটি হয়েছে, আমি নিশ্চয় তা শুধরে নেবো। চারিদিকের এ ঘোলাটে ভাবে আমার একলার প্রাণই শুধু হাঁফিয়ে ওঠেনি, ছেলেটা যায়, তুমিও কষ্ট পাচ্ছো!

অভয়াশঙ্কর আজ এখন সুষমার এই ত্রুটি দেখাইবার অবসর পাইয়া চারিধার হাতড়াইতে লাগিলেন। একটু পূর্ব্বে যে ত্রুটিগুলা প্রকাণ্ড জাঁতার মতো মনের মধ্যে প্রচণ্ড রবে ঘুরিয়া মনকে পিষিতেছিল, এখন হাতড়াইতে গিয়া কোথায় যে ছায়ার বাষ্পে সেগুলা সরিয়া পলাইয়া যায়—হাতে আর কিছুতেই আঁকড়াইতে

পারেন না! নাগালের মধ্যে মনের কাছে-কাছে যেগুলা পড়িয়া ছিল, সে-গুলাকে কুড়াইয়া লইয়া অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, এ সব অতি তুচ্ছ! সেগুলাকে লইয়া মস্ত-বড় তর্ক করা বা উপদেশ দেওয়া চলে না—উপদেশ দিতে গেলে তাহাদের নগণ্যতা তাহাদের তুচ্ছতা ভাবিয়া হাসি পায়, এগুলার সম্বন্ধে কিছু বলিতে লজ্জা হয়, সঙ্কোচ লাগে!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আচ্ছা, এক সময়ে বলবো'খন।

সুষমা বলিল,—তাই বলো। কিন্তু তার আগে একটা মিনতি ...একটা কথা আমি বলতে চাই শুধু,—শুনবে?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—বলো।

সুষমা বলিল,—নিখিলের সম্বন্ধে আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি? না পারলেও একবার চেষ্টা করে ছাখো। যত-বড় শপথ করতে বলো তুমি, তত বড় শপথ করেই আমি বলতে পারি, আমার কাছে তার কোনো অনিষ্ট তুমি কল্পনাও করো না। আমি তার মা নই, সত্য, সাজা-মা—তবু আমি বল্‌চি, মায়ের যত্ন না করি,—তবু সে আমার স্বামীর ছেলে—একটিমাত্র ছেলে, তার মঙ্গলে আমার স্বামীর মঙ্গল...আমারো মঙ্গল, এটুকু ভেবেও তো তাকে আমি যত্ন করতে পারি!...এইটুকু ভেবেও যদি আমার কথা রাখো!

একটু থমকিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেন, তাকে তো তোমার কাছে আসতে আমি বারণ করি নি।

সুষমা বলিল,—মুখের কথায় বারণ করোনি, সত্য—কিন্তু তার যে-ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে আমার কাছে দু'দণ্ড আসবার তার অবসর কোথায়? আর এই বয়সে পড়ার অত চাপ ওর উপর চাপিয়ো না—একটু হাঁফ ছাড়তে দাও ওকে। আমাকেই ও মা বলে জানে—আমার কাছে দুটো-চারটে আদর-আব্দার করবার

অবসর ওকে দিয়ো...তাতে ওর মন ভালোই থাকবে। এ-বয়সে ছেলেরা মার কোল ঘেঁষেই থাকতে চায় বেশী, তা-থেকে ওকে একেবারে বঞ্চিত করো না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কি জানো, সুষমা, সত্য কথাটাই তবে খুলে বলি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখবার যত চেষ্টা, যে-আয়োজনই আমরা করি না কেন, এ বাঁধন একদিন এমন অলক্ষ্যে আল্‌গা হয়ে যাবে, যে সে-দিন ও-বেচারী আপশোষে একেবারে সারা হয়ে যাবে! পৃথিবীতে সেদিন ও নিজেকে অত্যন্ত প্রবঞ্চিত, অসহায় বলে' মনে করবে, আমাদের দু'জনেরি উপর ওর মন তিক্ত, বিষাক্ত, বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। তাই ওকে তোমার কাছ থেকে একটু-একটু করে সরিয়ে নিচ্ছি, মনকে ও শক্ত করে নিক্,—স্নেহ, মায়া, মমতা···এ-সব কোমল বৃত্তি-গুলো যেন ওর মনের উপর তেমন আধিপত্য করতে না পারে! বুঝলে?

সুষমা বলিল,—এই রকম করে তুমি ওর মনের স্বাভাবিক গতিকে বেঁধে দিতে চাও? ওর নরম মনকে পাথরের মতো শক্ত করে তুলতে চাও? আমি মেয়ে-মানুষ, তোমার মতন অত অবশ্য বুঝি না—কিন্তু এতে ওর মন কত-বড় ঘা খাবে, ভাবো দিকিন্! ছেলেমানুষের ছোট্ট কোমল মনটুকু এত-বড় প্রকাণ্ড অস্বাভাবিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে একবার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে!

তারপর একটু থামিয়া দম্ লইয়া সুষমা আবার বলিল,—একটা কথা বলবো?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বলো···

সুষমা বলিল,—আগে থেকেই তুমি মন্দ দিক্‌টা অত ভাবচো কেন? আমাকে মা বলে জেনেই যদি ও বড় হয়ে ওঠে,—আর

তার জন্ত তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছো, অনেক যুঝেছো, তুমি মনে করোনা যে আমি তা বুঝি না! সে-সব আমি বুঝি, আর বুঝি বলে তোমায় আমি শ্রদ্ধাও করি খুব—এতে আমি খুশীও হই—এ না করে তুমি যদি আমায় নিয়ে আর-সব ভুলতে কি ছাড়তে, তাহলে তাতে আমার ঘৃণা হতো! সব মেয়ে-মানুষেরই তাতে ঘৃণা হয়। আর তোমার এই পরিচয়টুকু জানি বলেই বল্‌চি···আমাকে মা বলে জেনেই যদি ও বড় হয়ে ওঠে, তাতে এমন কি ক্ষতি হবে? আমি তোমায় এটুকু বলতে পারি, আমার দিক থেকে এমন ব্যবহার ও কখনো পাবে না, যাতে করে তিলেকও ওর সন্দেহ হতে পারে, আমি ওর মা নই! তবে কেন মিছে মনে এ-সব কু গড়ে এত দড়ি-দড়া দিয়ে চারধার এঁটে বেঁধে দিচ্ছ? এতে করে ও তোমাকে কতখানি নিষ্ঠুর বলে ভাবচে, বলো দিকি? এখন ও ক্রমে বড় হয়ে উঠচে, চারিধারে যত ছেলেমেয়েকে মা-বাপের কি প্রচুর স্নেহের মধ্যে মানুষ হতে দেখচে—এ-সব থেকে ওর মনকে তুমি আট্‌কে রাখতে পারবে?

বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই জন্তই কারো বাড়ীতে ওর যাওয়া-আসা আমি পছন্দ করি না, বাইরের সঙ্গে মেলামেশার আপত্তি আমার।

সুষমা বলিল,—এত গণ্ডী টেনে ছেলেকে মানুষ করা চলে না। তার চেয়ে ওকে ছেড়ে দাও দিকিনি বাইরের অবাধ স্বাধীনতায়—চারিধারে এই যে প্রাণের মুক্ত হিল্লোল বয়ে চলেছে, এর মধ্যে প্রাণটা মিশিয়ে দিক্!...তার পর ভবিষ্যৎ? সে ভার আমার উপর দাও, দিয়ে ছাখো···

অভয়াশঙ্কর একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—আচ্ছা, ভেবে দেখবো তোমার কথা। তবে ঐ যে বললে, তোমার কাছ থেকে ওকে

সরিয়ে নিচ্ছি, এটা তোমার ভুল! তা আমি নিইনি! আর ঐ অবসর? সেটা তোমরা এরি ফাঁকে করে নিতে পারো যদি, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই—কোনোদিন সে-আপত্তি ছিল বলেও মনে হয় না!

তারপর এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া অভয়াশঙ্কর আবার বলিলেন,—এত কথাই যখন পাড়লে, তখন শোনো,—তুমি সাধারণ মেয়েদের মতো নও, তোমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে···তুমি মিথ্যা অভিমান না করে এ ব্যাপারের সূক্ষ্ম দিকটাও বুঝতে পারবে, তাই বলচি,—তোমার হাতে ওকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে আমার অনিচ্ছা নেই, সেটা আমি চাই-ও—কিন্তু আপাতত এমন হয়েছে, যে যখনই ও-কথা ভাবতে বসি, তখনই কোথা থেকে লীলায় ছল-ছল জল-ভরা দুটি চোখ আমার মনের সামনে জেগে ওঠে! আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে সে যেন বলে,—আমার শেষ চিহ্ন, আমার স্মৃতি,—সব একেবারে লোপ করে দেবে?···সে-দিকটার সম্বন্ধে কি করি, বলো তো, সুষমা?

সুষমা এ কথার জবাব দিতে পারিল না। সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল! তাহারই জন্য একজনের স্মৃতি একেবারে পৃথিবীর পট হইতে ধুইয়া মুছিয়া তবে সেখানে আসন বিছানো? সুষমার মন হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, না, না, এত বড় স্বার্থপর সে হইতে পারে না! হইতে চায় নাই কখনো! তবে? তবে? কূল-হারা অসীম কোন্ অকূলে সুষমার সর্ব্ব-হারা মন দারুণ নৈরাশ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু আশ্রয় খুঁজিয়া ভূতের মতো অন্ধভাবে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমি একেবারে অমানুষ নই, সুষমা। সম্প্রতি আমার ব্যবহার দেখে তুমি হয়তো আমাকে রাক্ষস মনে করছো! কিন্তু সত্যই আমি রাক্ষস নই। কি

করবো, বলো? আমি যে কী বিষম বিপদে পড়েচি! কোনো দিকে সামঞ্জস্য আনতে পারচি না। নিজের সঙ্গে আমি অহরহ যুদ্ধ করছি। তোমার কাছে মুখ দেখাতে সঙ্কোচ বোধ করি, তাই হামেশা তোমার কাছে আসতে পারি না—তোমায় তাচ্ছল্য করে আসি না, তা নয়! তোমায় দেখলে আমার কি মনে হয়, জানো? তোমার জীবনটাকে আমার সঙ্গে মিশিয়ে ধরে আমি তাকে একেবারে দুর্বহ ব্যর্থ করে তুলেছি!...জীর্ণ গাছে নবীন মঞ্জরী গজায় না! গজাতে পারে না!... এ কম আপশোষ! অথচ আমি চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি করিনি!...তবু একটা জিনিষ মনে রেখো, তুমি যে কত-বড় ত্যাগী, কত-উঁচুতে তুমি আছো, আমি তা বুঝি। এই স্বার্থের দুনিয়ায় তুমি নিজের পানে একবারো না চেয়ে কি-ভাবে আত্মবলি দেছো, আমি তা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝি, আর সে-জন্য তোমায় আমি কী শ্রদ্ধা করি, তা বল্‌লে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না!

কৃতজ্ঞতায় সুষমার দুই চোখে জল ছাপিয়া আসিল। মাথা নত করিয়া ভূমির দিকে সে চাহিয়া রহিল। চোখের জলে দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

অভয়াশঙ্কর ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পায়ের ধ্বনি সুষমার কাণে যেন কোন্ সুদূর দেশের পার হইতে মুক্তির একটু আভাস আনিয়া দিল! সে একেবারে পাগলের মতো ভূমে বসিয়া পড়িল, বসিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিল। তাহার প্রাণ-মন ডুকরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—ওগো ভুল গো, তোমার ভুল! আমি ত্যাগী নই, ত্যাগী নই, আমার এ মন স্বার্থের বিষে ভরিয়া আছে! শ্রদ্ধা আমি চাই না গো তোমার, শ্রদ্ধা চাই না, শুধু ভালোবাসা! একটু দরদ! একটু মমতা! ভালোবাসার একটু অঞ্জন চোখে মাখিয়া আমার পানে চাহিয়ো,...আমি শুধু একটু মমতার দৃষ্টির প্রত্যাশী!

৬

তার পর কটা দিন মন্দ কাটিল না। নিখিল হাঁফ ফেলিবার একটু অবসর পাইল, সুষমাও তাহার পিপাসাতুর মনকে তৃপ্তির সুধা পান করাইয়া বাঁচিল।

দু-তিন মাস পরের কথা বলিতেছি।

সেদিন দুপুরবেলায় নিখিল পড়িবার ঘরে বসিয়াছিল—মাষ্টার মহাশয় খাতায় রুল টানিয়া দিতেছেন; রুল টানা হইলে তাহাকে হাতের লেখা লিখিতে হইবে। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আজ চারখানা হাতের লেখা লিখতে হবে নিখিল, বুঝলে? ইংরিজি টানা একটা, বড় এ-বি, ছোট এ-বি আর বাংলা একটা। বুঝলে? তার পর হাতের লেখা হলে অঙ্ক কষবে। আজ পড়া নেই, সকাল-সকাল ছুটি পাবে।

নিখিল বলিল,—কেন মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—আজ চারটের পর বাড়ীর সামনে মাঠে বাঁশ-বাজি হবে, দেখবে।

নিখিল বলিল,—বাঁশ-বাজি কি মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—সে তখন দেখো। একটা বাঁশ নিয়ে তার উপর একজন মানুষ চড়ে দুলবে, খেলা দেখাবে, অথচ বাঁশটা মাটীতে পোঁতা থাকবে না।

নিখিল বিস্মিতভাবে কহিল,—পড়ে যাবে না?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—না।

নিখিল অবাক হইয়া ভাবিতে বসিল। কল্পনা তাহার হাত ধরিয়া এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া-মঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তুলিল! একটা বাঁশ লইয়া না

পুঁতিয়া সেটাকে মাটীতে খাড়া রাখিয়া তাহার উপর চড়িয়া নানারকমের কশরৎ দেখানো! বাঁশ-বাজির নামও সে কখনো কাণে শোনে নাই। তাই কল্পনার সাহায্যে সে ব্যাপারটার স্পষ্ট ধারণা সে কিছুতেই করিতে পারিল না। তবু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখের সাম্‌নে বাহিরের জগৎ মস্ত একটা বাঁশের ডগায় দোল খাইতে লাগিল! কল্পনা তাহাতে আর কোনো রকম রং ফলাইতে না পারিয়া সেই দোদুল জগৎটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল! এমন সময় হঠাৎ বাহিরে কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল—এ-ই যে, এই বাড়ী...না বাবা?

এ কি, এ যে পরিচিত স্বর! সোনার না?

নিখিল উঠিয়া অতিশয় সন্তর্পিত পদক্ষেপে মাষ্টার মহাশয়ের অলক্ষ্যে জানলার পিছনে আসিয়া উঁকি দিয়া পথের পানে চাহিল। সত্যই, পথের ধারে দাঁড়াইয়া ঐ যে সোনা আর সোনার বাবা! সোনা মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার বাবার হাত ধরিয়া তাহাদেরি এই বাড়ীটার পানে চাহিয়া আছে। কাহাকে খুঁজিতেছে? কি চায়? নিশ্চয় নিখিলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তাই তো, নিখিল এখন কি করে? দেখা দিবে? আহা, কতদূর হইতে আসিয়াছে! কিন্তু বাবা যদি দেখিতে পায়? সোনার সঙ্গে তাহাকে কথা কহিতে দেখিলে বাবা সোনাকে আর সোনার বাবাকে তীব্র তিরস্কার করিবে! নিজের মার সে সহ্য করিতে পারে, তিরস্কারে কিছু আসিয়া যায় না—কিন্তু বেচারীরা কেন অনর্থক বিনাদোষে বকুনি খাইয়া মরিবে? শিমুল-তলায় সেই সাঁওতালী ছেলে-মেয়েদের দুর্দ্দশার কথা তাহার মনে পড়িল। কি লাঞ্ছনাই না তাহারা ভোগ করিয়াছিল! অথচ তাহারা কোনো দোষে দোষী ছিল না!

নিখিলের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। এই গ্রামখানির মধ্যে ঐ একটি মাত্র বাড়ীর লোকজনদেরই সে শুধু জানে—তাহারা নিখিলের কি সমাদর না করিয়াছিল! আর সে এমনি করিয়া একটা দেওয়ালের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া নীরবে তাহাদের বিদায় দিবে?

চকিতে একটা কথা মনে জাগিল। যদি উহারা বাড়ীর মধ্যে ঢোকে? ঢুকিয়া নিখিলের সঙ্গে দেখা করিতে চায়? কথাটা মনে হইতেই ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! উহারা তো জানে না, তাহার বাবার মেজাজ!

নিখিল ধীরে ধীরে পা টিপিয়া বাহিরে গেল। যাইবার সময় অত্যন্ত সতর্কভাবে মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিয়া গেল, মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন কিনা?...না।

মাষ্টার মহাশয় নিবিষ্ট মনে তখনো খাতায় রুল টানিতেছেন,—একটা, দুটা, পাঁচটা, সাতটা পাতায় রুল টানিয়া চলিয়াছেন। খাতাখানা নূতন বাঁধা হইয়াছে—মাষ্টার মহাশয় সব পাতাতে রুল টানিয়া দিবেন, এখনি। তবে আর কি!

নিখিল সতর্ক ভঙ্গীতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ যে সোনা দূরে দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে কি বলিতেছে।

চারিধারে চাহিয়া খুব সতর্ক মৃদু স্বরে নিখিল ডাকিল—সোনা···

সোনা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—রাজপুত্তুর! ঐ যে!

বনমালীর হাত ধরিয়া টানিয়া সোনা বলিল,—ঐ যে বাবা, রাজপুত্তুর। বলিয়াই সে ছুটিয়া নিখিলের কাছে আসিল।

নিখিলের বুক তখন ভয়ে কাঁপিতেছে! সে বলিল,—কোথায় যাচ্ছো তোমরা, সোনা?

হাসিয়া সোনা বলিল,—আমি তোমাদের বাড়ী দেখতে এসেচি ভাই। বাবাকে কত বললুম, বাবা কিছুতে আসছিল না। শেষে আমি খুব

কাঁদতে লাগলুম। মা তখন বাবাকে বললে,—যাওনা গা নিয়ে! হুঁ-হুঁ··· কেমন এসেছি!

শুনিয়া আনন্দে মন ভরিয়া উঠিলেও নিখিল ভয়ে সারা হইয়া গেল। সোনা তাহার কাছে আসিয়াছে! তাহার সঙ্গে খেলা করিবে বলিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে? কি করিয়া সে এখন খেলা করে? তাহার যে হাত-পা বাঁধা—এখন লেখা-পড়ার ঘণ্টা—খেলিবার অবসর কৈ? তা ছাড়া বাবা বাড়ীতে আছে! সোনার সঙ্গে এ-বাড়ীতে খেলা করা—অসম্ভব ব্যাপার।

সোনা বলিল,—চলো না ভাই, তোমার মাকে দেখে আসি। আমার মাকে দেখেচো তো! তোমার মাকে ভাই, আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছা করচে। আর তোমার বাবা—রাজা বাবু...তাঁকেও দেখবো।

সর্ব্বনাশ! সোনা বলে কি! তীব্র নৈরাশ্য নিখিলের বুকে পাহাড়ের মতো ভারী হইয়া জমিয়া উঠিল। চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। সোনার মনের এত-বড় আশা কি করিয়া দুই হাতে সে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়! কিন্তু সে একেবারে নিরুপায়!

ভিতর হইতে মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন,—নিখিল···

নিখিল ভড়কিয়া গিয়া বলিল,—এখন আমি যাই ভাই, সোনা। মাষ্টার মশায় ডাকচেন—আমায় এখন এখনি হাতের লেখা লিখতে হবে কি না। তুমি ভাই, এখন বাড়ী যাও। ওবেলায় আমি তোমাদের ওখানে যাবো'খন!

—তোমার মাকে দেখাবে না, ভাই? সোনার স্বর অভিমানে ভরিয়া উঠিল।

অত্যন্ত আদরে সোনার ছোট হাত দুখানি ধরিয়া নিখিল বলিল,—এখন নয় ভাই, আর-একদিন দেখাবো।...আমি এখন আসি, সোনা, হাতের লেখা লিখতে হবে আমাকে। তুমি বাড়ী যাও।

কথাটা বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে নিখিল ছুটিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চলিয়া গেল। সোনা সেইখানে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমানুষ...অত-শত না বুঝিলেও, মনে হইতে লাগিল, বুকের মধ্যে কি একটা যেন ঠেলিয়া উঠিয়া সোনার দম বন্ধ করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে!

সোনা এক-পা নড়িল না দেখিয়া বনমালী বলিল,—আয় সোনা, বাড়ী যাবি না?

প্রায়-কাঁদিয়াই সোনা জবাব দিল,—না বাবা, একটু থাকি।

বনমালী বলিল,—কি হবে মা থেকে? শুনলি তো, তোর রাজ-পুত্তুর এখন লেখাপড়া করছেন। বড় লোকের ছেলে—ভদ্দর ঘর··· লেখাপড়া না করলে চলবে কেন মা?

সোনা কোনো জবাব না দিয়া হতাশ নয়নে গৃহের প্রকাণ্ড দ্বারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ঐ দ্বার-পথে নিখিল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

বনমালী বলিল,—আয় মা সোনা, বাড়ী যাই। তোর রাজপুত্তর বিকেলে যাবেন, বললেন তো।

অভিমান-গাঢ় স্বরে সোনা বলিল—না।

বনমালী বলিল,—এখন লেখাপড়ার সময় কি খেলা করে?

তবু সোনার সেই এক উত্তর,—না।

পথের ধারে একটা ঢিপি ছিল, বনমালী তখন তাহার উপর বসিল। আর সোনা? কি অধীর দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড বাড়ীটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

কতক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পর দামু বাহিরে কোথায় যাইতেছিল, হঠাৎ বনমালীকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—তোমাকে কোথায় দেখেছি না? কাকে খুঁজচো?

বনমালী বলিল,—আমার নাম বনমালী।...সেই যে তোমাদের খোকাবাবু একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন...

দামু বলিল,—হ্যাঁ, মনে পড়েছে! তুমি দাদাবাবুকে নিয়ে আসছিলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হলো...হুঁ...হুঁ!...তা এদিকে আজ কোথায় এসেছিলে?

উঠিয়া একটা আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া বনমালী বলিল,—এইখানেই এসেছিলুম। মেয়েটা ক'দিন বায়না নিয়েছে, বাবুদের বাড়ী দেখবে বলে। আজ এমন ঝুলোঝুলি বাধিয়ে দিলে যে না এনে আর পারলুম না!

দামু বলিল—দাদাবাবু জানে?

বনমালী বলিল—হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন। এসেই চলে গেলেন, —বলে গেলেন, এখন লেখা-পড়া করছেন কি না, তাই চলে গেলেন।

দামু বলিল,—হ্যাঁ, এখন তিনি লেখাপড়া করছেন। এখন বেরুতে বাবুর মানা আছে।

বাধা দিয়া বনমালী বলিল,—তাই বোঝাচ্ছিলুম ওকে যে এখন চ, বিকেলে খোকাবাবু আমাদের ওদিকে যাবেন বললেন তো, তা মেয়েটা কিছুতে শুনবে না,—বলে, রাণীমাকে দেখবে। খোকাবাবুকে ও রাজপুত্তুর বলে জানে বড্ড ভালোবাসে।

হাসিয়া দামু বলিল,—বেশ মেয়েটি!...তুমি রাণী-মাকে দেখবে? আচ্ছা, এসো। আমার ঘরে এসে তুমিও একটু তামুক খেয়ে যাও, আমি ওকে ওর রাণী-মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বনমালী বলিল,—চ'রে সোনা, চ'—তাহলে তোর রাণী-মাকে দেখেই যাবি চ'।

বনমালী ও সোনাকে লইয়া দামু নিজের ঘরে আসিল। এক ছিলিম

তামাক সাজিয়া বনমালার হাতে হুকা দিয়া সে সোনাকে বলিল,—এসো খুকী আমার সঙ্গে। তোমার রাণীমার কাছে তোমায় নিয়ে যাই, রাণীমাকে দেখবে, এসো।

প্রসন্ন চিত্তে সোনা বলিল,—রাজপুত্তুর?

হাসি-মুখে দামু বলিল,—রাজপুত্তুর এখন লেখাপড়া করছেন, মা।

সোনাকে লইয়া দামু অন্দরে গেল। সুষমা তখন রান্নাঘরের দালানে খাইতে বসিয়াছে। সোনাকে আনিয়া অদূরে দালানের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দামু বলিল,—ঐ তোমার রাণী-মা। দেখেচো?

দামুর সঙ্গে অপরিচিতা এক বালিকাকে দেখিয়া সুষমা বলিল,—এ মেয়েটি কে, দামু?

দামু এ বাড়ীর বহু-পুরাতন ভৃত্য। তাই তাহার সম্মুখে সুষমার কোনোদিনই সঙ্কোচ ছিল না। সুষমার দিকে একটু আগাইয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া দামু বলিল,—সেই যে ঝড়ের রাত্রে সে-মাসে দাদা-বাবুর বাড়ী আসতে খুব রাত হয়ে গিয়েছিল...দাদাবাবু এদের বাড়ীতেই ছিলেন তখন। এই মেয়েটি আজ এসেচে রাণীমাকে দেখতে। কথাটা বলিয়া দামু মৃদু হাসিল,—পরে সোনার দিকে চাহিয়া হাসি-মুখে বলিল,—এই তোমার রাণী-মা, খুকী। দেখেচো?

সোনা অবাক হইয়া গেল। এই রাণী-মা? সাদা-সিধা এক-খানি সাদা কাপড় পরা! তবে রংটা খুব ফর্সা, আর গায়ে সোনার কখানি মাত্র গহনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! এই রাণী-মা? সে ভাবিয়াছিল, দেখিবে, রাণীমার মাথায় প্রকাণ্ড মটুক জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, পরণে বড় জরির ফুল-বসানো রাঙা কাপড়, আর রাণী-মা সিংহাসন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, আশে-পাশে কত দাস-দাসী...চামর ঢুলাইতেছে!

তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! রাণী-মা ঐ মাটীর উপর একখানা এমনি আসন পাতিয়া তাহাতে বসিয়া তাহাদেরি মতো ডাল-ভাত খাইতেছেন!

বিস্ময়ে প্রথমে তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

সুষমা দামুকে বলিল,—ওকে ঐখানে একখানা আসন-টাসন কিছু পেতে দাও, দামু...বসুক।

সুষমার কথা-মত দামু আসন পাতিয়া সোনাকে তাহাতে বসিতে বলিল। সোনা কুণ্ডলী পাকাইয়া আঁচলের ডগাটা মুখের মধ্যে পুরিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল।

দামু বলিল,—বসো খুকী।

খুকীর সে সঙ্কুচিত অপ্রতিভ ভাব তবু কাটিতে চায় না!

সুষমা যখন বলিল,—আসনে বসো খুকী—তখন তাহার শিশু-চিত্তের অত্যন্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত ভাব লইয়াই সে আসনে বসিয়া পড়িল, একাগ্র দৃষ্টিটুকু কিন্তু রাণীমার উপর ন্যস্ত।

দামু বলিল,—তুমি তাহলে বসো, খুকী। আমি বাইরে তোমার বাবার কাছে যাই।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সোনা সম্মতি জানাইল।

সুষমা আহার শেষ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া সোনাকে লইয়া নিজের ঘরে গেল। অভয়াশঙ্কর তখন ঘরে বসিয়া কি-সব কাগজ-পত্র দেখিতেছেন। সে-ঘরে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া সোনাকে লইয়া সুষমা বসিবার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া সোনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি, খুকী?

সোনা কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—আমার নাম স্বর্ণময়ী। মা-বাবা কিন্তু আমাকে সোনা বলে ডাকে।

তারপর সুষমা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল,—তাহারা কোথায়

থাকে, সে বাড়ী এখান হইতে কত দূরে? বাবা কি কাজ করে—মা সারাদিন কি করে? সোনা দুরন্তপনা করে কি না—এমনি করিয়া সোনাদের সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটী খবর সংগ্রহ করিয়া দুই দণ্ডেই সোনাকে সুষমা আপনার করিয়া ফেলিল। তারপর নিখিলের সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। নিখিল মাঝে-মাঝে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়, সোনার মা নিখিলকে কত জিনিষ খাইতে দেয়, মা তাহাদের গল্প বলে, নিখিল সোনার সঙ্গে কেমন খেলা করে। নিখিলের কথা বলিবার সময় কি গভীর শ্রদ্ধায়, অনুরাগে, কি বিপুল প্রীতি-গর্ব্বে বালিকার ছোট বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা সুষমার নজর এড়াইল না। সুষমা বুঝিল।

বুঝিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—নিখিলের সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়েছে? তোমার রাজপুত্তুর?

সোনা বলিল,—হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

সোনা বলিল,—রাজপুত্তুর চলে গেল। আমাকে বললে, তুমি এখন বাড়ী যাও! বলেই দৌড়ে চলে গেল।

সুষমা ইহার অর্থ বুঝিল, বলিল—এখন সে লেখাপড়া করচে কি না! আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সুষমা তখন একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল,—নিখিলকে একবার ডেকে আন্‌তো এখানে—বলবি, মা তোমাকে একবার ডাকচে, আবার এখনি চলে যাবে'খন।

দাসী চলিয়া গেল। সুষমা তখন কাচের আলমারি খুলিয়া বড় একটা পুতুল বাহির করিয়া সোনার হাতে দিল। সোনা পুতুল পাইয়া আনন্দে সেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

সুষমা বলিল,—পুতুল পছন্দ হয়েচে?

ঘাড় নাড়িয়া এক-মুখ হাসিয়া সোনা বলিল,—হুঁ।

৭

নিখিল কলের পুতুলের মতো বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল; মনটা বাহিরে অবাধ মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলার মাঝখানে সতর্ক গতিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। গাছের ডালে-ডালে পাখীর কলরব, মাঝে মাঝে পথে অজানা পথিকের কণ্ঠ হইতে দু-চারিটা কথার টুক্‌রা ছিটকাইয়া আসিতেছে—তাহাতে মুক্তির কি হাওয়াই না বহিয়া আসে! সকলের উপর সোনার দু-চোখের আকুল অধীর দৃষ্টিটুকু! নিজের চারিধারে নিয়মের এই কঠিন বাঁধন—সেগুলা নিখিলের দেহে-মনে আজ অত্যন্ত চাপিয়া ধরিতেছিল! অথচ এ-বাঁধন কাটিবার কোনো উপায় নাই! হায়রে, ইহার চেয়ে সে যদি পথের ঐ সব লোকদের একজন হইত! তাহার ছোট মন এক অসহ্য পীড়ার ভারে যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছে! এমন সময় মার ডাক আসিয়া পৌছিল। নিখিল লেখা ছাড়িয়া মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—যাও, মা কি বলছেন, শুনে এসো।

এসো! যে-বাঁধন মুহূর্ত্তের জন্য একটু আলগা হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার কে যেন অলক্ষ্যে চাপিয়া আঁটিয়া ধরিল। মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন,—যাও, শুনে এসো নিখিল, মা কি বলছেন।

নিখিল উঠিয়া দম-খাওয়া পুতুলের মতো সতর্ক গতিতে অন্দরের দিকে চলিল।

মার ঘরের কাছে আসিয়া সে শুনিল, ঘরে মা কার সঙ্গে কথা কহিতেছে। নিখিল ডাকিল,—মা…

ভিতর হইতে সুষমা বলিল,—এদিকে এসো নিখিল।

নিখিল ঘরে ঢুকিল। সেখানে গিয়া সোনাকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক অজানা আশঙ্কায় তাহার সারা অঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সোনা এখানে? সর্ব্বনাশ! বাবা যদি দেখিয়া ফেলে? নিজের জন্ম ভয় তত নয়, যত ভয় এই বেচারী সোনার জন্ম! নিখিলের বাবাকে সে জানে না—এখনি এমন কঠিন রূঢ় কথা… সে আঘাতে বেচারীর ঠোঁটের ঐ অম্লান শুভ্র হাসিটুকু কোথায় উবিয়া যাইবে!

নিখিলকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুষমা বলিল,—এ মেয়েটি কে, বলো তো নিখিল?

ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি আঁকিয়া নিখিল বলিল,—সোনা।

সুষমা বলিল,—বেশ মেয়েটি, না? তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছিল—তা তুমি এখন পড়চো কি না, তাই আমার কাছে এসেচে। তোমার পড়া হলে এর সঙ্গে খেলা করবে—কেমন?

সোনার সঙ্গে খেলা করিবে—এই বাড়ীর মধ্যে? সর্ব্বনাশ! বাবা তাহা হইলে দুজনের কাহাকেও আর আস্ত রাখিবে না! সে বলিল,—না মা, আমি এখন খেলতে পারবো না। আমায় হাতের লেখা লিখতে হবে, তার পর অঙ্ক কষা আছে, পড়া আছে। তারপর আবার চারটের পর বাঁশবাজি হবে…

সোনার ডাগর চোখদুটি নিখিলের এ-কথায় নিব নিব-দীপের মতো মলিন হইয়া গেল, চোখ ছলছলিয়া উঠিল। নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল। বেচারী! বেচারী সোনা! আহা! তার বাবা সোনার বাবা যে সোনাকে দেখিয়া নিখিলকে খেলার ছুটি দিয়া দিবে?

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, ও এখন থাকুক—তারপর বাঁশবাজি দেখে বাড়ী যাবে'খন। আমি ততক্ষণ সোনার সঙ্গে গল্প করি, ওর চুল বেঁধে দি—বলিয়া সুষমা সোনার ঝুঁটি-বাঁধা চুলগুলা খুলিতে লাগিল।

সোনা কাঠের পুতুলের মতো স্থিরভাবে নিখিলকে লক্ষ্য করিতেছে —আর নিখিল উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন্ সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া পিতার পায়ের শব্দ কিম্বা কণ্ঠের বজ্র-ধ্বনি জাগিয়া ওঠে! তার বুকের মধ্যে কে যেন হামান্‌দিস্তায় কি কুটিতেছে—বুকখানা ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছে!

সুষমা তখন সোনাকে কৌচের উপর নিজের পাশে বসাইয়া তাহার ছোট কোঁকড়ানো চুলগুলি বিনাইতে সুরু করিল দেখিয়া নিখিল বলিল,—সোনার কাঁচের পুতুল নেই মা, শুধু মাটীর পুতুল। ওকে দুটো কাঁচের পুতুল দিয়ো।

সোনা এ কথায় খুশী হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল,—তোমার মা ভাই, আমাকে পুতুল দিয়েছেন। এই ত্থাখো, চমৎকার পুতুল। আমি ভাই এটিকে তুলে রেখে দেবো, এ নিয়ে খেলা করবো না··· যদি ভেঙ্গে যায়! এ-রকম খোকা-পুতুল আমি কক্‌খনো দেখি নি। পুঁটি খেঁদি···তারাও দেখেনি। সত্যি, আমরা গরীব মানুষ— এ-সব পুতুলের অনেক দাম, কোথায় পাবো? বাবা বলেচে ভাই, এবার যখন কলকাতায় যাবে তখন আমার জন্য ভালো একটি কাঁচের পুতুল কিনে আনবে। কাঁচের পুতুলের কেমন নীল-নীল চোখ···না?

এক-নিশ্বাসে সে এতগুলা কথা বলিয়া গেল! বলিয়া সুষমার দেওয়া পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া আদর করিতে লাগিল।

নিখিল বলিল,—দিয়ো মা, সোনাকে আর দুটো কাঁচের পুতুল। কি হবে? আমি তো পুতুল নিয়ে খেলি না—শুধু আলমারিতে তোলা থাকে। তার চেয়ে—এই অবধি বলিয়া নিখিল হঠাৎ থামিয়া গেল; তাহার কথা শেষ হইল না! ওদিকে সেই মুহূর্ত্তে পিছনে পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল,—কি হচ্ছে তোমাদের?

ভয়ে নিখিলের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। তার সব কথা এইবার প্রকাশ হইয়া পড়িবে! বাহিরে কাহারো বাড়ী যাওয়ায় পিতার নিষেধ, কাহারো সঙ্গে কথা কওয়া বা মেলা-মেশা করা দূরের কথা! আর এই সোনা—নিখিল ভয়ে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তিটুকুও তাহার একেবারে যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া গেছে!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এ মেয়েটি কে?

সুষমা বলিল,—এখানকার একজনদের মেয়ে—আমাদের বাড়ী-ঘর দেখতে এসেচে।

—তার মানে?

সুষমা বুঝিল, স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি খুব বিরক্ত হইবেন,—আর সে বিরক্তির যা-কিছু ঝাঁজ এখনই গিয়া পড়িবে বেচারা নিখিলের উপর! স্বামীর দিকে লক্ষ্য করিয়া সুষমা দেখিল, স্বামীর মুখে-চোখে ঈষৎ অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িয়াছে। অথচ কথাটা একেবারে লুকাইয়া রাখা চলে না! সুষমা তখন ব্যাপারটাকে যতখানি সম্ভব হাল্‌কা করিয়া লইয়া বলিল,—সেদিন বৃষ্টির সময় নিখিলকে যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল,—এটি তাদের মেয়ে।

ভ্রূ চোখ বিস্ফারিত করিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হুঁ, নিখিলের বন্ধু তাহলে! কথাটা বলিয়া অভয়াশঙ্কর জোরে খানিক হাসিলেন, হাসিয়া একবার সোনার পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিখিলের পানে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

পিতার সে হাসির শব্দে নিখিলের মন শীতার্ত্তের মতো হি-হি করিয়া উঠিল। তার পর নিজেকে সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই পিতার স্বর কাণে বাজিল—হাতের লেখা সব হয়েচে, নিখিল?

নিখিল ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিল, বলিল,—না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যাও, লেখা শেষ করোগে। তারপর আমি আজ পড়া নেবো। বিদ্যা কেমন এগুচ্ছে, দেখতে চাই। যাও...

ঝড়ের মুখে কুটার মতোই নিখিল সরিয়া গেল।

নিখিল চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর সোনাকে বলিলেন,—কার সঙ্গে তুমি এসেচো?

মানুষের এমন রুদ্র কঠোর মূর্ত্তি...সোনা তাহার জীবনে কখনো দেখে নাই! এখানে এখন যেটুকু দেখিল, তাহাতে ভয়ে সে যেন কাঠ হইয়া গেল!

সভয়ে সে একটু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—বাবার সঙ্গে। এবং কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার বাবা কোথায়?

—নীচেয়।

সুষমা বলিল,—তুমি যাও। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর বাপের কাছে।

দাসীকে ডাকিয়া সোনাকে তাহার সঙ্গে নীচে পাঠাইয়া সুষমা স্বামীর পানে চাহিল, স্বামীর দু চোখে বিরক্তির কি কঠিন দৃষ্টি! নিজেকে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অপমানিত বোধ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা...

সুষমা থমকিয়া দাঁড়াইল। —কি?

—কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বলো।

—তুমি বসো। একটু স্থির হয়ে সে-কথা শুনতে হবে।

৮

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার রুক্ষ মেজাজ বলে তুমি অনুযোগ করো…কিন্তু এ কি ঠিক হচ্ছিল?

বিস্ময়ের স্বরে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্‌টা ঠিক হচ্ছিল না?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমি জানো, নিখিলের সঙ্গে বাইরের কোনো ছেলে-মেয়ের মেলা-মেশা আমি পছন্দ করি না! এ জেনেও তুমি এ-সবের প্রশ্রয় দিচ্ছ!

বাণ-বিদ্ধের মতো ব্যথিত হইয়া সুষমা বলিল,—এই ছোট্ট সরল নির্দ্দোষ মেয়েটি কি আগ্রহ নিয়ে যে নিখিলকে একবার দেখতে এসেছে! নিখিলের বাড়ী-ঘর, তার মা-বাপ কেমন, তাই দেখতে! তার এ সরল আনন্দটুকু ভেঙ্গে চুরমায় করে দেবো, এমন কড়া জান আমার নয়!

—কড়া জানের কথা হচ্ছে না, সুষমা। একটা নিয়ম মেনে যদি চলতে হয় তো তার জন্য সময়-সময় কঠিন হতেই হবে। এবং ছেলের সম্বন্ধে যখন এ নিয়ম, তখন তা রক্ষা করা আমাদের দুজনেরই উচিত নয় কি?

সুষমা বলিল,—এইখানে আমাদের সাম্‌নে ও যদি নিখিলের পানে দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখে, কিম্বা, তার সঙ্গে দুটো কথা কয়, তাতে কোনোদিক্ থেকে নিখিলের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। তোমারো তাতে মান-হানি ঘটতে পারে না!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই তো তুমি বড় বড় কথা এনে ফেল্‌ছো! এগুলো রাগের কথা, সুষমা। তুমি স্থির হয়ে সব বোঝো, বুঝে কথা বলো।

সুষমা বলিল,—রাগ! আমি রাগ করবো! কার উপর রাগ করবো, শুনি? তাও আবার নিখিলের বিষয় নিয়ে…যার উপর আমার কোনো অধিকার নেই যখন!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এ কথা বল্‌চো কেন…আবার? আমি তো নিখিলকে তোমার হাতেই স'পে দিয়েচি, সুষমা!

সুষমা একটু বিরক্তির সুরে বলিল,—মুখে দিয়েচো, স্বীকার করি। অন্তরের সঙ্গে দিতে পারতে যদি, তাহলে এ গোয়েন্দাগিরিটুকুও ছাড়তে!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—রাগ-অভিমান না করে স্থির হয়ে শোনো, বোঝো সব। ছেলেকে আমি কি-ভাবে মানুষ করতে চাই, তুমি জানো, সে বিষয়ে তোমার সাহায্যও আমি চেয়েচি। তাতে সাহায্য না করে তার উল্টো পথে চলা কি বিশ্বাস-ভঙ্গ নয়?

—বিশ্বাস! সুষমা বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর আমায় বিশ্বাস করো না! আমি কি কিছু বুঝি না, ভাবো? তুমি বাইরে কোনোমতে একটা ঠাট বজায় রাখবার জন্য নিখিলের ভার আমার হাতে দিয়েচো বটে, কিন্তু স্পষ্ট বলছি, এ মুখের ভারের কাজ নয়। মনে-মনে প্রতি মুহূর্ত্তই তোমার দারুণ সন্দেহ! পাছে কি করে ফেলি!…এ না করে আমাকে যখন সেই ওর মার আসনই দেছো, তখন অন্তরের সঙ্গে ওর সব ভার আমার হাতে ছেড়ে দাও দিকি! তা যদি না পারো তো এ লোক-দেখানো ভার দেওয়ায় কোনো ফল হবে না। ছেলেটা মানুষ, মাটীর পুতুল নয়—সত্য!…এই যে ছেলেটা মুখ চূণ করে চলে গেল, আমিই ওকে পাঁচ মিনিটের জন্য এখানে ডাকিয়ে এনেছিলুম, তাই এসেছিল—তুমি যে এই চোরের মতো তাড়িয়ে দিলে, এতে ও ভাবলো কি, বলো দিকি? যেন কত-বড় অপরাধ সে করেছে! এতে ও ভাববে না যে ওর মা একটা মাটীর পুতুল মাত্র, তার কথার

এখানে কোনো দাম নেই? এ-মার কথা শুনে কোনো কাজ করতে গেলে আর-একদিক থেকে বিষম তাড়া খেতে হবে? তার মার কথার যা দাম, একটা দাসী-বাঁদীর কথারও সেই দাম?

ক্ষোভে উত্তেজনায় সুষমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, চোখে জল আসিল। অভয়াশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সুষমা আবার বলিল,—আর এই মেয়েটি—কি অপরাধ করেছে? ও বেচারী কি ভাবলো! সাধে বলি, এ বাড়ীতে একটা দাসী-বাঁদীর যে অধিকার আছে, আমার তা নেই! আমায় পাঠিয়ে দাও, সত্যই কোথাও পাঠিয়ে দাও। এ-বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ায় প্রাণে যেন আমার গুমট্ ধরে উঠেছে, বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় দু'দিন ঘুরে আমি দম নিয়ে আসি। সত্য বল্‌চি, আমার বাইরেটা তুমি এমন চক্‌চকে করে সাজিয়ে রেখেচো যে লোকে দেখলে আমার সৌভাগ্যে হয়তো হিংসা করবে,—কিন্তু ভেতরটা যে কি-রকম পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছ! সুষমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অভয়াশঙ্কর তবু নিরুত্তর রহিলেন, এ-কথার কোনো জবাব দিলেন না।

সুষমা তখন সে-ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৯

উৎসবের জন্য রঙীন্ ফুলে-পাতায় সজ্জিত মণ্ডপ অকস্মাৎ ঝড়ে ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে সকলের প্রাণ যেমন করুণ হাহাকারে ভরিয়া ওঠে, পিতার আকস্মিক আবির্ভাবে ও তিরস্কারে নিখিলের মনের মধ্যে আনন্দের যে উৎসব-মণ্ডপটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেটিও তেমনি ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া সেখানে আর্ত্তনাদ হাহাকার জমিয়া উঠিল! সোনা

কি মনে করিল? পিতাকে এতটুকু সম্ভ্রমের আসন, স্নেহের আসন পাতিয়া সোনার সামনে কখনো নিখিল আর বসাইতে পারিবে না—সোনার মন নিখিলের উপরও না জানি ইহাতে কতখানি তিক্ত হইয়া উঠিল! বেচারী সোনা! সদরে সে নিজেও তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিল না! কেন কহিল না, সোনা কি বুঝিবে? মার কাছে একটু আদর পাইয়া স্নেহ পাইয়া ব্যথা-হত মনকে সে যখন সুস্থ করিয়া লইতেছে, ঠিক সেই সময়…

নিখিলের বুকের মধ্যটা দারুণ ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—ও কি নিখিল, লেখা যে লাইনের বাইরে চলে যাচ্ছে। মন দিযে লিখচো না, বুঝি?

নিখিল লক্ষ্য করিযা দেখে, সত্য, লেখা লাইনের উপর উঠিয়া গিয়াছে। সে আবার লেখার দিকে মন দিল।

নিঝুম দুপুরে বাহিরে গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু করুণ গান ধরিয়াছে—খোলা জান্‌লা দিয়া তপ্ত হাওয়ার ঝলক আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। নিখিল একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—বাঙলা হাতের লেখাটা বই দেখে লিখবো মাষ্টার মশায়?

—লেখো।

নিখিল তখন কথামালা খুলিয়া খাতায় শৃগাল ও দ্রাক্ষাকুঞ্জের গল্পটি হাতের গোটা-গোটা অক্ষরে লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে ভাবনার রাশি আসিয়া তাহার ছোট মনটিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল। সোনা এখন কি করিতেছে? চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়! তাহাদের বাড়ীতে গেলে সোনার মা-বাপ তাহাকে কত আদর, কত যত্ন করে, এখানে সোনা সে আদর-যত্ন না পাক্—বাবা তাহার সঙ্গে একটা মিষ্ট কথাও কহিল না! ইহার পর সোনাদের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি বলিয়া? তবু দেখা করিতেই হইবে। সোনাদের সে বুঝাইবে বাবার

আচরণের নিখিলের কোনো যোগ ছিল না, কোনো যোগ নাই-ও! সোনাকে সে ভালোবাসে, সত্যই ভালোবাসে, খুব,—খুব ভালোবাসে। সোনার সঙ্গে মিশিয়া নিজের বাড়ীতে সে যে তাহাকে লইয়া খেলা করিতে বা তাহার সঙ্গে দু দণ্ড কথা কহিতে পারে নাই, গল্প করিতে পারে নাই—ইহার জন্য তাহার নিজের মনে কি দুঃখ যে হইয়াছে! যেমন করিয়া হোক, বাড়ীর এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবেই—সোনাদের বাড়ীতে আজ সে যাইবে, স্থির করিল। এখানে বাঁশবাজি হইবে, হোক—সে দেখিতে চায় না। আজ বৈকালে সে সোনাদের বাড়ীতে যাইবেই—ইহার জন্য তিরস্কার-প্রহার হয় যদি তো সে তা' সহিবে—আবার যদি সারারাত্রি অন্ধকার ঘরে থাকিতে হয় তাহাতেও সে কাতর নয়! বাবা কেন এমন করিয়া কুকুর-বিড়ালের মতো সোনাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিল? এদেশে এই একটিমাত্র মেয়ে—যে তাহাকে দেখিলে খুশী হয়, তাহার এই একটি মাত্র বন্ধু—তাহার প্রতি এ আচরণের শোধ যেমন করিয়া হোক, নিখিল লইবেই! নিখিলের মনে বিদ্রোহের ঝড় উঠিল...এ শাসন, এ বাঁধন আর সহ্য হয় না—ইহা সে কাটিয়া ফেলিবে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পাড়ল—মার কথা। বেচারী মা! নিখিলের সুখের জন্য মার কি প্রাণপণ আগ্রহ! সে আগ্রহে পিতার কি এ নিষ্ঠুর বাধা দেওয়া! মার কাছেও দু দণ্ড বসিয়া সে গল্প করিতে পায় না। কেন? মার সে কেহ নয়? এমনি নানা উদ্ভট চিন্তা আজ প্রথম তাহার ছোট মনটির মধ্যে কোথা হইতে ভিড় করিয়া আসিয়া সশস্ত্র সৈন্যের মতো রুখিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—কাটো এ বাঁধন—বিদ্রোহ করো, বিদ্রোহ করো! তাহাদের চীৎকারে নিখিলের সমস্ত মন একেবারে তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

পথে ছোট একটি ছেলেকে লইয়া এক বৃদ্ধ ভিখারী গোপীযন্ত্র

বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। সে গাহিতেছিল,—

বেলা যে তোর ফুরিয়ে এলো,
কি করিস্ ভাই বসে?
ঘরের কোণ ছেড়ে আয়, আয় চলে আয়—
বাইরে পুলক রসে।

স্তব্ধ নিঝুম দুপুরের বেলা। গোপীযন্ত্রের মিঠা-করুণ বাজনায় গানের এই ছত্রগুলা নিখিলের তপ্ত প্রাণে যেন অমৃত ছিটাইয়া দিল! নিখিলের মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে এই ঘরের কোণ ঘেরিয়া কে যেন লোহার গারদ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর সেই গারদের বাহিরে গানের প্রত্যেকটি কথা আনন্দের নিশান তুলিয়া সুরের ধারায় তাহাকে সাগ্রহে ডাকিতেছে, আয় রে, ঘরের কোণ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আয়!

কি সুন্দর গান! বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় সত্যই তো, কি সুখ! ঐ ছেলেটি—বাঃ, এই স্তব্ধ দুপুরে পথে-পথে কি আনন্দেই না ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কোথা হইতে আসিতেছে, কত পথ বহিয়া কত দূরে যাইবে—ঘন শ্যামল গাছের পাতার ছায়ায় চারিধার ঘেরা, কত-কত কলরব-মুখরিত পল্লীর ঘাট-বাট অতিক্রম করিয়া নব-নব রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ও চলিবে! এ চলার যেখানে বিরাম হইবে, না জানি, সেখানে কি স্নেহ-নির্ঝরতলে পথ-চলার সকল শ্রান্তি ঘুচিয়া যাইবে! ঘরের মধ্যে তাহার মতো বন্দী হইয়া উহাকে থাকিতে হয় না! কি করিলে বড় লোকের এই কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার ঠেলিয়া দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেও অমনি মুক্ত পথে-প্রান্তরে অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে!

ভাবিতে ভাবিতে নৈরাশ্যের দীর্ঘ কালো ছায়া মেঘাক্রান্ত আকাশের মতো তাহার মনে নিবিড় ঘন হইয়া জমিয়া উঠিল। ঘরে-বাহিরে

কি এ বিরাট অন্ধকার! শাসনের কি কঠিন চাপ! নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে!

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল। দূর হইতে ভিখারীর গোপীযন্ত্রের সুরে-গাওয়া গানের কলি তখনো বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। নিজের মনে ভিখারী গাহিয়া চলিয়াছে—

ঐ যে পাখী ডাকচে গাছে,
আলোয় আকাশ ভরে আছে,—
এই গানে আর আলোয় সুরে
সকল বাঁধন খশে!

নিখিলের বন্ধন-আতুর চিত্ত প্রাণপণে ডুকরিয়া উঠিল—আলো, আলো, ওগো আলো! ঐ আলো-হাওয়ায় আমি যেতে চাই···আমাকে নিয়ে চলো!

বাঙ্‌লা হাতের লেখা শেষ করিয়া নিখিল ডাকিল,—মাষ্টার মশায়···

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কি বলচো?

নিখিল বলিল,—একদিন দুপুরবেলা বাবাকে বলে আমায় ছুটি দেয়াবেন, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেন নিখিল?

নিখিল বলিল,—একদিন দুপুরবেলা পথে-পথে ঘুরে চারিধার দেখে বেড়াবো, এখানে কোথায় কি আছে।

নিখিলের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—দেখে কি হবে?

কুণ্ঠিতভাবে নিখিল বলিল,—বাইরের আলো-হাওয়া কেমন লাগে, দেখবো।

বৃদ্ধ ভিখারীর গান মাষ্টার মহাশয়েরও কানে গিয়াছিল। তিনি বলিলেন,—তাতে দেখবার মতো কিছু নেই, নিখিল।

দু চোখে কাকুতি ভরিয়া নিখিল বলিল,—তবু একবার দেখবো মাষ্টার মশায়।

নিখিলের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

সমবেদনায় মাষ্টার মহাশয়ের মন ভরিয়া উঠিল। বালকের বুকে-পিঠে নিয়মের নিগড় এমন জড়ানো যে বেচারী একটু বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে চায়—মাষ্টার মহাশয় এ ইচ্ছার অর্থও বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, ওঁকে বলে ছুটি দেওয়াবো। এখন লেখা হয়ে গেল তো—এবারে অঙ্ক কষো।

আবার সেই নিয়মের বাঁধন! একটার পর আর-একটা—কত দড়ি-দড়া দিয়াই যে মনটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

নিখিল শুষ্ক বিরস মনে শ্লেট পাড়িয়া বসিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, —নাও, অঙ্ক নাও—বারো হাজার সাতশো তিপ্পান্নোকে ন'হাজার চারশো আট দিয়ে গুণ করো। আজ পাঁচটা গুণ কষবে, ব্যস্. তারপর পদ্যপাঠ পড়া···তাহলেই ছুটি। বুঝলে?

শেষের কথাটা নিখিলের কানে গেল না। সে শ্লেটে আঁক পাড়িয়া বসিল—তারপর আঙুলে সংখ্যা গণিয়া শ্লেটে অঙ্ক লিখিতে লাগিল।

সেদিন বৈকালে নিখিলের আর বাহিরে যাওয়া হইল না! বাঁশবাজি দেখিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় ভুলাইয়া তাহাকে চোখে-চোখে রাখিলেন। পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখ লইয়া নিখিল বাঁশবাজি দেখিল—একটা বংশ-দণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ছায়ার মতো কতকগুলা মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গী চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া গেল, মনের দ্বারে এতটুকু রেখা আঁকিতে পারিল না!

তারপর দুই-চারিদিন নিখিলকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার মহাশয় বেড়াইয়া আসিলেন। পথের ধারে ধারে কত ঝোপ-ঝাড়, ভাঙ্গা মন্দির, পানা-পড়া ডোবা-পুকুর—মাঝে-মাঝে কোনো ঝোপ হইতে তীব্র কটু গন্ধ আসিতেছে—নিখিলের চোখে মায়াপুরীর মতো এগুলা নিঃশব্দ রেখাপাত করিয়া গেল!

বেড়াইয়া আসিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেমন লাগলো নিখিল?

নিখিল বলিল,—ভালো।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কাল আরো দূরে যাবো, নিখিল।

নিখিল বলিল,—দুপুরবেলা ছুটি দিইয়ে দিলেন না, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—দুপুর বেলা যে বড্ড রোদ্দুর, নিখিল।

নিখিল বলিল,—কিছু হবে না রোদ্দুরে, মাষ্টার মশায়। আপনার যাবার দরকার নেই, আমি একলা ঘুরে ঘুরে বেড়াবো।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আচ্ছা, এই রবিবারে ছুটি দেওয়াবো।

তারপর একদিন বৈকালে বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে নিখিল বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখে, সুষমা বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। সে বলিল,—চুপ করে বসে আছো কেন মা?

সুষমা বলিল,—শরীরটা ভালো নেই, বাবা। তুমি বেড়াতে যাওনি এখনও ?

সুষমার কোলের কাছে বসিয়া নিখিল বলিল,—বাবা বাড়ী নেই মা, তাই তোমার কাছে একটু আসতে ইচ্ছা হলো।

সস্নেহে তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া সুষমা কহিল—না, একটু বেড়িয়ে এসো। সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ আছো, একটু বাইরে ঘুরে এসো। নাহলে শরীর ভালো থাকবে না।

মার মুখের পানে নিখিল চাহিল। কি একটা কথা বলিবার জন্ম মন অধীর হইয়া উঠিল—কিন্তু মুখে সে কথা ফুটিল না।

সুষমা বুঝিল, নিখিল কি কথা বলি-বলি করিতেছে, অথচ বলিতে পারিতেছে না।

সুষমা বলিল,—আমায় কোনো কথা বলবে নিখিল ?

—মা—নিখিলের কাতর কণ্ঠে স্বর আর বাহির হইল না।

সুষমা বলিল,—কি বলবে, বলো। আমাকে ভয় কি ?

নিখিল বলিল,—সোনাকে বাবা সেদিন বকেছিল মা ?

—না। বক্‌বেন কেন ? বকেন নি তো।

—সত্যি ?

—হ্যাঁরে। মিছে কথা আমি কেন বলবো ? সত্যি কথা, সোনাকে উনি বকেন্ নি।

নিখিলের বুকের উপর হইতে মস্ত একখানা ভারী পাথর যেন সরিয়া গেল। এ-কদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া মন তাহার প্রতিক্ষণ সোনাদের বাড়ীর দিকে ছুটিতে চাহিয়াছে, শুধু চক্ষু-লজ্জায় যাইতে পারে নাই! আজ বুকের উপর হইতে পাথরখানা সরিয়া গেলে মনে হইল, হাওয়ার গতিতে সে যদি সোনাদের বাড়ী যাইতে পারিত! পরক্ষণেই সুষমার মলিন মুখ চোখে পড়িতে ভাবিল, না,

আজ থাক্। মার অসুখ করিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া আজ আর দূরে যাইবে না।

সুষমা বলিল,—যাও বাবা, বেড়িয়ে এসো!

নিখিল বলিল,—না মা, আজ আমি কোথাও যাবো না। তোমার অসুখ করেচে, বল্‌লে...আজ আমি বাগানে খেলা করি—তাহলেই হবে। সেখানেও তো খোলা হাওয়া আছে, মা।

সুষমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিলের পানে চাহিয়া রহিল। আমার সোনা ছেলে, চাঁদ ছেলে! মায়ের উপর কি মায়া, কত মমতা!

সস্নেহে নিখিলের মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া সুষমা বলিল,—আমার এমন কিছু অসুখ নয় রে। তা বেশ, তুমি বাগানেই বেড়াওগে, যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। সুষমা তাহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিল। পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এই ভাঙ্গা-জোড়া, জোড়া-ভাঙ্গা—এমনিভাবে সমানে চলিবে, কোনো দিনই ইহার বিরাম হইবে না! এই যৌবনে নারী-হৃদয়ের যা-কিছু বাসনা-কামনা, সব ত্যাগ করিয়া জীবনের বসন্ত-টুকুকে দু-হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অন্তরে অন্তরে যে-সন্ন্যাসের সে সাধনা করিতেছে, তপঃক্লিষ্ট চিত্ত এ-সাধনার পুরস্কারে আর কিছু চায় না—চায় শুধু এই নিখিলকে প্রাণে-মনে সর্ব্বময়ভাবে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিতে। হায়রে, পৃথিবীর হিংস্র প্রবৃত্তি কোথা হইতে ইহাতে বাদ সাধিয়া তপস্বিনীর এ-তপেও বিঘ্ন সাধিতেছে! তবু সে এবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, হিংসার রক্তটুকুকে সমূলে শুধু এই ভালোবাসার শুভ্র ধারায় ধুইয়া মুছিয়া দিতে পারে কি না! কাহারো বিরুদ্ধে সে আর কোনোদিন কোনো অনুযোগ তুলিবে না। বেদনার ঝড় তাহারই উপর দিয়া বহিয়া যাক্—তাহার একান্ত স্নেহের তলে-আসীন মাতৃ-হীন এই বেচারা বালকের গায়ে শুধু স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শ! এ ঝড় যেন তাহার গায়ে না লাগে!

বাগানে গিয়া নিখিল গাছের ফাঁকে-ফাঁকে বাগানের পথে ছোট একটা বাঁখারির ঘায় লোহার চাকা ঠেঙ্গাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মার কাছে সে এ খেলা শিখিয়াছে। মা কেমন—শুধু বাবাকেই তার ভয়!

খানিকক্ষণ খেলা করিবার পর বাগানের বেড়ার ওধারে পরিচিত স্বর ভাসিয়া উঠিল,—ও ভাই রাজপুত্তুর…

স্বপ্ন? নিখিল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে—না, স্বপ্ন নয়—সোনা! বাগানের বেড়ার বাহিরে রাঙ্‌চিত্রের ঝোপের ধারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছে। নিখিল একবার চারিধারে চাহিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল, অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—সোনা?

—হ্যাঁ ভাই, আমি। বাবার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি মাতু পিসির বাড়ী। বাগানে চাকা-গড়ানোর শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখছিলুম…অমনি তোমাকে দেখতে পেলুম!

—ভিতরে এসো না ভাই সোনা। এখন আমায় পড়তে হবে না। খেলা করবো।

মুখ ভারী করিয়া সোনা বলিল,—না ভাই, যে তোমার বাবা,—আমার ভারী ভয় করে।

নিখিলের মনে দুম্‌ করিয়া কে যেন মুগুরের ঘা মারিল! পিতার স্বপক্ষে বলিবার কথা একটাও নাই সত্য, তবু বাহিরের লোকের মুখে এ কথা আজ নূতন শুনিয়া তাহার ব্যথিত প্রাণ হইয়া উঠিল।

নিখিল বলিল,—বাবা এখন বাড়ী নেই, শুধু মা আছে।

সোনা বলিল,—রাণী-মা খুব ভালো। কিন্তু তোমার বাবাকে ভারী ভয় করে ভাই। আমি ভিতরে যাবো না। তুমি একদিন আমাদের বাড়ী এসো না ভাই। আর তো তুমি যাও না মোটে—আমি মাকে

জিজ্ঞাসা করি, মা রোজ বলে, আসবে রে, আসবে! কিন্তু তবু তুমি আসো না!

নিখিল বুঝিল, এতদিন না-যাওয়া ভালো হয় নাই। সে তো যাইবে বলিয়া রোজই ভাবিয়াছে। কিন্তু কেন যায় নাই, সোনা তো তা বোঝে না। অথচ তাহাকে এ কথা খুলিয়া বলা চলে না। সে বলিল,—যাবো ভাই সোনা, কাল আমি যাবো। কেমন?

—আমি তাহলে যাই ভাই। ঐ বাবা এসেছে। আবার নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে হবে তো। মাতু পিসির ছেলে হয়েছে, আজ আটকড়ায়ে। কেমন ছোট্ট চুবড়ি পাবো, আর কত মুড়কি, বাতাসা সব দেবে। তোমার জন্যও একটা চুবড়ি আমি চেয়ে নিয়ে রেখে দেবো—কেমন? তুমি কাল গিয়ে মুড়কি খাবে! যেয়ো ভাই। যাবে তো?

নিখিল বলিল,—যাবো।

সোনা বেড়ার ধার হইতে সরিয়া গেলে নিখিলও ঢিবি হইতে আবার বাগানে নামিল। নামিতেই তাহার চোখে পড়িল, ঝোপের ধারে লাল-টকটকে সদ্য-ফোটা একটি গোলাপ! তাড়াতাড়ি ফুলটা ছিঁড়িয়া সে আবার বেড়ার সেই ভাঙ্গা ফাঁকটার কাছে আসিয়া দেখিল,···সোনা ঐ···সে ঐ গলির পথে পুকুরের পাড় ধরিয়া তার বাপের সঙ্গে চলিয়াছে। নিখিল ডাকিল,—সোনা···সোনা···

সোনা যাইতে যাইতে পিছন-পানে ফিরিয়া তাকাইতেছিল; নিখিলের ডাক শুনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। নিখিল আবার ডাকিল,—সোনা···

সোনা অমনি ছুটিয়া আবার বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিখিল বলিল,—একটা জিনিষ নেবে, সোনা? একটি গোলাপ ফুল? কেমন রাঙা আর কেমন গন্ধ, ছাখো। বলিয়া ফুলটি সে সোনার হাতে তুলিয়া দিল।

ফুলের ঘ্রাণ লইয়া সোনা উল্লাসে হাসিয়া উঠিল, কহিল,—বেশ ফুল, ভাই—বাঃ !

এবং পরক্ষণেই সে পিতার দিকে ছুটিল, ডাকিল,—বাবা, বাবা, এই ত্মাখো, রাজপুত্তুর কেমন ফুল দিয়েচে আমায়, ত্মাখো,—রাঙা গোলাপ ফুল।

সারা পথে আনন্দের হাসি ছিটাইয়া সোনা চলিয়া গেল। তাহার সে হাসির সুর অনেকক্ষণ ধরিয়াই নিখিলের মনের মধ্যে প্রাণের মধ্যে এক অপরূপ ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিতে লাগিল। নিখিল সে সুরে মুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল···

যখন সে আবার আসিয়া বাগানের পথে নামিল, তখন বড় বড় ঝাউগাছের পাতা বহিয়া সন্ধ্যার ঘন ছায়া বাগানে ঝরিয়া পড়িতেছে। খেলা আর নিখিলের ভালো লাগিল না। সে ধীর-পদে বাড়ী চলিল... মার কাছে। মার অসুখ—মা একলা আছে। কে জানে, যদি অসুখ বাড়িয়া থাকে ? তার উপর সোনার খবরটা মাকে একবার দিতে হইবে। পিতার সেদিনকার আচরণের কতক প্রায়শ্চিত্ত সে করিয়াছে তো !

## ১১

পরের দিন সোনাদের বাড়ী নিখিলের আর যাওয়া হইল না। অভয়াশঙ্কর নদীতে নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া সুষমা ও নিখিলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অপরাহ্নের সূর্য্য-কিরণ নদীর জলে বিচিত্র বর্ণের তরঙ্গ তুলিয়াছে। নদীর তীরে গ্রামের মেয়েরা কাপড় কাচিতে, জল লইতে আসিয়াছে। কেহ জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে,—

তৃণে-ছাওয়া সবুজের মধ্যে চলা-পথের সাদা রেখা,—তরুণীর কালো কেশে সিঁথির মতো—জলের কোলের একটু উপর হইতে জাগিয়া আছে। সেই পথে জলের রেখা আঁকিয়া পল্লী-নারীরা গৃহে চলিয়াছে। পাড়ে উচ্চ গাছপালার উপর রৌদ্র-কিরণ যেন ফাগের ঝালর ঝুলাইয়া দিয়াছে—সুন্দর দৃশ্য। অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেমন লাগচে, নিখিল?

উদাসীনভাবেই নিখিল বলিল,—ভালো।

এই নূতন বিচিত্র সৌন্দর্য্য কিন্তু নিখিলের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। সোনাকে সে কথা দিয়াছে, আজ তাহাদের বাড়ী যাইবে—বেচারী তাহার পথ চাহিয়া আছে! কথা দিয়া সে-কথা সে রাখিতে পারিল না, এ কি কম দুঃখ! সে গোলাপ ফুলটা সোনা এখনো কি রাখিয়া দিয়াছে? ফুলটা লইয়া সে কি করিল? সোনার মা সে ফুল দেখিয়া কি বলিল? এ-সব জানিবার আগ্রহ তাহার মনে খুব বেশী। তাই এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে তাহার প্রাণ সাড়া দিল না।

ফিরিবার সময় চারিধার অন্ধকার হইয়া আসিল। অভয়াশঙ্কর বাহিরে বসিয়া ছিলেন; পান্সীর কামরার মধ্যে ঢুকিয়া মার কাছে বসিয়া নিখিল বলিল,—একটা গল্প বলো মা। তোমার আজ আর অসুখ করেনি তো?

হাসিয়া সুষমা বলিল,—না। অসুখ কেন করবে?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমরা ভিতরে বসে রইলে কেন? বাইরে এসো।

সুষমা বলিল,—চুপ করে বসে থাকা যায় না বাবু। তার চেয়ে নিখিল গল্প শুনতে চাইছে…

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তা এইখানে এসেই না হয় গল্প বলো, আমিও শুনি।

সুষমা বলিল,—চলো নিখিল।

নিখিল মার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সুষমা এ নিষেধ বুঝিল, বুঝিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—কোনো ভয় নেই নিখিল, এসো। তার পর আরো মৃদু কণ্ঠে বলিল,—নৌকোয় বেড়ানো ভালো লাগলো নিখিল?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, না। মৃদু কণ্ঠে সে বলিল,—আজ মা, সোনাদের বাড়ীতে আমি যাবো বলেছিলুম! সেই যে তোমায় বললুম।

—কাল যেয়ো! এখন এসো, বাইরে যাই। কোনো ভয় নেই, আমি গল্প বলবো, বসে শুনবে।

নিখিলকে লইয়া সুষমা বাহিরে আসিয়া অভয়াশঙ্করের কাছে বসিল। বাহিরে তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সুষমা এক রাজা-রাণীর গল্প সুরু করিল। পাড়ে গাছের ঝোপে-ঝাপে আঁধারের মেলা, নদীর জলে দাঁড়ের তালে ছলাৎ-ছল শব্দ, চারিধারে জ্যোৎস্নার মৃদু আলো—আর নৌকার উপর সুষমার সেই কোন্ অজানা দেশের রাজা-রাণীর গল্প! নিখিলের কল্পনা-রঙীন্ চোখের সামনে এক বিচিত্র স্বপ্নপুরী ফুটিয়া উঠিল!

নৌকা হইতে নামিয়া নিখিল দেখে, ঘাটে দামু ও নন্দ হারিকেন লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অভয়াশঙ্কর সুষমাকে কহিলেন—এই নৌকোখানা কিনবো ভাবচি, সুষমা...বেশ বেড়ানো যাবে তাহলে!

সুষমা ছোট্ট জবাব দিল, বলিল,—বেশ হবে।

তারপর আরো পাঁচ-সাত দিন এমনি নৌকায় করিয়া বেড়ানে চলিল। নিখিল হাঁফাইয়া উঠিল, ভাবিল, এ কি হইল! পাহারা যে বরং আরো কড়া করিয়া দিল! বাড়ীতে এতটুকু স্বাধীনতা ছিল না বটে, তবু বৈকালে নিজের স্বাধীন খেয়াল-মতো এখানে-সেখানে সে বেড়াইতে

পারিত! এখন সে বেড়ানো-টুকুতেও পিতার শাসন-দণ্ডের আঘাত আসিয়া দেখা দিল! তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। পান্সীতে বেড়ানো,—সে তো বেশ লাগে! কিন্তু এমন ভয়ে-ভয়ে গম্ভীরভাবে—এ কি বেড়ানো! নিখিল ভাবিল, কি করিয়া এ বাঁধন কাটা যায়?

ভগবান হঠাৎ সুযোগ করিয়া দিলেন। সেদিন অভয়াশঙ্কর সুষমাকে কহিলেন,—রোজ-রোজ আমার বেড়ানো পোষাবে না, তোমরা দুজনে যেয়ো। একটা চাকরকে বরং সঙ্গে নিয়ো, লণ্ঠন নিয়ে যাবে। ঘাট থেকে আসবার সময় অন্ধকারে অসুবিধা হবে না তাহলে।

একদিন, দু'দিন—মার সঙ্গে পান্সীতে বেড়াইয়া তৃতীয় দিনে অস্থির হইয়া নিখিল মাকে বলিল—আজ আমি সোনাদের বাড়ীতে যাবো মা, পান্সীতে যাবো না।

সুষমা বলিল,—উনি যদি জানতে পারেন, রাগ করবেন।

নিখিল বলিল,—না মা, বাবা জানবে না। তুমি এক কাজ করো··· তুমি নৌকোয় বেড়াতে যেযো, আর আমি সোনাদের বাড়ী ঘুরে ঘাটে এসে থাকবো। দামুকে বারণ করে দেবো, দামু বাবাকে বল্‌বে না তাহলে। তুমিও বলো না।

এ কথা শুনিয়া সুষমা চুপ করিয়া রহিল। এতখানি ছলনার কথা অনেক ভাবিয়াই নিখিলের মনে উদয় হইয়াছে! সে ভাবিল, হায়রে, কত দুঃখে যে সে আজ এই মিথ্যা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে! সোনাদের বাড়ী যাওয়ায় অপরাধই বা এমন কি! তবে নিখিল যদি সতর্ক হইতে চায়, বেশ, তাই হোক্।

সুষমা বলিল—বেশ, তাই হবে। দামু কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবে। আমি নৌকোয় থাকবো,—কিন্তু তুমি দেরী করো না, নিখিল। রাত হয়ে গেলে উনি বক্‌বেন, সে কথা ভুলো না।

নিখিলের সর্ব্বশরীর আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সে বলিল,—আচ্ছা মা। কিন্তু না, দামু নয় মা, নন্দকে আমার সঙ্গে দিয়ো। নন্দ ওদের বাড়ী চেনে। একদিন সে গিয়েছিল আমার সঙ্গে।

সুষমা বলিল,—বেশ নন্দই যাবে।

## ১২

সেদিন বৈকালে সুষমা গিয়া নৌকায় উঠিল, আর নিখিল ওদিকে নন্দকে লইয়া সোনাদের বাড়ী গেল। এ পথ আজ এত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে! পা ও যেন আর চলিতে পারে না!

হাঁটিয়া হাঁটিয়া অনেকখানি পথ আসিল,—ঐ এবার বাড়ী দেখা যায়…ঐ। পুকুরের পাড়ে বড়-বড় তালগাছগুলার পিছনে ঐ যে, সোনাদের বাড়ী। আঃ!

নিখিল আরামের নিশ্বাস ফেলিল। রাজ্যের আরাম তার এ বিশ্বে ঐ-বাড়ীর মধ্যটিতেই আছে! দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নিখিলের গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। চারিধার এমন শুব্ধ! কাহারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না!

নিখিল ভাবিল, মন্দ নয়। বাহির হইতে সে কাহাকেও ডাকিবে না—একেবারে দম্‌কা হাওয়ার মতোই অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠিবে, সকলকে একেবারে চমকাইয়া দিবে! ভারী মজা হইবে।

নন্দকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া নিখিল গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এ কি, উঠানেও কেহ নাই তো! সোনা কি তবে আজও নিমন্ত্রণ গিয়াছে?…

না, ঐ যে ঘরে কে! কে? সোনার মা?

নিখিল ছুটিয়া হুড়মুড় করিয়া একেবারে গিয়া ঘরের সামনে দাঁড়াইল। এ কি, সোনার মার এ কি মলিন বেশ! চুলগুলা রুক্ষ, আলু-থালু বেশ, মুখে-চোখে কালির বিশ্রী দাগ! এ যে তাহাকে চেনা যায় না মোটে!

রুদ্ধ নিশ্বাসে নিখিল বলিল,—সোনা? সোনা কোথায়?

সোনার মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এসেচো বাবা! সে যে রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর করে কেঁদে চলে গেল! দু'দিন আগে যদি আসতে বাবা, তাহলে মা আমার চোখের দেখাও দেখে যেতো!

নিখিলের সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল! অধীর আগ্রহে সে বলিল,—কেন? কোথায় গেছে সোনা?

কাঁদিয়া সোনার মা বলিল—জন্মের মতো সে আমাদের ছেড়ে গেছে বাবা! আর তো সে আসবে না ধন, আর আসবে না!

এ কি কথা! জন্মের মতো ছাড়িয়া গিয়াছে—আর আসিবে না? এ কথার মানে? কোথায় গিয়াছে? কেন আসিবে না? রাগ করিয়া গিয়াছে, বুঝি? নিখিল নিজে গিয়া যদি ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিতে চায়, তবু আসিবে না? যত রাগ করিয়াই যাক্‌, নিখিলের কথায় সোনা না আসিয়া কোথাও থাকিতে পারিবে না!

রুদ্ধ নিশ্বাসে নিখিল বলিল,—কোথায় গেছে, বলো···আমায়?

নিখিলকে সোনার মা দুই বাহুর নিবিড় বাঁধনে টানিয়া বুকে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—পাঁচদিন আগে মার আমার জ্বর হলো—কি কাল-জ্বরই যে হলো! মা আমার জ্বলে পুড়ে চলে গেল—যাতনায় কেবলি ছট্‌ফট্‌ করেচে, আর মুখে শুধু এক কথা—রাজপুত্তুর? ওমা রাজপুত্তুর? আমার রাজপুত্তুর এলো না কেন? তোমার দেওয়া গোলাপ ফুলটি বুকে করে সারাক্ষণ কেবলি কেঁদেচে। তাকে বাঁচাতে পারলুম না, বাবা,

রাখতে পারলুম না। কি কাল-রোগেই যে ধরেছিল! স্বপ্নে ভাবিনি, মা আমার চলে যাবে! কালও বিকেলে যদি একবার আসতে, বাবা! রাত দশটা বাজলো, মারও আমার সব খেলা সাঙ্গ!

নিখিল অবাক্ হইয়া গেল। সোনা নাই? বাঁচিয়া নাই? মরিয়া গিয়াছে? স্বর্গে গিয়াছে? স্বর্গে গেলে মানুষ তো আর ফিরিয়া আসে না! কিন্তু এত-ছোট, সে কেন স্বর্গে গেল?

অসহ্য যাতনায় বুক যেন তার ফাটিয়া যাইবে···দু চোখ বহিয়া জলের ধারা নামিল। কাঁদিতে কাঁদিতে নিখিল বলিল,—কেন সোনা মরে গেল? না, না, তুমি তাকে ডেকে দাও। ওগো, আমি তার সঙ্গে খেলা করতে এসেচি!

সোনার মার হাতের বাঁধন ছিঁড়িয়া, বুক হইতে নামিয়া হাত-পা ছুড়িয়া পাগলের মতো সে চীৎকার করিতে লাগিল,—সোনা, সোনা, আমি তোমার সঙ্গে খেলা করবো বলে এসেছি ভাই। ওগো, দাও না গো তাকে ডেকে—এবার থেকে আমি রোজ রোজ এসে তার সঙ্গে খেলা করবো! সত্যি বলচি গো। বাবা মেরে বাড়া থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলেও আমি শুনবো না,—ওগো দাও, সোনাকে ডেকে দাও—নাহলে আমি...আমি বাড়ী-ঘর সব ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো।

নিখিল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্না শুনিয়া নন্দ ভিতরে আসিল, আসিয়া চোখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখে কথা ফুটিল না! সে থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুঁয়ে পড়িয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের মতো নিখিল ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সোনার মা তখন নিজের শোক ভুলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া বুঝাইতে বসিল,—ছি বাবা, শোনো বাবা, লক্ষ্মীটি, এমন করে কি! ছি, শোনো—তোমার জন্যে সে একটি ছোট চুবড়ি ভরে মুড়কি বাতাসা রেখেছিল—রোগে পড়ে কেবলি বলেছে, ওমা, রাজপুত্তুর এসে এই চুবড়ি

করে মুড়কি-বাতাসা খাবে, বলেচে!—চুপ করো বাবা, কেঁদো না। ছি, লক্ষ্মী মাণিক ছেলে, চুপ করো।

এ কথায় বালকের প্রাণ কি প্রবোধ মানে! সে উঠিয়া বসিল, বসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল! সোনা···সোনা···সোনা! নাই, সে নাই! হাজার ডাকিলেও সে আর নিখিলের সঙ্গে খেলা করিতে আসিবে না।

কাঁদিতে কাঁদতে শ্রান্ত হইয়া নিখিল অবশেষে বলিল,—কৈ, আমার জন্ত চুবড়ি করে সে মুড়কি-বাতাসা রেখেছিল, দাও, ওগো সেটি দাও আমাকে।

দেওয়ালের গায়ের তাক্ হইতে সোনার মা চুবড়ি আনিয়া দিল। নিখিল হাতে লইয়া দেখে, চুবড়িতে পাঁচখানি বাতাসা—পিঁপড়ায় খাইয়া ফোঁপ্‌রা করিয়া রাখিয়াছে।

নিখিল বলিল,—এগুলো আমি নেবো।

একখানি বাতাসা মুখে পুরিয়া চুবড়ি হাতে লইয়া নিখিল বলিল,—আমি যাই, কাল আবার আস্‌বো।

সোনার মা বলিল,—এসো বাবা, কাল এসো। তোমায় বুকে করে এ-জ্বালা যদি একটু ভুলতে পারি!

নিখিল বলিল,—আস্‌বো মা।

মা! নিখিল মা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিল!

আবেগে নিখিলকে বুকে করিয়া সোনার মা বলিল,—কি বললে, বাবা?···মা! আবার বলো, আর একটিবার ডাকো আমায় মা বলে! আমার সোনা তোমার গলায় আবার আমায় ডাক্‌বে। ডাকো, আর-একবার মা বলো—আমার শোক-তাপ জুড়িয়ে যাবে!

নিখিল দু হাতে সোনার মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, গাঢ় কম্পিত স্বরে ডাকিল—মা···মা···

—গোপাল আমার, বাবা আমার—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সোনার মা আঁচলে চোখের জল মুছিল—মুছিয়া নিখিলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,—দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো বাবা, আমার মাথার যত চুল এমনি পরমায়ু হোক্! এর বাড়া আশীর্ব্বাদ, সন্তান-হারা মা আর জানেনা, মাণিক।

১৩

সোনাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাথরের মতো ভারী মন লইয়া নিখিল যখন ঘাটে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারা পথ নন্দর সঙ্গে নিখিল একটা কথা বলে নাই। নন্দও বৈকালে সোনাদের বাড়ী গিয়া ব্যাপার দেখিয়া এমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে যে তাহারো একটা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সমস্ত ব্যাপার তাহার হেঁয়ালির মতো মনে হইতেছিল। সেই আর একদিন সে আসিয়াছিল! সেদিন ঐ কুঁড়েয় কি আনন্দ আর উল্লাসের সাড়াই না পড়িতে দেখিয়াছে! আর আজ? ছায়াবাজির মতো একটা ছোট প্রাণী কোথায় মিলাইয়া গেল, আর তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল এখানকার যা-কিছু আনন্দ-উল্লাস হাসি-গান, আলো-সুর-প্রাণ! নন্দ কাহারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নাই, তবু তাহার মন এমন অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছিল যে সারা পথ ঐ নিখিলের গুম্-হওয়া চলন্ত মূর্ত্তির পিছনে ষ্টীমারের পিছনে দড়ি-বাধা দাঁড়ি-মাঝি-হীন ছোট নৌকার মতো ভাসিয়া আসিয়াছে। নিখিলের এমন স্তব্ধ-গম্ভীর মূর্ত্তি, সে জীবনে দেখে নাই! বাড়ীতে বাপের শাসন যতই থাক্, তা বলিয়া এমন! দেখিয়া শুনিয়া নন্দও কেমন গুম্ হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়া সুষমা একটু ব্যাকুল হইয়া নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। গোধূলির ম্লান আলোয় আশে-পাশে ঘন-বিন্যস্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সুদূর পথে দু' চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে—নিখিল? কোথায় নিখিল? কাহারো চিহ্ন নাই! কেন তাহাকে পাঠাইলাম? রাত হইয়া গেলে বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এই ভাবনাই সুষমার প্রবল। নন্দর উপর রাগ ধরিতেছে। কেমন লোক সে? মনিবকে জানে না? মনিবের হুকুম কি শোনে নাই? সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকা হইবে না—তা সে মাথায় আকাশই ভাঙ্গিয়া পড়ুক, বা প্রলয়ের মেঘ দিক্-দিগন্ত আঁধারে ছাইয়া ফেলুক! মাথার উপর নির্ম্মল মেঘহীন আকাশ—গাছের আড়ালে ছোট এক-টুকরা চাঁদও ঐ দেখা দিয়াছে!

ভয়ে ভাবনায় রাগে সুষমার মন যখন বিষম দোল খাইতেছে, তখন নন্দর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিখিল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুষমা বলিল,—এত দেরী করেচো! তুই বা কেমন নন্দ, বল্ দিকিনি! বাবু রাগ করবেন, সে হুঁশ নেই? নে, লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে চ।

লণ্ঠন পথে বসানো ছিল। নন্দ সেটা হাতে তুলিয়া লইল। সুষমা তখন নিখিলের পানে চাহিয়া বলিল,—বাড়ী চলো। জোরে জোরে—এই অবধি বলিয়াই নিখিলের শুষ্ক শোকার্ত্ত মুখের উপর চোখ পড়িতেই সুষমা শিহরিয়া উঠিল। এ কি তাহার মূর্ত্তি!

বিস্ফারিত দুই চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল ভরিয়া সুষমা নিখিলকে এক রকম বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েচে নিখিল? অসুখ করেচে? সঙ্গে সঙ্গে গায়ে হাত দিয়া বলিল,—না, গা তো ভালো।

মেঘ-গম্ভীর আকাশ যেমন দমকা এক ঝলক হাওয়ার বেগে ফাটিয়া

বৃষ্টির ধারায় ঝরিয়া চরাচর ভাসাইয়া দেয়, সুষমার এই স্নেহের হাওয়া লাগিয়া নিখিলের রুদ্ধ শোক মুহূর্ত্তে তেমনি অশ্রুর ধারায় ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িল! শোকের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া দু' হাতে সুষমাকে জড়াইয়া নিখিল তাহার বুকে মুখ গুঁজিল! সুষমা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল,—কাঁদচো কেন নিখিল? কি হয়েচে?

করুণ শোক প্রচণ্ড কান্নার ঢেউ তুলিয়া নিখিলের মনের মধ্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। বারবার প্রশ্ন করিয়া জবাব না পাইয়া সুষমা নন্দর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হযেচে রে, নন্দ? নিখিল পড়ে টড়ে গেছলো না কি কোথাও?

দুর্ভাবনায় সুষমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল!

নন্দ বলিল,—যাদের বাড়ী গেছলুম, তাদের বাড়ীর সেই মেয়েটি মারা গেছে, মা!

এ্যাঁ! সুষমাকে কে যেন আকাশে তুলিয়া হঠাৎ তখনি দু হাতে ছুড়িয়া কঠিন পাহাড়ের গায়ে ফেলিয়া দিল। সেই ছোট মেয়েটি? সোনা? সে নাই?

নিখিল সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মতো তাহার বুকে মাথা কুটিতে লাগিল। সুষমা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল,—নিখিল···

তীব্র স্বরে নিখিল ঝঙ্কার দিল,—সোনা···সোনা···সোনা কোথায় গেল মা? বলিয়া পাগলের মতো পথে দু পা ঠুকিয়া সে বিষম কান্না জুড়িয়া দিল।

কোনোমতে তাহাকে ভুলাইতে না পারিয়া সুষমা বলিল,—কেঁদো না। শোনো নিখিল, ছি, রাস্তায় এমন করে কাঁদে কি! রাত হয়ে যাচ্ছে। চলো, বাড়ী চলো। নাহলে উনি বকবেন। জানো তো বাবা···

কাঁদিতে কাঁদিতে জড়িতস্বরেই নিখিল বলিল,—বকুক বাবা! আর

আমি ভয় করি না। আমি বাড়ীতে থাকতে চাই না, থাকবো না আর। বাড়ী থেকে আমি পালিয়ে যাবো! সোনা যেখানে গেছে, সেইখানে যাবো। চাই না, চাই না আমি তোমাদের বাড়ী যেতে।

শিহরিয়া সুষমা তাহার মাথায়-মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—ছি বাবা, ও-সব কথা কি বল্‌তে আছে? মাণিক আমার, ছি! চুপ করো, বাড়ী চলো।

—না, না, আমি বাড়ীতে যাবো না।

নিখিল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুষমার প্রাণেও এ সংবাদ কাঁটার মতো বিঁধিয়াছে! সেই হাসির মতো ফুলের মতো সুন্দর ছোট্ট মেয়েটি! মা-বাপের বাছা! জোর করিয়া সে কাঁটার ব্যথা চাপা দিয়া সুষমা বলিল,—বাড়ী যাবে না? আমার কথা শুনবে না তাহলে? বেশ, আমিও তাহলে কাঁদি—কেমন?

সুষমার কণ্ঠের স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল। সে সুষমার পানে চাহিল। চাহিতেই লণ্ঠনের আলোয় দেখিল, সুষমার চোখ যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সে ডাকিল,—মা…মা…

—কেন?

—সোনা কোথায় গেল?

গাঢ় স্বরে সুষমা বলিল,—স্বর্গে গেছে বাবা, ভগবানের কাছে। তার জন্যে কি কাঁদে?

নিখিল বলিল,—বড় হলেই তো মানুষ ভগবানের কাছে যায়,—সোনা ছেলে মানুষ!

সুষমা অতিকষ্টে নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—যারা ভালো হয়, লক্ষ্মী হয়, ভগবান তাদের ভালোবাসেন কি না, ভালো বেসে তাই তিনি তাদের নিজের কাছে নিয়ে যান্।

একটু স্থির থাকিয়া নিখিল বলিল,—আমি যদি খুব লক্ষ্মী হই? ভালো হই?

বালাই! ষাট! সুষমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! সে বলিল,—রাত হয়ে যাচ্ছে নিখিল—আর এখন পথে থাকে না। চারিধারে ঝোপ-ঝাপ, সাপ-খোপ বেরোয় যদি? লক্ষ্মী বাবা আমার, বাড়ী এসো।

স্থির হইয়া মার হাত ধরিয়া নিখিল বাড়ীর পথে চলিল,—নন্দ আগে আগে লণ্ঠন দেখাইয়া চলিয়াছে।

খানিকটা পথ আসিয়া নিখিল বলিল,—তুমি বল্‌লে না মা?

—কি বলবো?

—আমি যে কথা জিজ্ঞেস করলুম।

—কি কথা?

—আমি যদি লক্ষ্মী হই, ভালো হই, তাহলে ভগবান আমাকেও তাঁর নিজের কাছে সোনার কাছে নিয়ে যাবেন?

আবার ঐ কথা! সুষমা ভয়ে একেবারে কাঠ! মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া নিখিলের মুখে চুম্বন করিয়া সুষমা বলিল,—ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই। মা-বাপ বেঁচে থাকলে ভগবান ছেলেমেয়েদের নিয়ে যান্ না—মা-বাপের মনে তাহলে কষ্ট হবে কি না!

নিখিল বলিল,—সোনার তো বাবা আছে, মা আছে, সোনাকে তবে নিয়ে গেলেন কেন?

সুষমা বলিল,—সোনার বাবা সোনার মা হয়তো কোন পাপ করেছিল, সোনার মনে সেজন্য হয়তো দুঃখ হয়েছিল…

একটু উৎফুল্ল স্বরে নিখিল অমনি বলিয়া উঠিল,—বেশ তো, বাবা যখন তোমায় বকে, আমায় বকে, তখন আমারো খুব দুঃখ হয় মা, আমিও তো কাঁদি—ভগবান তবে আমাকে কেন তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন না?

—আবার ঐ কথা নিখিল! না! আমি ভারী রাগ করবো এবার। চুপ করে তাড়াতাড়ি এখন বাড়ী চলো। রাত হয়ে গেছে।

নিখিল একেবারে মুষড়াইয়া গিয়া মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া বলিল,—না মা, রাগ করো না মা, আর আমি ককৃখনো এ কথা বল্‌বো না।···তোমার কষ্ট হয় ও কথা শুনলে?

—হয়।

—তাহলে আর বলবো না, মা।

## ১৪

বাড়ী আসিয়া রাত্রে বাঁধা নিয়মে নিখিল বই খুলিয়া বসিল, কিন্তু একটা লাইন পড়িতে পারিল না! বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা ক্রমাগত ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে, এত বড় পৃথিবী হঠাৎ যেন চুপ্‌সিয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, আর তাহার মধ্যে যত লোক-জন ছিল, সকলের বুকে-বুকে মুখে-মুখে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া ঠোকাঠুকিতে থ্যাব্‌ড়াইয়া তাল-গোল পাকাইয়া বিশ্রী একাকার হইয়া গিয়াছে! গাছে গাছে পাখীগুলার কণ্ঠ সেই সঙ্গে ছিঁড়িয়া গিয়াছে! বাতাস বন্ধ, আলো যেন চিরদিনের জন্য নিবিয়া গিয়াছে, আর সুযোগ পাইয়া চারিধার হইতে রাশি-রাশি অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ক্রমে এক দৈত্যের আকার ধরিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে! অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া কোনোমতে সেই কালো দৈত্যটার হাতের ফাঁক দিয়া গলিয়া ছুটিয়া সে এখন পলাইতে চায়—কোথায় আলো! ওগো কোথায় বাতাস! চোখের কোণে জল ঠেলিয়া-ঠেলিয়া আসিতেছে আর মাঝে মাঝে অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা দুই চোখের সামনে জাগিয়া উঠিতেছে,

সেদিনকার সেই দৃশ্য—নিঝুম দুপুরে রৌদ্র-ছায়ায় ঘেরা পথের উপর সোনা আসিয়া তাহাদের বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়াছে···সঙ্গে তাহার বাপ বনমালী। সোনার করুণ চোখের অধীর দৃষ্টি এই প্রকাণ্ড বাড়ীময় নিখিলকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। আর নিখিল? সে যেন ছাদের এক কোণে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া নীরব নত নেত্রে সোনাকে লক্ষ্য করিতেছে! দেখিতে দেখিতে সোনার দৃষ্টি যেন হাওয়ার মতো ছাদের উপর ভাসিয়া উঠিল, আর নিখিলও ভয়ে-ভয়ে ঘুলঘুলির ধার ছাড়িয়া সারা ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, সোনার দৃষ্টির হাওযাও অমনি ছোট একটা ঘুর্ণী বাতাসের মতো তাহার পিছনে-পিছনে ছোটা সুরু করিয়া দিল।

হঠাৎ মাষ্টার মশায়ের কণ্ঠ···মাষ্টার মশায় বলিলেন,—তুমি আজ মোটে পড়চো না নিখিল! পড়ায় তোমার আজ মন নেই, দেখ্‌চি।

নিখিল বলিল,—আমার ঘুম পাচ্ছে, মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার মহাশয় লক্ষ্য করিলেন, নিখিলকে আজ বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। কিন্তু তিনি কি করিবেন? তাঁহার উপর হুকুম আছে, এটা নিখিলের পড়ার সময়,—পড়ার নিযম ঠিক থাকা চাই। কোনোমতে তাহার ব্যতিক্রম না হয়!

অথচ নিখিলের শরীর-মন আজ একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখিযা মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ কাতর হইল। বেচারী!

কিন্তু ছুটি দিলে কর্ত্তা যদি রাগ করিয়া নিখিলের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া বসেন! একটু ভাবিয়া মাষ্টার মশায় বলিলেন,—একটু পড়ো, তাহলেই ছুটি দেবো। চেঁচিয়ে পড়ো—তাহলে ঘুমও ছেড়ে যাবে।

নিখিল বলিল,—চেঁচিয়ে পড়তে পারচি না, মাষ্টার মশায়।

নিখিলের চোখে এমন অসহ্য কাতরতা ফুটিয়া উঠিল যে মাষ্টার মহাশয়

তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এমন শীর্ণ মুখ, শ্রান্ত দৃষ্টি। নিখিলের মুখও কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে!

মাষ্টার মহাশয় তাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—কি অসুখ করচে নিখিল? আমাকে বলো...

মাষ্টার মহাশয়ের বুকে মাথা রাখিয়া নিখিল একেবারে প্রশ্ন তুলিল,—মানুষ মরে যায় কেন মাষ্টার মশায়? মরে তারা কোথায় যায়?

নিখিলের মুখে হঠাৎ এত বড় অভিনব প্রশ্ন শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এ কথা? এ প্রশ্নের কারণ? মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া নিখিলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

নিখিল বলিল,—বলুন না মাষ্টার মশায়,—মানুষ কেন মরে যায়? আর মরে তারা কোথায় যায়?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—তা কি মানুষে বলতে পারে, নিখিল?

নিখিল বলিল,—মা বলে, ভগবান যাকে ভালোবাসেন, সে মরে যায়—সত্যি? ভগবান তাহলে মা-বাপের মনে দুঃখ দিয়ে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নিজের কাছে নিযে যান্ কেন? ছেলে-মেয়েদের তো কষ্ট হয়, মা-বাপকে ছেড়ে তাঁর কাছে যেতে? সেখানে মা-বাপের জন্ম তাদের মন কেমন করবে তো?

অত বড় কঠিন প্রশ্নের এমন সহজ সমাধান শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় অবাক হইলেন। বা, সুন্দর জবাব তো! মাষ্টার মহাশয় মুখে কোনো কথা বলিলেন না, শুধু অবাক হইয়া রহিলেন। যে-নিখিল খুব-প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া তাঁহার কাছে এক-রকম চুপ করিয়াই থাকে, সেই নিখিলের কণ্ঠ সহসা আজ এমন মুখর হইয়া উঠিল! আবার তার উপর মুখে একেবারে মরণ-বাঁচনের এমন কথাই বা ফুটিল কেন!

নিখিল আবার প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, ভগবান তো স্বর্গে থাকেন' স্বর্গ কোথায় মাষ্টার মশায়? মা বলছিল, ঐ আকাশের উপর! তাই

কি? তাহলে মানুষ ওখানে যাবে কি করে? তা যদি হতো, তাহলে এই এরোপ্লেন হয়েছে, এতে চড়ে তো মানুষ স্বর্গে যেতে পারতো—মরে স্বর্গে যেতে হতো না!

এইটুকু বলিয়া নিখিল থামিল, তারপর আবার বলিল,—তা নয়। আকাশের উপর স্বর্গ নয়, স্বর্গ সেখানে থাকতে পারে না। আকাশটা তো কিছুই নয়! আপনি বলেন, ও ফাঁকা! সেদিন বলছিলেন না, আকাশ শূন্য...এঁ্যা? আমি সব বুঝি মাষ্টার মশায়। স্বর্গ হচ্ছে সেই ··পৃথিবীর শেষে—অনেক দূরে—যেখানে পৃথিবী একদম্ শেষ হয়ে গেছে, তারপরই মস্ত পাঁচিলে ঘেরা স্বর্গ—না? সেখানে ঢোকবার শুধু একটি ফটক আছে—না? যুধিষ্ঠিরই শুধু চলে-চলে পৃথিবী পার হয়ে পাহাড় ঘুরে স্বর্গে গিয়েছিলেন! আর কোনো জ্যান্ত মানুষ অত কষ্ট করে যেতে পারে নি! ভীম অর্জ্জুন—তাঁরাও পারেননি—না?

মাষ্টার মহাশয় আজ এই বালক ছাত্রটির কল্পনার উৎস এমন ভাবে খুলিতে দেখিয়া যেমন চিন্তিত হইলেন, তেমনি মুগ্ধও হইলেন। কল্পনায় নিখিল এ তো চমৎকার স্বর্গ গড়িয়া তুলিতেছে!

একটু থামিয়া নিখিল আবার বলিল,—আমি একদিন যাবো মাষ্টার মশায়।···দূরে, খুব দূরে—হেঁটে হেঁটে সমস্ত পাহাড়-পর্ব্বত বয়ে, নদী পার হয়ে, সাগর পার হয়ে হেঁটে হেঁটে পৃথিবীর ওপারে সেই স্বর্গে আমি যাবো। গিয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করবো, কেন তিনি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে যান্? তাদের যদি ভালোই বাসেন, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যান না কেন? যারা চলে যায়, তাদের জন্য—এখানে যারা পড়ে থাকে,—তাদের মন কেমন করে না! তাছাড়া সব-ছেলে-মেয়েদের যদি স্বর্গেই নিয়ে যাবেন, তাহলে পৃথিবীতে মা-বাপের কাছে তাদের পাঠানো কেন?

মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের এ মুখরতায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—কিন্তু হঠাৎ আজ এ কথা কেন নিখিল ?

মাষ্টার মহাশয়ের এ কথার ঘা খাইয়া, নিখিলের কল্পনার ফানুশ সহসা ছিঁড়িয়া নীল আকাশের সান্নিধ্য ছাড়িয়া একেবারে পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িল। অমনি সোনার শোক জীবন্ত হইয়া বুকে ফুটিল। নিখিল বলিল,—সোনা বলে একটি ছোট মেয়ে ছিল না—ঐ বনমালীদের ? সে মরে গেছে। মরে সে স্বর্গে ভগবানের কাছেই তো গেছে ? কিন্তু তার মা-বাবা এখানে দুঃখ পেয়ে কত কাঁদচে, ভগবান দেখছেন না কেন ? দেখে তাদের সোনাকে আবার তাদের কাছেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন ? বইয়ে লেখা আছে, ভগবান কারুণিক—কারুণিক মনে তো দয়ালু ? আর এই বুঝি তাঁর দয়া !

নিখিল চিরদিন মুখ-চোরা। কিন্তু এ কি ! আজ তাহাকে সহসা এতখানি মুখর হইতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—সেই বনমালী ? সেই একদিন রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির সময় যাদের বাড়ী তুমি বসেছিলে, তারপর তার সঙ্গে ফিরছিলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হলো—সেই না বনমালী ?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তার মেয়েটি মারা গেছে ?

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আহা !

মাষ্টার মহাশয়ের এই সমবেদনার আহা শুনিয়া নিখিল বলিল,—সেই তো সোনা। সে খুব ভালো মেয়ে ছিল। আমাদের বাড়ী একদিন সে এসেছিল মাষ্টার মশায়—একদিন দুপুর বেলায়—আমি তখন আপনার কাছে বসে পড়ছিলুম।

মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন, সেই সমবয়সী-মেয়েটির বিয়োগ-বেদনা

নিখিলের প্রাণে খুব বাজিয়াছে ; বুঝিয়া তাহার পানে তিনি চাহিয়াই রহিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

নিখিল বলিল,—তবু আমি লুকিয়ে একবার বাইরে গেছলুম, তাকে বলতে যে আমি এখন পড়চি, বাড়ী যাও। বাবা দেখতে পেলে তাকে বকে যদি ?

তার পর একটু থামিয়া বলিল,—তাই হলো কিন্তু। সে মার কাছে গেল,—মা আমাকে সেই ডেকে পাঠালো না ? সেই সে একদিন বিন্দু ডাকতে এলো, আপনি বললেন, যাও নিখিল, শুনে এসো। তার পর ওপরে গেছি, অমনি বাবা এসে আমায় এমন ধমক দিলে সোনার সাম্‌নে···

নিখিলের দু চোখে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

একটা নিশ্বাস···বুকে চাপিয়া মাষ্টার মহাশয় নিখিলের পানে কেমন বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিলেন। বড় লোকের ছেলে, আইনের গণ্ডীতে বাঁধা নিখিল,—গরিবের জন্য তাহার মনে এমন মমতা !

কান্না-মাখা সুরে নিখিল বলিল,—সোনা আমাকে বল্‌তো রাজপুত্তুর—মাকে বল্‌তো রাণী-মা। তার রাণী-মাকে সে সেদিন দেখতে এসেছিল।

নিখিলের মুখে আর কথা বাহির হইল না। দুই চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া শুধু জলের ফোঁটা বইয়ের খোলা পাতায় অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—যাও নিখিল, আজ আর পড়তে হবে না। আজ তোমার ছুটী।

নিখিল সজল চোখে মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিল,—না। বাবা বক্‌বে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—ভয় নেই, বকবেন না। যদি বকেন

বলো, মাষ্টার মশায় ছুটী দিয়েছেন। তারপর যা বলবার, আমি বলবো।

কৃতজ্ঞতায় নিখিলের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে শুধু ডাকিল,—মাষ্টার মশায়…

সস্নেহে নিখিলের পিঠে হাত রাখিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তুমি শোও গে নিখিল, আজ আর পড়তে হবে না।

নিখিল তাহাই চাহিতেছিল। কোনোমতে লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া আড়ালে বিছানায় গিয়া যদি একবার সে ঢুকিতে পারে! তাহা হইলে সেই নিমেষে এই রুদ্ধ বেদনাকে সে একবার প্রাণ খুলিয়া উজাড় করিয়া দেয়! সেই যে তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া মলিন মুখে সোনা সেদিন ফিরিয়া গিয়াছে, তারপর বাগানের ফুল লইয়া গেলেও সোনার সেদিনকার সেই মলিন মুখের স্মৃতি ছুরির ফলার মতো অহরহ নিখিলের বুকে বিঁধিতেছে। সমস্ত বুক ছিঁড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই ছুটী পাইয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

## ১৫

নিখিল চলিয়া গেলে মাষ্টার মহাশয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন! নিখিলের কথা কয়টা মনের মধ্যে প্রচণ্ড দোলা দিয়াছে। মনে হইতেছিল, মাহিনা খাইয়া শুধু ইহার পড়া বলিয়া দিয়াছি,—কোনোদিন মনের পানে চাহিয়াও দেখি নাই! এই ছোট শিশু—পড়ার ভারে নিয়মের চাপে বুক-পিঠ টন্ টন্ করিয়াছে, মনটা পিষিয়া ধূলা হইবার মতো হইয়াছে, তবু ক্রমাগত তাহার মনে কামারের হাতুড়ি ঠুকিয়াছি,—পড়ো, পড়ো! ঘুমে চোখ তাহার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, অসুখে মাথা দপদপ করিয়াছে, তবু রেহাই দিই নাই—চোখে জল

দেওয়াইয়া কট-মট করিয়া বইয়ের পানে দৃষ্টিটাকে হিঁচ্ড়াইয়া বাহির করিয়া আনিয়া সজোরে শুধু হাতুড়ি ঠুকিয়াছি,—পড়ো, পড়ো! নিখিলও অমনি পড়িয়া গিয়াছে। উস্কখুস্ক বেশ, মলিন মূর্ত্তি—তবু মাহিনা-ভোগী মাষ্টারের প্রাণে এতটুকু মমতা জাগে নাই! কেন? না, এই পঞ্চাশ টাকার মাহিনা ও খোর-পোষের সব বাঁধন পাছে কাটিয়া যায়! তীব্র অনুশোচনায় আজ এই প্রথম মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এ কি মাষ্টার,—না, কশাইয়ের কাজ?

মাষ্টার মহাশয় ভাবিলেন, এই বাপ! বাপেরই বা এ কেমন প্রাণ! স্নেহের শীতল ছায়া, মিষ্ট কথার স্নিগ্ধ বারি—কোনোদিন তাহা চোখে পড়ে নাই! কেবলি শাসন, পেষণ, প্রতাপের তীব্র হুঙ্কার! ছেলেটা চারিদিককার এই কঠিন পাষাণের চাপ সহিয়াও বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া, আশ্চর্য্য! সাধে নিখিল সেদিন বলিয়াছিল,—মাষ্টার মশায়, একদিন দুপুর বেলায় আমায় ছুটী দেবেন? আমি ঘুরে চারধার দেখে আসবো।

ঠিক! শাসনের চাপে আর নিয়মের বাঁধনে প্রাণ তাহার জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে—তাই সে চায় প্রকৃতির উদার বুকে নয়ন-মন-জুড়াইয়া শ্যামল তৃণ-দল, সবুজ শষ্প আর মুক্ত হাওয়ার ছোঁয়া লাগাইয়া প্রাণটাকে চান্‌কাইয়া সরস করিয়া লইতে! বেশ, তাই হোক্! কালই সে ছুটি তাহাকে দিতে হইবে। কর্ত্তার মেজাজ ইহাতে যদি বারুদের আগুন ছিটায় তো তিনিই তাহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইবেন, নিখিলের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগিতে দিবেন না!

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, প্রতিক্ষণে কর্ত্তার জুতার শব্দ প্রতীক্ষা করিয়া! প্রত্যহই যে তিনি আসেন, তা নয়। তবু আজ সেই দুটো পায়ের শব্দই তিনি প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তা ছাড়া কি জানি, ওধারে যদি আবার, ইতিমধ্যে সেই পরিচিত রূঢ় কণ্ঠে হঠাৎ ভর্ৎসনার তীব্র হুঙ্কার জাগিয়া ওঠে!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করিলেন। সে শব্দ, সে হুঙ্কার জাগিল না।

মাষ্টার মহাশয় আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া নিখিল প্রতিদিনকার মতো মার সঙ্গে দেখা করিল না, মুখ-হাত ধুইয়া খাবার খাইয়া একেবারে বাহিরে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চলিয়া আসিল; এবং রুটিন-মাফিক পড়ার বই খুলিয়া বসিল।

চৈত্র মাস। বাহিরে বেশ মিঠা দখিনা বাতাস বহিতেছে এবং গাছের ডালে নানা পাখীর আনন্দ-কূজন স্থরের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছে। বই খুলিয়া বসিলেও নিখিলের মন বাহিরে বসন্তের সে উৎসব-কোলাহলে তন্ময় হইয়া আছে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আজো পড়তে ভালো লাগচে না, নিখিল, না?

নিখিল কিছু না বলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—একটু পড়ো। তারপর দুপুর বেলা তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবো'খন।

নিখিলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মুক্তির হাওয়া প্রাণে যেন স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিল, পরক্ষণেই সে-হাওয়ায় একটু আগুনের ঝাঁজ ...নিখিল বলিল,—বাবা বকবে না?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তাঁকে বলেই যাবো। বুঝলে?

আঃ! কৃতজ্ঞতায় নিখিলের মন ভরিয়া উঠিল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিখিল বলিল,—আচ্ছা, এখন বেশ করে তবে পড়ি।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—হ্যাঁ, পড়ো। রোজ-রোজ পড়াশুনা করা ঠিক নয়! মাঝে মাঝে ছুটি দরকার। আজ তোমায় সে ছুটি দেবো।

নিখিল বলিল,—আজ তাহলে নিশ্চয় ছুটি পাবো? বাবা বারণ করবে না?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—না। আজ নিশ্চয় ছুটি পাবে।

—তাহলে পড়ি মাষ্টার মশায়। খুব মন দিয়ে পড়বো, দেখবেন।

মাষ্টার মহাশয় ভারী খুশী হইলেন, পড়ায় নিখিলের আজ এই অত্যন্ত মনোযোগ দেখিয়া। ছুটির একটু আভাষেই মন যখন এমন হাল্‌কা হইয়া গেছে, তখন ছুটি মিলিলে মনের কোণে আর এতটুকু ভার থাকিবে না! তার ফল কি সামান্ত! এতদিন এ কথাটা যদি তিনি ভাবিয়া দেখিতেন! কি করিয়া দেখিবেন? তাঁহার চোখ ঐ মাহিনার টাকার পিছনে নিয়মের আগড়ে বাঁধা ছিল! ধিক এমন টাকায়! মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া এমন চাকরিতেও ধিক্!

নিখিল ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেছে—আকারের পর উ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়—যথা, মহা ছিল উপকার, মহোপকার; ছায়া ছিল উপবিষ্ট, ছায়োপবিষ্ট···

## ১৬

দশটার সময় আহার সারিয়া নিখিল আসিয়া সুষমাকে ডাকিল, —মা...

সুষমা তখন কি-একটা তরকারী কুটিয়া দিতেছিল, বলিল,—কেন নিখিল?

নিখিল বলিল,—একটা কথা বলবো, মা?

—বলো।

সুষমার গলা জড়াইয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি নিখিল বলিল,—আজ দুপুর বেলা আমার ছুটি। মাষ্টার মশায় ছুটি দেছেন···পড়তে হবে না।

নিখিলের কালিকার সেই শোকার্ত্ত গুমট ভাব দেখিয়া সুষমা বিষম চিন্তিত হইয়াছিল। রাত্রে তাহাকে কত পীড়াপীড়ি করিযাও এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছু খাওযাইতে পারে নাই! আজ সকালেও সে সুষমার সঙ্গে মোটে দেখা করে নাই! এজন্য সুষমার মন খুবই অস্থির হইয়া ছিল। কোনো কাজে সুষমা মন লাগাইতে পারে নাই, সে-মন একটু একটু করিয়া সাফ্ হইতেছিল। এখন নিখিলের এই স্বচ্ছ সরল উল্লাসে সুষমা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল,—বেশ, তখন কি করবে?

নিখিল বলিল,—মাষ্টার মশায় আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেচেন।

সুষমা বলিল,—বেড়িয়ে এসে আমায় গল্প বলো—কেমন?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ মা, বলবো।

নিখিল লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। সুষমা কাজ ফেলিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

বাহিরে গিয়া নিখিল মাষ্টার মহাশয়কে তাড়া দিতে লাগিল,—চান্ করুন মাষ্টার মশায়। কখন যাবেন?

মন তাহার আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে পাখীর কলরব ও হাওয়ার ঝরণা তাহাকে কেবলি মায়ার প্রলোভন তুলিয়া ডাক দিতেছে, আয় রে, শীঘ্র বাহিরে চলিয়া আয়!

মাষ্টার মহাশয় স্নান করিতে গেলেন—নিখিল একা ঘরে থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। গাছে ফুলের কাছে কাছে দুটো প্রজাপতি ঘুরিয়া ফিরিতেছে,—লালে-নীলে কালোয়-সাদায় রাঙানো বিচিত্র তাদের পাখা! প্রজাপতি ধরিতে নিখিল তাদের পিছনে ছুটিল! ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে পুকুরের পাড় বাঁকিয়া মন্দির ছাড়াইয়া সে একটু দূরে গিয়া পড়িল। প্রজাপতিও ইতিমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে প্রজাপতি খুঁজিতেছ, এমন সময় কানে গেল, পাখীর ডাক। একটা ঘুঘু···কোন্ গাছে পাতার আড়ালে বসিয়া করুণ তান ধরিয়াছে, ঘু-ঘু-ঘু। সে-ডাকে প্রাণ কেমন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইল। মুগ্ধ নিখিল প্রজাপতি ছাড়িয়া তখন ঘুঘুর খোঁজে চলিল। আমের বোউলে গাছের ডাল-পালায় আকুল মদির গন্ধ—মত্ত মৌমাছিরা মদির গুঞ্জনে সারা বন মুখর করিয়া তুলিয়াছে। নিখিলের মন সে-গন্ধে সে-গুঞ্জনে মাতাল হইয়া উঠিল। বাড়ী ভুলিয়া ঘর ভুলিয়া শাসন ভুলিয়া বনে-বনে পাগল হাওয়ার মতো ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে কখন এক সময় বাগান-মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে! আঘাটায় দু-চারজন নারী স্নান করিতেছে, তাহাদের একটি কালো ছেলে জলে সাঁতার দিতেছে—নিখিল তীরে দাঁড়াইয়া সেই সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল।

ছেলেটা স্নান সারিয়া ক্রমে তীরে উঠিল এবং গা মুছিতে মুছিতে বনের পথ ধরিয়া গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিখিলও তখন নদীর ধার দিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। নদীর এপারে বনের শেষে ক্রমে খোলা মাঠ দেখা দিল। মাঠে এক রাখাল-ছেলে বড় অশথ গাছের নীচে ছায়ায় মোটা গুঁড়িতে ঠেশ দিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। নিখিল সে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে বসিল। রাখাল-ছেলে বাঁশী রাখিয়া কথা কহিল। তাহার সঙ্গে তখন নিখিলের কথা হইল—কোথায় ঘর? তাহার কে আছে? অনেক কথা! তারপর রাখাল-ছেলে আবার বাঁশীতে তান তুলিল। নিখিল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হইয়া সব ভুলিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল।

যখন রাখাল-ছেলের বাঁশী থামিল, সূর্য্য তখন মাঠের মাথার উপরকার সমস্ত আকাশকে লাল রঙে রাঙাইয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে।

রাখাল-বালককে বাঁশী রাখিয়া দল জড়ো করিতে দেখিয়া নিখিলের হুঁশ হইল, তাইতো, সে এ কি করিয়াছে! কোথায় আসিয়াছে! ছুটি··· ছুটি—ছুটি তো মিলিয়াছিল, কিন্তু সে কি সর্ত্তে? আর মাষ্টার মহাশয়কে ফেলিয়া সে একা কোথায় আসিয়াছে? সারা দিন ঘুরিয়া কোন্ পথে এ কোন্ অজানা মাঠে! কি করিয়া কোন্ পথেই বা এখন সে বাড়ী ফিরিবে?

রাখাল-বালক দল জড়ো করিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে মাঠ পার হইয়া ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ শুনা যায়, নিখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশীর সুর শুনিল। সুর ক্রমে দূর-সীমান্তে মিলাইয়া গেল।

এত বড় খোলা মাঠে নিখিল এখন একা! ওদিকে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিতেছে,—আকাশের এক কোণে মলিন চাঁদ উদয় হইয়াছে!

নিখিলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিলেও চলে না। এখনই রাত্রি হইবে। দূরে তাল-গাছের ঘন কুঞ্জ দেখা যাইতেছে, নিখিল সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল,—ঐ পথে যদি গ্রামের সন্ধান মেলে!

## ১৭

ঠিক সন্ধ্যার সময় মাঠে দাঁড়াইয়া নিখিল যখন রাখাল-ছেলের দূর হইতে ভাসিয়া-আসা বাঁশীর সুরে পথ খুঁজিতেছিল, বাড়ীতে তখন ওদিকে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। বেচারা বনমালী কন্যার শোকে কাতর চিত্ত লইয়া জমিদার বাবুর মস্ত বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যদি একবার নিখিলের দেখা পায়! তাহাকে বুকে তুলিয়া, তাহার সঙ্গে দুটো কথা কহিয়া প্রাণের বেদনা যদি একটু ঘুচাইতে পারে!

সারা বাড়ীতে তখন নিখিলের খোঁজ চলিয়াছে। অভয়াশঙ্করের গর্জ্জনে মাষ্টার মহাশয় লোক জন লইয়া গ্রামময় নিখিলের খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছেন, সুষমা ঠাকুর-ঘরের দ্বারে ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছে, আর অভয়াশঙ্কর ব্যাকুল চিত্তে তপ্ত ঝাঁজ লইয়া ঘর-বাহির করিতেছেন—হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বনমালীকে দেখিলেন, দেখিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—কে?

অত্যন্ত করুণ কুণ্ঠিত স্বরে বনমালী নাম বলিল।

এই সে লোকটা! অভয়াশঙ্কর বলিলেন—নিখিল তোমাদের বাড়ী গেছে?

ভীত কুণ্ঠিত স্বরে বনমালী আবার বলিল—আজ্ঞে, না।

অভয়াশঙ্কর বলিল,—কোথায় গেল সে তবে? সারাদিন তার খোঁজ নেই! খপর নেই!

বনমালী বলিল,—আজ তিনি আমার ওখানে যাননি তো। কাল গিয়েছিলেন বটে,—আসবার সময় বলে এসেছিলেন, আবার যাবেন। যাননি তো! কোথায় কার কাছেই বা আর যাবেন? আমার সে মেয়েটি আর নেই, মারা গেছে।

অভয়াশঙ্করের তীক্ষ্ণ শ্রুতি এই কথাটার উপর থমকিয়া থামিয়া পড়িল। কাল গিয়াছিল? কাল? কেমন করিয়া গেল? কাল সে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিল,—না?

খোলশা বুঝিবার জন্ত অভয়াশঙ্কর আবার প্রশ্ন করিলেন,—কাল গিয়েছিল নিখিল তোমার ওখানে? কখন গিয়েছিল?

বনমালী বলিল,—আজ্ঞে, বিকেলে। আমি বাড়ী ছিলুম না, আমার পিরবার বললে। কাল ভোরে শ্মশান থেকে ফিরে বাড়ীতে আর আমি টিঁকতে পারিনি, বেরিয়ে পড়েছিলুম। ঐ এক মেয়ে—আর আমাদের কেউ নেই!

এই অবধি বলিয়া এক-মুহূর্ত্ত থামিয়া বনমালী একটা নিশ্বাস ফেলিল; আবার বলিল,—রাত দশটার পর বাড়া ফিরে শুনলুম, উনি গিয়েছিলেন। ওঁকে দেখে আমার পরিবার একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, তাই এসেছিলুম দেখতে, আর বলতে,—কাল যদি বেড়াতে-বেড়াতে একটিবার…

বনমালীর কথায় বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—তা হবে না। আজ সে বাড়ী নেই। আগে ফিরুক,—কাল থেকে ঘরের মধ্যে তাকে বন্ধ থাকৃতে হবে। কোথাও বেরুতে পাবে না—বেড়াতেও পাবে না!

কথাটা বলিয়া শ্রোতার পানে তিলার্দ্ধকাল না চাহিয়াই অভয়াশঙ্কর বাড়ীর মধ্যে ফিরিলেন। বিরক্তির ঝাঁজে তখন তাঁহার সমস্ত প্রাণ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—ইচ্ছা হইতেছিল, এ আগুনে সারা বিশ্ব-সংসারটাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিতে!

উপরে উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া তিনি দোতলার খোলা ছাদে আসিলেন। ছাদের এক কোণে ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর-ঘরের দ্বারে সুষমা বসিয়া আছে…

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা…

ধড়মড়িয়া উঠিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল—নিখিল এসেচে? এইমাত্র আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, নিখিল বাড়ীর দোরে এসে—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সন্ধ্যার সেই ম্লান আলোতেই স্বামীর যে-মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তাইতো, তবে কি কোনো দুঃসংবাদ…

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কাল নিখিল তোমার সঙ্গে নৌকোতেই ছিল বরাবর?

সর্ব্বনাশ! এ কথা কেন? তবে কি সে-সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কেমন করিয়া হইল? নন্দ? না, তা কখনো সম্ভব নয়! তবে?

তবে কি নিখিলই বাড়ী ফিরিয়া শাসন-যন্ত্রের চাপে সমস্ত কবুল করিয়া ফেলিয়াছে! সুষমা ভয়ে কোনো কথা বলিতে পারিল না, কাঁটা হইয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—বলো...

সুষমা বলিল,—এবারটি তাকে মাপ করো। তার সে-মিনতি যদি তুমি কানে শুন্‌তে! সেই আকুল চোখ...

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ঢের হয়েছে। আর মায়ায় কাজ নেই! আজ থেকে নিখিলের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক রইলো না আর। ছুটি, ছুটি, আজ থেকে তোমার ছুটি! বরাবর এমনি করে তুমি বিশ্বাস ভঙ্গ কর্‌বে? এতখানি প্রশ্রয় তাকে তুমি যদি না দিতে, তাহলে আজ তার এমন আস্পর্দ্ধা কখনো হতো না যে, সারা দুপুর এমনি পথে-ঘাটে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে পারে! রাত হয়ে এলো, তবু তার দেখা নেই!

সুষমা কাঠ হইয়া ঠাকুর-ঘরের চৌকাঠের সামনে বসিয়া রহিল; স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া একটি কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—কি জ্বালায় যে পড়েচি! চারিধারে সকলে মিলে যেন দারুণ ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, আমার জীবনটাকে ঘুর্ণী হাওয়ায় চূর্ণ করে দেবে! তাও কি শুধু আমার জীবন? ছেলেটাও এ ঝড়ের মুখে চুবন খেয়ে মরচে!

তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—বিমাতার কাছে স্নেহ প্রত্যাশা করা, হুঁঃ! অন্ধ মায়া পাওয়া যায়!...সত্য স্নেহ? অসম্ভব! তার মনে দিবারাত্রি যখন কাঁটা ফুটে আছে...সে ভাবচে, এই ছেলে স্বামীর মনের দোরে মস্ত-বড় আগড়! এ ভাবনা বিমাতার মন থেকে কখনো দূর হয় না, হতে পারে না...

এ কথায় সুষমা আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি! কি বললে তুমি?

অভয়াশঙ্করের রসনায় বিষ ছুটিয়াছিল, সে বিষ সামলাইবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি বলিলেন,—তুমি কি জানো না, এই নিখিলকে এড়িয়ে তোমার পানে চাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব?

বাধা দিয়া সুষমা বলিল,—আমাকে তুমি এত নীচ ভাবো! কোনোদিন তোমার কাছে কোনো-কিছুর প্রত্যাশী হয়ে ভিক্ষাপাত্র ধরেচি আমি? কোনো অভাব, কোনো অনুযোগ জানিয়েচি কখনো? তবে?··· সে ভগবান জানেন, তুমি কি জানবে?···তবু এই পাশেই ঠাকুর-ঘর— সেখানে নারায়ণ আছেন, আর আমায় তুমি ভালোবাসো না, অগ্রাহ্য করো,—জানি,—তবু তুমি স্বামী, নারীর দেবতা, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে—এই দুই দেবতার সামনে বড়-গলায় আমি বলচি, যদি কখনো নিখিলের অহিত চিন্তা আমি করে থাকি, কোনোদিন স্বপ্নেও যদি আমি তার হিংসা করে থাকি, তাহলে নারী আমি, নারীর জীবনে যা মস্ত-বড় অভিশাপ, তাই যেন বজ্র হয়ে আমার মাথায় পড়ে! আমি যেন বিধবা হই! শুধু বিধবা নয়! জন্ম-জন্ম আমি যেন পথে-পথে এক-মুঠো অন্নের জন্য ভিক্ষা করে বেড়াই আর সে-ভিক্ষা যেন আমার না মেলে!

আতস বাজির মতোই সুষমার সমস্ত অন্তর যেন তাহার চোখের সামনে আগুনে জ্বলিয়া-জ্বলিয়া ছাই হইতে লাগিল!

অভয়াশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন, একটু থামিয়া দম লইয়া সুষমা বলিল,—দাঁড়াও, শুনে যাও···

সে-স্বরে কি ছিল, তাহা এড়াইয়া সরিয়া যাওয়া চলে না! অভয়াশঙ্কর মন্ত্র-চালিতের মতো ফিরিলেন। সুষমা বলিল,—নিখিল ফিরুক! ভগবান করুন, যেন তার কোনো অমঙ্গল না হয়ে থাকে! তবে ফিরলে তাকে কিছু বলো না, এবারকারের মতো মাপ করো। তার মনে যে

বেদনা জন্মেছে, তাতে তোমার শাসন এখন এতটুকু সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। তার জন্য আমার ভয় হয়—তার মুখের পানে চাইলে প্রাণ শিউরে ওঠে! কিন্তু সে কথা যাক্! আমি বিমাতা,—এ আমার মিথ্যা অন্ধ মায়া। তবু বল্‌চি, তার মঙ্গল ভেবে, তার মুখ চেয়ে কাল্‌কের জন্য তাকে ক্ষমা করো। আমি তাকে সত্যই ছেড়ে দি'চ্ছি। রাক্ষসী আমি—আমার জন্যই তার এই খোয়ার! ঠিক বলেচো, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই···আমিও রাখতে চাই না। তবে দুদিন সবুর করো। আমি চলে যাবো,—দুদিন পরে আমি সত্যই তোমার এ পুরী ছেড়ে চলে যাবো। থাকা চলে না। থাক্‌লে দিবারাত্র এই মারামারি-কাটাকাটি। এ আর সহ্য হয় না! যখন ভাবি, আমার এই সমস্ত জীবনটা নিয়ে কি তুমি করলে···

সুষমা চুপ করিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তবে নিখিল! কি করবো? আমায় চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই! চলে আমায় যেতেই হবে। সত্যই যাবো। বিশ্বাস না হয়,—এই ঠাকুর-ঘর··· এ-ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে শপথ কর্‌চি, আজ থেকে নিখিল মুক্ত··· আমি তার মা নই, কেউ নই! তার জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো, অভিশাপের মতো এসেছিলুম। কোনো মায়ায় তাকে আর বাঁধবো না। বাঁধবার নামও কর্‌বো না কোনো দিন। যদি করি, তাহলে যেন এমন দুর্ভাগ্য আমায় গ্রাস করে, যা ভাবতে মানুষ শিউরে ওঠে!

অভয়াশঙ্কর বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া বলিল,—এবার বিশ্বাস হবে?

উত্তরে অভয়াশঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ এমন সময় বাহির-বাড়ীতে কলরব উঠিল,—এই···এই দাদাবাবু এসেছে। কোথায় ছিলে দাদাবাবু? সারাদিন খুঁজে খুঁজে সকলে সারা···

অভয়াশঙ্কর চলিয়া যাইতেছিলেন, সুষমা তাঁহার পায়ের কাছে

পড়িয়া বলিল,—তোমার পায়ে পড়চি, একটি ভিক্ষা দাও শুধু—এই শেষ ভিক্ষা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কি ?

—আজ ওকে কিছু বলো না, ওর সব দোষ ক্ষমা করো। কাল থেকে আমার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্কই থাকবে না! বলো, এ ভিক্ষা দেবে? ওকে বকবে না? শাসন করবে না?

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আচ্ছা।

তারপর তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত শরীর কেমন অবশ হইয়া ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে!

## ১৮

বাড়ীতে ঢুকিয়া নিখিল অনেকখানি রুদ্র শাসন আশঙ্কা করিয়াছিল; তাহা হইল না দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া অভয়াশঙ্কর শুধু বলিলেন,—ছুটী ভোগ করেচো তো! এখন খেয়ে নাও —নিয়ে বাইরের ঘরে আসবে। আজ রাত্রে আমার কাছে বাইরে দোতলার বৈঠক-খানাতে শোবে। আজ থেকে সেইখানেই শোওয়া। বাড়ীর ভিতর তোমার আর থাকা হবে না।

এ কথায় নিখিল বুঝিল, শাস্তির এ-এক নূতন ধারা আজ খোলা হইয়াছে! শাসনের ঝাঁজ যা-কিছু, সেটা তাহা হইলে মার উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে! স্থির হইয়া সে পিতার শাসন মাথা পাতিয়া লইল।

পরদিন সকালে মাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও সে দেখা করিল না। মার উপর একটু অভিমানও হইয়াছে। বাবা এ দণ্ড দিয়াছে! তা দিক্,—তবু মা জোর করিয়া তাহার উপর নিজের দখল খাটাইতে আসিল না কেন? সে কি শুধু বাপেরই ছেলে? মার কেহ নয়? নিখিলের উপর মার কোনো জোর নাই? বেশ, মা যদি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে, সে-ই বা তবে মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না কেন?

দু-তিন দিন এমনি ভাবে কাটিল। তিনদিনের দিন বেলা তখন ন'টা, অভয়াশঙ্কর পড়ার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—সেদিন অমন করে পালিয়ে গেলে কেন, নিখিল? আমি সঙ্গে যাবো বলেছিলুম…

এ কথাটা এ ক'দিন বলার সুবিধা হয় নাই। অভয়াশঙ্কর সর্ব্বদা প্রায় কাছে কাছে আছেন! মাষ্টার মহাশয়ের মুখে আজ এ কথা শুনিয়া নিখিলের দুই চোখের পিছনে জল একেবারে ঠেলিয়া আসিল। সে জল সবলে রুখিয়া সে বলিল,—অন্যায় হয়েছিল, মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আমায় কতকগুলো বকুনি খেতে হলো!

নিখিলের চোখের জল আর বাঁধ মানিল না। কাল ঐ একটি দিন মাষ্টার মহাশয়ের যে করুণা, যে মমতার পরিচয় সে পাইয়াছে, মনে তাহা গাঁথা আছে! নিখিল তাহা কখনো ভুলিবে না।

সজল চোখে সে বলিল,—আমায় মাপ করুন মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—মাপ চাইতে হবে না, বাবা। তোমার উপর আমি কি রাগ করতে পারি? সেদিন যে তোমাকে ফিরে পাওয়া গেছে, আর ভালোয় ভালোয় সব দিক রক্ষা হয়েছে, উনি যে মার-ধর করেননি, কিম্বা ঘরে বন্ধ করে রাখেননি—মস্ত সৌভাগ্য!

নিখিল বলিল,—সে ঢের ভালো হতো মাষ্টার মশায়! এইটুকু বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিখিল বলিতে যাইতেছিল, ঘরের মধ্যে বন্দী থাকা বা দু-ঘা প্রহার,—সে তো শরীরের উপর খানিকটা আঘাত দিয়াই ক্ষান্ত হইত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এই যে শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, বাড়ীর মধ্যে সে যাইতে পারিবে না, মার সঙ্গে দেখা হইবে না—উঃ! নিখিলের মনের মধ্যে যাতনার ঝড় তীব্র বেগে ঠেলিয়া উঠিল! মনের যা-কিছু ভাবনা-চিন্তা, সাধ-আশা—সব ঐ বাগানের গাছপালার মতো মড়-মড় শব্দে ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে সাফ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া দিয়া সে ঝড় তীব্র শ্বাসে বহিয়া গেল!

তার পর ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। না, সে আর সহিবে না! এই শাসন, এই নিষ্ঠুর অত্যাচার,—এ-সবের বাঁধন যেমন করিয়া পারে, সে কাটিবেই! সেদিন বাহিরে সারা দিন ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে—খোলা মাঠে খোলা হাওয়ায় সামান্য একটা বাঁশের বাঁশীর সুরে কি সুখ উথলিয়া উঠিয়াছিল! কাজ কি তাহার এ ঘর-দ্বারে! কাজ কি এ রাজভোগে! গরুর পাল লইয়া ঐ রাখাল-ছেলের মতো অবাধ মুক্ত স্বাধীন গতিতে বায়ু-হিল্লোলের মতো মাঠে মাঠে সে ঘুরিয়া বেড়াইবে, গাছের ছায়ায় শুইয়া বাঁশী বাজাইবে!

তবে সে একা! দোসর ছিল একজন। আজ সে নাই! সোনার কথা মনে জাগিল। কেন সে চলিয়া গেল? স্বর্গে ভগবানের কাছে বসিয়া সে কি দেখিতে পাইতেছে না, নিখিলের এখানে কী কষ্ট! নিখিল ভালো নয়, নিখিল লক্ষ্মী নয়,—না হোক্, তবু সোনা তো ভগবানকে বলিতে পারে, ঐ নিখিলকে লইয়া এসো, আমি উহার খেলার সাথী, উহাকে ছাড়িয়া স্বর্গে আমি কাহার সঙ্গে খেলিব?

কলের পুতুলের মতো পিতার ইঙ্গিতে স্নান-আহার সারিয়া নিখিল আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। মাষ্টার মহাশয় আহার করিতে গিয়াছেন। ঘরে সে একা বসিয়া সোনার কথা ভাবিতেছে। স্বর্গে এখন সোনা কি করিতেছে? তাহাকে দেখিতে পাইতেছে? কে জানে?

নন্দ ঘরে আসিল। ধোপা বাহিরে বসিয়া আছে, মাষ্টার মহাশয়ের ময়লা কাপড়-জামাগুলা ঘরে জড়ো করা আছে—সেগুলা লইয়া গিয়া ধোপাকে দিবে।

নিখিল মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—নন্দ...

নন্দ ফিরিয়া চাহিল। নিখিল বলিল,—মানুষ মরে গেলে কি হয় রে নন্দ?

নন্দ বলিল,—তা বুঝি জানো না? শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে সকলে পুড়িয়ে ফেলে।

নিখিল বলিল,—তারপর সে স্বর্গে যায়?

নন্দ বলিল,—সে কি আর যায়? তার মনটা স্বর্গে যায়। সে ঐ শ্মশানের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়! তবে স্বর্গেও যেতে পারে··· তখন তারা হাওয়া হয়ে থাকে কি না!

হাওয়া! শ্মশানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়! সোনাও তাহা হইলে···

ময়লা কাপড়-চোপড় লইয়া নন্দ চলিয়া গেল। নিখিল ভাবিল, শ্মশান! সেই তো শ্মশান। নন্দ সেদিন দেখাইয়া দিয়াছে! বেশ হইয়াছে! সেই শ্মশানে গিয়াই সে থাকিবে। শ্মশানের হাওয়ায় সোনার সঙ্গে তাহা হইলে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় দেখা হইবে!

হাতের লেখা লিখিতে লিখিতে, অঙ্ক কষিতে কষিতে ঐ এক চিন্তা সেদিন তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। নিখিল আজ বাঁধন কাটিবে, এ-বাঁধন কাটিবেই! কি সুখ এই এত-বড় বাড়ীর মধ্যে, এত লোক-

জনের ভিড়ে? কিছু না। এখানে শুধু তিরস্কার, লাঞ্ছনা, প্রহার, রাগারাগির ভীষণ গণ্ডগোল! তার চেয়ে সেই জনহীন শ্মশান, খোলা মাঠ,—সুখ যা-কিছু, তা শুধু বাহিরে ঐ সব জায়গাতেই আছে!

বৈকালে জলখাবার খাইয়া একটু ফাঁক পাইতেই সে চোরের মতো সন্তর্পণে অন্দরে গিয়া উঠিল। মা? মা কৈ? সে আর বাড়ী ফিরিবে না, তাই শেষ একবার মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে চায়!

সুষমা নিজের ঘরে জানলার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, নিখিল আসিয়া চোরের মতো ঘরে ঢুকিল, অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—মা··

সুষমা ফিরিয়া চাহিল—নিখিল! পিয়াসী মন অমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল···দু-হাতে নিখিলকে বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য অধীর উদ্যত ···কিন্তু জোর করিয়া সুষমা মনের সে চাঞ্চল্য দাবিয়া রাখিল। নিখিল আসিয়া সুষমার গলা জড়াইয়া একেবারে তাহার কোলে লুটাইয়া পড়িল,—তাহার মুখে-বুকে মুখ ঘষিয়া মাথা ঘষিয়া সুষমার গলা ধরিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া ডাকিল,—মা, মা, মাগো...

সুষমা শিহরিয়া উঠিল! শপথ! কত-বড় শপথ সে করিয়াছে! কান্নার কত বড় চাপা তরঙ্গ প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিয়া রাখিলেও নিশ্বাসকে সামলাইতে পারিল না। সে নিশ্বাস বুকটাকে একেবারে খালি করিয়া বাহির হইলেও সুষমা অপলক নেত্রে নিখিলের পানে চাহিয়া পুতুলের মতো নিঃশব্দে বসিয়া রহিল,—দু চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, অধীর ওষ্ঠ উদ্যত চুম্বনকে যেন বেড়ি দিয়া আটকাইয়া রাখিল!

সে চোখ, সে চাহনির অর্থ নিখিল বুঝিল না। সে ভাবিল, মাও রাগ করিয়াছে! তবে আর এ গৃহে সে কাহার মুখ চাহিয়া থাকিবে? তাহার বুকের উপর কে যেন ভারী একখানা পাথর চাপিয়া ধরিল! নিখিল উঠিল, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সুষমাও অমনি ভূমির উপর লুটাইয়া আর্ত্ত ক্রন্দনে নিজেকে লুটাইয়া দিল।

১৯

এই শ্মশান! জন-মানবের চিহ্ন নাই! নিখিল আসিয়া যখন শ্মশানে ঢুকিল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। দূরে কাহারা হরি-ধ্বনি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখনো একটা চুলী একেবারে নিবিয়া যায় নাই—আগুন তাহাতে গন্-গন্ করিতেছে। কয়েক কলসী জল পাইয়া একটা তীব্র হল্‌কা তখনো উঠিয়া নিকটের বাতাসকে তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে! দুটো কুকুর নিখিলকে দেখিয়া ল্যাজ গুটাইয়া সরিয়া গেল। এখানে ওখানে পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসী! নিখিলের চোখে জায়গাটা কেমন অভিনব ঠেকিল! এখানকার হাওয়ায় সোনা মিশিয়া আছে? হাওয়া হইয়া সোনা ঘুরিয়া ফিরিতেছে? এই যে হাওয়া গায়ে লাগিল, এ তবে সোনার স্পর্শ? ঐ যে আগুনের প্রকাণ্ড চুলী, কে জানে, ঐ পথে আবার কাহাকে ভগবান তাঁহার স্বর্গে লইয়া গেলেন! এ হাওয়া তাহারই স্পর্শ বা?

পা টিপিয়া-টিপিয়া নিখিল অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গেল। শ্মশানের নীচে বাঘমতী নদী। নদী এখানে বাঁকিয়া গিয়াছে। ওপারে ছায়ার মতো গাছের শ্রেণী। কোনো সাড়া নাই—এমন স্তব্ধ, এমন শান্ত! নদীর তীরে, বহু দূরে ঐ না কে মানুষের মতো! মানুষ? না, একটা গরু। জল খাইতে আসিয়াছে।

আশে-পাশে বাবলা গাছ। তাহাতে হলুদ রঙের অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে—কি হাল্‌কা পাপড়ি, আর কি বাহার তাহার মঞ্জরীতে! বাঃ! বাব্‌লার পাতা দুলাইয়া বাতাস সির্-সির্ করিয়া বহিয়া গেল, অমনি হলুদ ফুলের চূর্ণরেণু নিখিলের গায়ে ঝরিয়া পড়িল। নিখিল চারিধারে চাহিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে এক-রকম নিঃশব্দেই সে

চলিতেছিল। কি জানি, হাওয়ায় কখন্ সোনার কণ্ঠ ভাসিয়া ওঠে! জোরে চলিলে নিখিল যদি শুনিতে না পায়! কিন্তু সোনা কৈ? গা অমনি ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। ভয়ে পা কেমন বাধিয়া গেল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আবার সে চারিধারে চাহিল, আবার ডাকিল—সোনা...

দূর হইতে প্রতিধ্বনি জবাব দিল—আ—া—!...নদীর জল ছোট ঢেউ তুলিয়া কহিল, ছল্-ছল্-ছল্!

শ্মশান হইতে নদীতে নামিবার জন্ম লোকের পায়ে-পায়ে ঘাসের উপর পথের একটি রেখা পড়িয়াছে। নিখিল ধীরে ধীরে সেই রেখা-পথের পাশে ঘাসের উপর বসিল। নদীর জলে পোড়া কাঠের কয়লার গুঁড়া ভাসিতেছে, কিনারায় দু-একটা হাড় পড়িয়া আছে। দেখিয়া ভয়ে নিখিলের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে ভাবিল, কিসের ভয়! সোনাকে আবার ভয় কি!

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো কাহার একটি পরিচিত ডাকের অপেক্ষায় নিখিল চুপ করিয়া বসিয়া আছে—বসিয়া বসিয়া চোখ ক্রমে ভারী হইয়া উঠিল, কানের কাছে নদীর ঈষৎ মৃদু একঘেয়ে সুর বাজিয়া চলিয়াছে, আর দূরে থাকিয়া থাকিয়া একটা ঐ কুকুরের ডাক...নিখিল চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কখন্ সোনা আসিয়া পিঠে ছোট-একটি টোকা দিয়া ডাকিবে, রাজপুত্তুর!

কতক্ষণ এমন ভাবে কাটিয়া গেছে, খেয়াল নাই—হঠাৎ এক সময় কাহার শীতল স্পর্শে নিখিল চমকিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া সে দেখে, স্তব্ধ রাত্রি—আকাশে তারার ছড়াছড়ি, আর ঐ সুদূর কোণে সেই এক-টুক্‌রা চাঁদ। কখন সে এই শ্যামল তৃণের শয্যায় গা ঢালিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আশ্চর্য্য! আর এ কি! একটা কুকুর আসিয়া তাহার ঘ্রাণ লইতেছে! ভয়ে নিখিলের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া

উঠিল—চীৎকার করিয়া কলের মতো সে কুকুরটার দিকে হাত উচাইল। কুকুর ভয়ে পলাইয়া গেল।

বাড়ীর কথা নিখিলের মনেও পড়িল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই মনে হইল, ওধারে গাছের তলায় কাহারা যেন তাহারই পানে চাহিয়া কি ফিশ্ ফিশ্ করিতেছে, তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সরিয়া যায় …ও কারা ? নিখিল ডাকিল,—সোনা…

কোনো সাড়া নাই !

এবার আরো জোরে নিখিল ডাকিল,—সোনা ..

মনে হইল, বহুদূর হইতে কে যেন সাড়া দিল—যা—ই…

সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাগলের মতো নিখিল তখন ছুটিল। কিন্তু কতদূর ? শ্মশানের বুকে সেই নিবন্ত চুলীর কাছে মোটা একটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, মড়া পোড়াইবার জন্ত কাহারা গাছ কাটিয়া এটাকে দরকার না হওয়ায় ফেলিয়া গিয়াছে। সেই গুঁড়িতে হুঁচট খাইয়া নিখিল পড়িয়া গেল—পড়িবা মাত্র শ্রান্ত শরীর মূর্চ্ছার অন্ধ রন্ধ্র-তলে…

বাড়ীতে ওদিকে আবার সেই ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। কী দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্যে রাত্রিটা কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না ! এখনো তবু নিখিলের কোনো সন্ধান নাই ?

অভয়াশঙ্করের রুদ্র মূর্ত্তি অজানা ভয়ে একেবারে পাংশু পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে ! দাসী-চাকর যে যেখানে ছিল, সারা রাত্রি সকলে লণ্ঠন জ্বালিয়া, মশাল জ্বালিয়া সারা গ্রাম এবং গ্রামের যত বন-বাদাড়, মাঠ, ঝোপ-ঝাড়, পুকুর-পাড় ঘুরিয়া নিখিলকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে ! কালিকার মতো সুষমা আবার সেই ঠাকুর-ঘরের দ্বারে মাথা কুটিয়া ডাকিতেছে,—ঠাকুর·· ঠাকুর···ঠাকুর···

সকালে ক্লান্ত হইয়া অভয়াশঙ্কর বাহিরে ফটকের সম্মুখে আসিয়া

বসিয়া পড়িলেন...শুষ্ক মূর্ত্তি, সারারাত্রি দুশ্চিন্তায়-জাগরণে চোখ দুটা কোটরে গিয়া ঢুকিয়াছে,—নিশ্বাস ফেলিয়া কেবলই তিনি ভাবিতেছেন, বুঝি, এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! মেয়ে-হারা বাপের দুঃখ দেখি নাই!

বিশেষ করিয়া আরও মনে হইতেছিল সুষমার কথা। তাহাকে কিছু দিই নাই, কিছু না—শুধু আদায়ই করিয়াছি। এ জগৎ যে দেনা-পাওনার উপর চলিয়াছে!

গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল! ভাবিলেন, ফাঁকি দিয়া যা' আদায় করিয়াছি, এবার বুঝি তার দাম সুদে-আসলে দিতে হয়!

এমন সময় রাস্তার ওদিক হইতে নন্দ ছুটিয়া আসিল, বলিল,—ঐ যে!

চমকিয়া অভয়াশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া দেখেন, দূরে ক'জন লোক। এই দিকেই আসিতেছে, বটে! একজনের বুকের উপর একটি ছেলে, না? হুঁ! নিখিল? হাঁ, নিখিলই তো!

পাগলের মতো অভয়াশঙ্কর সেই দিকে ছুটিলেন—আলু-থালু বেশ—কেমন এক মূর্ত্তি! তবে কি নিখিল…? লীলার একটি মাত্র স্মৃতি—শেষ স্মৃতি! ভগবান! ভগবান!

তাঁহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় ভীষণ ঝাঁকানি দিয়া বহিয়া গেল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

লোকেরা কাছে আসিলে তিনি দেখেন, মাষ্টার মহাশয়, দামু আর সেই লোকটি…বনমালী। বনমালীর বুকে নিখিল। নিখিল মূর্চ্ছিত? না ..

কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—আছে?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—আছে, ভয় নেই।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় পেলে?

এবার বনমালী কথা কহিল। সে বলিল—শ্মশানে।

—শ্মশানে! শিহরিয়া অভয়াশঙ্কর তাহার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—দাও, আমায় দাও, আমি কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার বড় কষ্ট হয়েছে! এতখানি পথ…

বনমালী বলিল,—কোনো কষ্ট হয়নি বাবু।

—না, না, দাও। বলিয়া নিখিলকে ঘাড়ে করিয়াই অভয়াশঙ্কর বাড়ী ঢুকিলেন,—একেবারে দোতলায় অন্দরের ঘরে আসিয়া তাহাকে খাটে শোয়াইয়া দিলেন। গা পুড়িয়া যাইতেছে! বেহুঁশ জ্বর! দু গাল তাতিয়া পাকা আপেলের মতো লাল!

বনমালী, মাষ্টার মহাশয়…সকলেই সঙ্গে আসিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আমি এখনি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দি, ভালো ডাক্তারকে। মোটরে করে এখনি তিনি চলে আসুন।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—দাও, তাই দাও, এখনি দাও। আমার নিখিলকে তোমরা সারিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। আমি লক্ষ টাকা দেবো, আমার সর্ব্বস্ব দেবো। তারপর বনমালীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—শ্মশানে গেল কি করে, জানো?

বনমালী বলিল,—জানি না। তবে শেষ-রাত্রে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হলো। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম আমার মরা মেয়ে সোনাকে! ঐ এক—আর কেউ নেই আমাদের! স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন চুলীর মধ্যে থেকে মা আমার কেঁদে কেঁদে ডাকছে—বাবা গো বাঁচাও, বাবা গো গেলুম! স্বপ্নেই দেখলুম, চুলীর মধ্যে কাঠ পড়ে মাকে চেপে রেখেছে যেন—আর তার মধ্য থেকে সে কেবলি ওঠবার চেষ্টা করচে, পারচে না! ঘুম ভেঙ্গে প্রথমটা দেখি, ঘেমে নেয়ে উঠেচি। বুঝলুম, স্বপ্ন! স্বপ্ন বলেই সেটাকে উড়িয়ে দিতে গেলুম…তাকে তো পুড়িয়ে ছাই করে এসেচি, তবে আবার—? মন কিন্তু এমন অস্থির হয়ে রইলো, যে

কিছুতে সোয়াস্তি পাইনে, বাবু···নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। শেষে থাকতে না পেরে ভোরের আলো ফোটবার আগেই নিঃশব্দে শ্মশানে বেরিয়ে পড়লুম। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা গাছের গুঁড়ির পাশে অজ্ঞান হয়ে ইনি পড়ে আছেন!

অভয়াশঙ্করের সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিল! তিনি বনমালীর দুই হাত চাপিয়া বলিলেন,—আমার নিখিল তোমার। তুমি ওকে বাঁচাও, ওকে বাঁচাও। তুমি বাঁচাতে পারবে, নিখিল তোমায় ভালোবাসে!

অভয়াশঙ্কর পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন।

## ২০

প্রাণপণে চিকিৎসা ও সেবা চলিতে লাগিল। টাকায় যতখানি করা যায়, অভয়াশঙ্কর তাহা করিলেন। আর টাকার উপরে যে-জিনিষ, অগাধ টাকার বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, সেই সেবা ও শুশ্রূষার ভার লইল সুষমা। বুক দিয়া নিখিলকে সে ঘিরিয়া আছে, কোনো অমঙ্গল না তাহাকে স্পর্শ করে। মৃত্যু যেন কোনো দিক দিয়া প্রবেশের এতটুকু ফাঁক না পায়!

ডাক্তার বলিলেন, মেনিঞ্জাইটিস্! রোগীর কথা কিছুই বলা যায় না! বাঁচিয়া উঠিলেও হয়তো জড় হইয়া থাকিবে, একেবারে বোবা-হাবা পুতুলের মতো!

পনেরো দিনের পর জ্বর নরম পড়িলেও নিখিল কথা কহিল না। চোখ মেলিয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া কেমন একভাবে চাহিয়া থাকে, দেখিলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া ওঠে...অতি-বড় পাষাণ যে, তাহারও চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়ে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এমনি থাকে, থাক্—তবু জানবো, প্রাণে বেচে আছে!

ডাক্তার বলিলেন,—কথা যদি কখনো কয়, ভগবানের দয়া। তবে সেরে উঠলে স্নেহ আর সহানুভূতির প্রচুর ধারায় ওর মনখানিকে যদি সর্ব্বক্ষণ, ভিজিয়ে ডুবিয়ে রাখতে পারেন এতটুকু শাসন নয়, বাধা নয়, বাঁধন নয—একেবারে মুক্ত, স্বাধীন অবাধ গতি দিয়ে, তবেই যদি আবার মানুষ হয়ে উঠতে পারে! নাহলে···

—নাহলে কি?

—আপনার ঐ আলমারির ভিতরকার কাঁচের পুতুলের মতো থাকবে, ঠিক অমনি। দাঁড় করিয়ে রাখেন, দাঁড়িয়ে থাকবে. বসিয়ে দেন, বসবে, শুইয়ে দেন, শোবে। বাড়ার ভাগ, নড়ে-চড়ে একটু বেড়াতে পারবে, তাও পক্ষাঘাত-গ্রস্ত পঙ্গুর মতো!

সুষমা বলিল,—ও কবে কথা কইবে ডাক্তারবাবু? আজ যে পঁচিশ দিন হয়ে গেল!

শিহরিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—পঁচিশ দিন!

সুষমা বলিল,—হ্যাঁ। আমি একটী-একটী করে দিন গুণচি!··· আজও আপনি আশা দেবেন না?

বিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—মিথ্যা আশা কি বলে দি মা? তবে ভরসা এই, তোমার শুশ্রূষায় মরা মানুষও বেঁচে ওঠে! আমাদের পুঁজি কিছু নেই—শুধু তার আশায় থাকলে আমি বহুদিন আগে সরে যেতুম। কিন্তু তোমার এই সেবায় আমার মন এখনো নিরাশ হয়নি।··· তবু সম্পূর্ণ আশা এখনো দিতে পাচ্ছি মা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যখনি ওর অসুখ হয়েছে, শক্ত রকমই হয়েছে—আর সে অসুখে আমার স্ত্রীই ওকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন!

ডাক্তার বলিলেন,—তাই ভরসা হচ্ছে, এবারও মা ওকে হয়তো ফিরিয়ে আনতে পারবেন!

* * * * *

আজ চল্লিশ দিন। জ্বরটা কাল রাত্রি হইতে একেবারে ছাড়িয়াছে। আজ সকালেও জ্বর এখনো দেখা দেয় নাই। তারপর খানিকটা বেদানার রস কাল রাত্রে খাওয়ানো গিয়াছে, আজও আধ পেয়ালা খাইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—ভালোর দিকে ফিরচে বলেই মনে হচ্ছে।

তোমার পুণ্যে তাহলে আবার ওকে পেলুম, মা। বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর আসিয়া সুষমার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার এ কি চেহারা হইয়াছে! শীর্ণ...রেখার মতো! ক্ষীণ দেহ, মলিন বিবর্ণ মুখ! এ কি সেই সুষমা—না, তার শীর্ণ ছায়া? কঙ্কাল! এ ক'দিন নিখিলকে লইয়া একাসনে বসিয়া যমের সঙ্গে কি প্রবল যুদ্ধই না সে করিয়াছে!

যাক্, সে আজ জয়ী হইয়াছে! আনন্দে অভয়াশঙ্করের চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

সুষমা তখন ভিজা তুলা বুলাইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে নিখিলের মুখ-চোখ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। সে কাজ হইয়া গেলে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সুষমা চুপ করিয়া রহিল।

সুষমার একখানি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা···

সুষমার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, চোখ মেলিয়া সে বলিল,—উঁ··

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ওকে তুমি সারিয়ে তুলেচো! যদি ওকে ফিরে পাই, তাহলে তোমারই হাতে ওকে দান করবো এবার, একেবারে নিঃস্বত্ব হয়ে।

সুষমা সে কথার কোনো জবাব দিল না। এত দুঃখেও মুখে তাহার হাসি ফুটিল।

দেখিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ও—তা হবার নয়, সুষমা, না?

—কেন?

—শপথ করেছিলে, সেই ঠাকুর-ঘরের দোরে বসে...

সুষমা খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর হাসিল,—হাসিয়া বলিল,—শপথ! সেই শপথের কথা বল্‌চো! সে মুখের একটা কথা মাত্র! সে-শপথ যখন করেছিলুম, ঠাকুর কি তখন শুধু সেই মুখের কথাটুকুই শুনেছিলেন? আমার প্রাণ তখন কি বলছিল, তা শোনেননি? তা যদি না শুনে থাকেন, তাহলে তিনি ঠাকুর নন্—তাঁকে তাহলে কখনো আর মানবো না। সে শপথ কত-বড় মিথ্যা, ঠাকুর কি তা তখনি বোঝেন নি?

একটা মস্ত আশ্বাস পাইয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমি তাহলে ওর সব ভার নেবে? বলো···বলো...ওর সম্বন্ধে কোনো কথায় আর আমি থাকবো না।

সুষমা আবার হাসিল। হাসিয়া বলিল,—কিন্তু কত দিন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—চিরদিন, চিরকালের জন্য।··· বিশ্বাস হচ্ছে না? বলিয়া তিনি উঠিলেন, উঠিয়া ঘরের দেওয়ালে লীলার যে ছবি টাঙানো আছে, হাত দিয়া সেই ছবি ছুঁইয়া বলিলেন,—এই ছবি ছুঁয়ে—আর ঐ আমার মার আর বাবার ছবি ও-দেওয়ালে—এই তিন ছবি সামনে রেখে বল্‌চি,—নিখিলকে সারিয়ে তুমি ওকে নাও। ওর সব ভার তোমাকে দিলুম—যেমন ভাবে ওকে মানুষ করতে চাও, করো। আমি তাতে কোনোদিন কোনো বাধা দেবো না। যদি দি···

খাট হইতে নামিয়া সুষমা আসিয়া স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল: হাত চাপিয়াই কহিল,—ছি, তুমি স্বামী, দেবতা, আমার কাছে শপথ করতে

আছে? কে বল্‌লে, তোমাকে বিশ্বাস করি না? তা যদি না করতুম, তাহলে এ বাড়ীতে এক-দণ্ড আমি তিষ্ঠুতে পারতুম! তুমি জানো না, এ জগতে আমার কে বা আর আছে···শুধু তুমি আর নিখিল ছাড়া তোমরাই আমার সব।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমাকে আমি চিনিনি সুষমা, মনে তাই মিথ্যা সন্দেহের আগুন জ্বেলে নিজে পুড়েছি, আর সে আগুনে ঝড় তুলে তোমাকে পুড়িয়েছি, নিখিলকে পুড়িয়েছি!

তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না···

ওদিকে হঠাৎ একটা ছোট স্বর দুজনের কাণে বাজিল—ম্‌-ম্‌-মা···

কে? কে ডাকে? নিখিল?

দু জনে খাটের পাশে আসিলেন। নিখিল কোনোমতে আজ এই চল্লিশ দিনের দিন শ্রান্ত কাতর চোখদুটি মেলিয়া চাহিয়াছে।

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—নিখিল, বাবা···

সুষমা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল,—নিখিল···

নিখিলের চোখের পাতা কাঁপিতেছে···ঠোঁট দুটিও কাঁপিতেছে, প্রজাপতির হাল্‌কা পাখার মতো তুল্‌-তুল্‌ করিয়া···

সুষমা বলিল,—কি বল্‌চো বাবা? বলো···বলো···

নিখিল অতি-কষ্টে আবার ডাকিল,—মা···

নিখিল কথা কহিয়াছে! আবার কথা কহিয়াছে!

—ডাক্তার, ডাক্তার—

অভয়াশঙ্কর পাগলের মতো ছুটিয়া বাহিরে গেলেন।

তখনি ফিরিলেন, সঙ্গে ডাক্তার।

দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—ভগবান ওকে ফিরিয়ে দিলেন! নিখিল কথা কয়েচে!···আর ভয় নেই! তবে যা বলেচি,—ভারী

সাবধানে ওকে রাখতে হবে—সব বন্ধন কেটে দিয়ে, অবাধ মুক্ত বাতাসের মতো !

সুষমা নিখিলের মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। নিখিল তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, ডাকিল—মা···

স্বর এবার স্পষ্ট।

—বাবা ! বলিয়া সুষমা নিখিলের মুখে চুম্বন করিল।

ডাক্তার বলিলেন—ভগবান এ যাত্রা ফিরিয়ে দিলেন !

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

অভয়াশঙ্কর খাটের পাশে আসিয়া ডাকিলেন—নিখিল···

নিখিল বাপের পানে চাহিল। তাহার মুখে চুমু দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার মাণিক ছেলে, ধন ছেলে···বাবা আমার, বাবলু আমার···তুমি সেরে ওঠো ধন, আর কখনো তোমাকে বক্‌বো না। এর ছেলে, এর কাছে তুমি থাকবে ! বলিয়া সুষমাকে দেখাইয়া দিলেন।

নিখিল আবার ডাকিল,—মা···

অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন, সুষমা স্বামীর পানে চাহিলেন। দুজনের কাহারো মুখে কথা নাই, শুধু চোখের কোণে মুক্তার মতো বড় বড় জলের ফোঁটা !

**শেষ**

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৪নং সিমলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—৬, শৈলেন প্রেস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

## — গল্প ও উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

**লাল মাটি** ৪॥০

**উপনিবেশ**

১ম—২৲, ২য়—২৲, ৩য়—২৲

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

**অতীত বস্তু** ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

**কলঙ্কিনীর খাল** ২॥০

প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত

**কবে তুমি আসবে** ২॥০

অলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

**নন্দিতা** ১॥০

জগদীশ গুপ্ত প্রণীত

**রোমন্থন** ১৲

**দুলালের দোলা** ১৲

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রণীত

**ছিন্নহস্ত** ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত

**দক্ষিণের বিল (১ম)** ৪৲

সীতা দেবী প্রণীত

**বন্যা** ১৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

**চীনের ড্রাগন**

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

**করুণাদেবীর আশ্রম** ২৲

প্রভাত দেবসরকার প্রণীত

**অনেক দিন** ৩॥০

গিরিবালা দেবী প্রণীত

**খণ্ড-মেঘ** ২৲

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত

**অন্ত্যেষ্টি** ২৲

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

**গৌরী** ১৲ **অশ্রুময়** ১৲

হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

**বিরহ-মিলন-কথা** ১॥০

অপরাজিতা দেবী প্রণীত

**শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবন-চিত্র** ৫৲

অশোককুমার মিত্র প্রণীত

**দু' ঘণ্টা** ২৲

নিরুপমা দেবী প্রণীত

**দিদি** ৪॥০

**যুগান্তরের কথা** ১৸০

ধীরেন্দ্রনাথ বিশী প্রণীত

**অল ইণ্ডিয়া**

**হেয়ার ইন্‌ডাসট্রি কোং** ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

## — গল্প ও উপন্যাস —

মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত

**মিলন ১৲ অপূর্ণ ২৲**

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত

**মহামুহূর্ত্তে ১৷৷০**

ঘরের বউ ২৲

পল্লীর প্রাণ ২৷৷০

স্থিতি ও গতি ২৷৷০

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

**দিগ্‌ভ্রষ্ট ১৷৷০**

লক্ষ্মীর বিবাহ ১৷৷০

নিশিকান্তের প্রতিশোধ ২৲

চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

**মায়ের ডাক ২৲**

রামনাথ ২৷৷০

জ্যোতির্ম্মালা দেবী প্রণীত

**রক্ত-গোলাপ ১৲**

বিলেত দেশটা মাটির ১৲

সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত

রায়-পরিবার ১৷৷০

অমৃতলাল বসু প্রণীত

**কৌতুক-যৌতুক ২৲**

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রণীত

**বল্লভপুরের মাঠ ৩৲**

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত

মনের অগোচরে ২৲

কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

**হামজুল্লী ২৲**

অতি বোগাস ১৷৷০

সখের শ্রমিক ১৷৷০

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

**মদন ভস্মের পর ১৷৷০**

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

**অস্তাচল ১৷৷০**

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত

**তীর্থ-যাত্রী ২৲**

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

**নবগ্রহ ১৷৷০**

যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত

**পথের ধূলি ১৷৷৵০**

সুধাকৃষ্ণ বাগচী প্রণীত

**পুণ্যের জয় ১৲**

পাঁচকড়ি দে প্রণীত

**হত্যাকারী কে? ৷৷০**

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

**কাঁটা ১৷০**

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

**বিনা টিকিটে ৩৲**

---

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬